ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

অনুবাদক পরিচিতি

আবদুস সাত্তার আইনী

পিতা : হাফিজ উদ্দিন মুনশি, **মাতা :** সাহেরা বানু

ঠিকানা : পস্তারী, বড়হিত, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

শিক্ষা : তেরশিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর উত্তরা বাইতুস সালাম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে হিফ্‌জুল কুরআনসহ জালালাইন জামাত পর্যন্ত পড়েন। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর থেকে মিশকাত ও দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। জামিয়া দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রামে উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করেন। পুবাইল এফ.ইউ. ফাজিল মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং সরকারি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন : কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশে সহসম্পাদক ও বাংলাদেশ ল' রিসার্চ ও লিগ্যাল এইড সেন্টারে রিসার্চ ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

লেখালেখি : ছাত্রাবস্থায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকী ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে লিখেছেন। অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২ এবং মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ২।

ড. রাগিব সারজানি

মুসলিমজাতি বিশ্বকে
কী দিয়েছে

দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে (২য় খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় মুদ্রণ : জুমাদাল উখরা ১৪৪২/ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-64-2
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২৯০০/- টাকা মাত্র [চার খণ্ড একত্রে]

MuslimJati Bisshoke ki Diyece (2nd Part)
Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

* * *

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।[১]

* * *

১. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪।

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

চিত্র সূচি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ইসলামি সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সহায়তা করেছে। নাগরিক জীবনের সর্বস্তরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। মক্তব থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যায়তন পর্যন্ত সবকিছুই ছিল। ইসলামি বিশ্বে ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মানমন্দির ও বড় বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটিই ছিল গবেষণা, পাঠদান ও মৌলিক লেখালেখির কেন্দ্র।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের আবির্ভাবটাই ছিল প্রকৃত অর্থে জ্ঞানবিপ্লব। কারণ তখনকার পরিবেশ জ্ঞান-প্রাণের অনুকূল ছিল না এবং উপযোগীও ছিল না। সেই পরিবেশ এতটাই শোচনীয় ছিল যে, কুরআনের প্রথম বাণীগুলো অবতীর্ণ হওয়ার আগের সময়টা জাহিলিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামপূর্ব যুগটা ছিল অজ্ঞতা ও অন্ধকারের। তারপর ইসলাম এলো এবং জ্ঞানের অভিযাত্রা শুরু হলো, দুনিয়া ঐশী পথপ্রদর্শনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

ইসলামের আবির্ভাবের শুরুটাই হয়েছে কুরআন নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। রিসালাত বা নবুয়ত ইসলামের নিদর্শন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে শুরু হয়নি। অর্থাৎ, বিশেষ অর্থে নামায, রোযা, হজ, যাকাতের আহ্বান জানায়নি। তা ইসলামের রুকন ও ভিত্তিসমূহের আলোচনার আহ্বান জানিয়েও শুরু হয়নি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লেনদেন-নীতি, রাজনৈতিক জীবনের কাঠামো ও উপাদান, নৈতিক মূল্যবোধের বিবরণ, এমনকি আকিদার মূলনীতির আলোচনার দ্বারাও তার সূচনা ঘটেনি, বরং তার সূচনা হয়েছে এ

সবকিছুর চাবি ও সবকিছুর কেন্দ্রীয় বিষয়ের দ্বারাই—ইক্‌রা, পড়ো।[২]

সুতরাং শিক্ষার স্থান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকল্প ছিল না। এখানে শিক্ষার্থীরা শাইখ ও জ্ঞানীদের সাহচর্য পেয়েছে, তাদের থেকে দীক্ষা নিয়েছে এবং পরিতৃপ্ত হয়েছে। এসব স্থানে জ্ঞানবিজ্ঞান, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মজলিস বসেছে। সেই পরিবেশে জ্ঞান-জীবন ছিল সজীব ও সতেজ। পরবর্তী আলোচনায় এমন কিছু শিক্ষাস্থান বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি আলোকপাত করব যেগুলো ইসলামি সভ্যতায় ছিল মৌলিক শিক্ষাকেন্দ্র।

প্রথম অনুচ্ছেদ : মক্তব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মসজিদ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মাদরাসা বা বিদ্যালয়

---

২. কুতুব মুস্তাফা সানু, *আন-নুযুমুত তালিমিয়্যাতুল ওয়াফিদাহ ফি ইফরিকা কিরাআতুন ফিল-বাদিলিল হাদারি*, পৃ. ১৭।

প্রথম অনুচ্ছেদ

মক্তব

মক্তব মুসলিমদের কাছে সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই মক্তবের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে তা ছিল অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ। হিজরি প্রথম শতকগুলোতে মক্তবের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কারণ মক্তবেই উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হতো। মক্তব ছিল আমাদের আধুনিক যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এবং সংখ্যায় ছিল প্রচুর। ইবনে হাওকাল[৩] জরিপ করেছেন যে, সিসিলির একটিমাত্র শহরেই তিনশ মক্তব ছিল।[৪]

মক্তব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শিশুদেরকে পড়া ও লেখা শেখানো এবং তাদের কুরআন হিফয করানো। এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বদর যুদ্ধের পরে তিনি মুশরিক বন্দিদের নির্দেশ দেন যে, তাদের প্রত্যেকে দশজন বালককে লেখা শেখাবে। এই বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই সময় একদল আনসারি বালকের সঙ্গে যায়দ ইবনে সাবিতও লেখা শেখেন।[৫]

মক্তবে শিশুরা আরবি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান শিখত। বিশেষ করে যখন তারা স্লেটে কুরআনুল কারিমের আয়াত বা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস লিখত। মহান সাহাবি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলির (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যুগে মক্তবের শিক্ষকগণ

---

৩. ইবনে হাওকাল : আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে হাওকাল (মৃত্যু : ৩৫০ হিজরি)। পর্যটক, ভূগোলবিশারদ, ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো আবু ইসহাক আল-ইসতাখরির *'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক'* গ্রন্থের সম্পাদনা, পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১১১।

৪. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০০।

৫. সুহাইলি, *আর-রওযুল উনুফ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৫।

(আদব শিক্ষাদাতারা) কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, মক্তবের শিক্ষকের একটি পাত্র থাকত। প্রত্যেক শিশু পালাক্রমে প্রতিদিন পরিষ্কার পানি নিয়ে আসত এবং ওই পাত্রে রাখত। এই পানি দিয়ে তারা স্লেট মুছত। শিশুরা মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ত এবং ওই পানি গর্তে ঢাললে তা শুকিয়ে যেত। লেখার কালি কি হাত-পায়ে লেগে যেত না? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। লেখার কালি তারা পা দিয়ে মুছত না, বরং রুমাল দিয়ে বা এরকম কিছু দিয়ে মুছত।[৬]

সেই যুগের শিশুদের অন্তরে আরবি হরফের প্রতি যে কী সম্মান ছিল তা উপর্যুক্ত উজ্জ্বল চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন তারা ইলাহি ওহি (কুরআনের আয়াত) লিখত। তারা তা মোছার জন্য পবিত্র পানি আনত, মাটিতে গর্ত খনন করত এবং শুকিয়ে যাওয়ার জন্য তাতে ওই পানি ঢেলে দিত।[৭]

মক্তবের বহু শিক্ষক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি[৮] একটি মক্তবে শিক্ষক ছিলেন। শিশুদের পড়াতেন এবং বিনিময়ে তারা তাকে রুটি দিত।[৯] দাহহাক ইবনে মুযাহিমের ব্যাপারে এটা বিদিত যে, তিনি কুফার একটি মক্তবে শিশুদের আদব শিক্ষাদাতা ছিলেন। তার কাছে ছিল তিন হাজার শিশু।[১০]

ইয়াকুত হামাবি[১১] *'মুজামুল উদাবা'* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসিম বালখির মক্তবে তিন হাজার ছাত্র ছিল। তার মক্তবটি ছিল বিশাল, তিন

৬. ইবনে সাহনুন, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৪০-৪১।
৭. আকরাম উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদাহ*, পৃ. ২৮১।
৮. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফি : আবু মুহাম্মাদ আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনুল হাকাম আস-সাকাফি (৪০-৯৫ হি./৬৬০-৭১৪ খ্রি.)। সেনাপতি, খতিব। খলিফা আবদুল মালিক তাকে প্রথমে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের গভর্নর এবং পরে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মৃত্যুবরণ করেন ওয়াসিতে (কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী জায়গায়)। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১১, পৃ. ২৩৬-২৪১; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ১৬৮।
৯. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৩০।
১০. যাহাবি, *আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার*, খ. ১, পৃ. ৯৪।
১১. ইয়াকুত হামাবি : আবদুল্লাহ ইবনে শিহাবুদ্দিন ইয়াকুত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রুমি (৫৭৪-৬২৬ হি./১১৭৮-১২২৯ খ্রি.)। গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদ। ভূগোলবিদদের অন্যতম পথিকৃৎ। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : معجم البلدان، إرشاد الأريب، معجم الأدباء।

হাজার ছাত্রের জায়গা সংকুলান হতো। এ কারণে মক্তবের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘোরা এবং সব ছাত্রের তদারকির জন্য বালখির গাধায় চড়ার প্রয়োজন পড়ত।[১২]

বড় বড় ফকিহ ও আলেমগণের অনেকেই শৈশবে মক্তবে পড়াশোনা করেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শৈশবে মক্তবে পড়াশোনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মায়ের কোলে থাকতেই এতিম হয়েছিলাম। তিনি আমাকে মক্তবে পাঠালেন। মক্তবে কুরআন খতমের (হিফযের) পর মসজিদে দরসে বসতে শুরু করলাম। আমি আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসা করতাম।[১৩]

শাম বিজিত হওয়ার পর সেখানে দ্রুত মক্তবের বিস্তার ঘটে। বিজয়ীদের সন্তানেরা সেখানে পড়াশোনা করে। আদহাম ইবনে মুহরিয বাহিলি হিমসি[১৪] বলেন, আমি হিমসে জন্মগ্রহণকারী মুসলিমদের প্রথম সন্তান। আমিই প্রথম সন্তান যে কুরআনের লিখিত কপি বহন করে নিয়ে যেত। আমি বিভিন্ন মক্তবে গিয়েছি এবং কুরআন শিখেছি।[১৫] তখন মক্তবে আরও যারা পড়তেন তাদের মধ্যে ছিলেন বসরার বিখ্যাত কাজি ইয়াস ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানির শিশুপুত্র।[১৬]

পিতারা সবসময় চাইতেন যে তাদের সন্তানেরা ভালো শিক্ষকের কাছে যাক। শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ রকম শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মুসলিম ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আবুল গানাইম (মৃ. ৫৪৪ হি.)। তার সম্পর্কে ইবনে আসাকির বলেছেন, তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানে ব্রতী হন। এই ক্ষেত্রে তার উত্তম প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভালো শিক্ষকতা ও গণিতে পারদর্শিতার কারণে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়।[১৭]

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১২৮।

১২. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ১, পৃ. ৪৯১।

১৩. ইবনে আবদুল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাদলিহ*, খ. ১, পৃ. ৪৭৩।

১৪. আদহাম ইবনে মুহরিয ইবনে উসাইদ আল-বাহিলি (১০০ হি./৭১৮ খ্রি.)। তাবিয়ি, অশ্বারোহী যোদ্ধা, বিশিষ্ট সেনাপতি। হিমসের কবি। শামের অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২৮২।

১৫. ইবনে বাদরান, *তাহযিবু তারিখি দিমাশক লি-ইবনি আসাকির*, খ. ২, পৃ. ৩৬৭।

১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮০।

১৭. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৫৮, পৃ. ৭৪।

আমির ও খলিফাগণ শিক্ষকদের ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীদের সম্মান করতেন। তাদের দেখে সম্মানার্থে বাহন থেকে নেমে পড়তেন। এই কারণে শিক্ষকেরা সর্বস্তরের মানুষ থেকে প্রচুর সম্মান পেতেন। একবার খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালিক রহ.-কে ডেকে লোক পাঠালেন। যাতে খলিফার দুই ছেলে আমিন ও মামুন তার থেকে হাদিস শুনতে পারে। ইমাম মালিক অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, ইলমের কাছে সবাই আসে, ইলম কারও কাছে যায় না। খলিফা হারুন দ্বিতীয়বার লোক পাঠালেন। বললেন, আমি আপনার কাছে আমার দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো, তারা আপনার ছাত্রদের সঙ্গে হাদিস শুনবে। ইমাম মালিক বললেন, তাহলে শর্ত এই যে, তারা মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এসে বসবে না। বরং মজলিসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। খলিফা-পুত্রদ্বয় বর্ণিত শর্ত মেনে হাদিসের দরসে উপস্থিত হতো।[১৮]

মক্তবের শিক্ষাবিস্তারে প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাবিয়ি আবদু রাব্বিহি ইবনে সুলাইমান বলেছেন, উম্মুদ দারদা রা. যে স্লেটে আমাকে পড়ালেখা শেখাতেন তাতে লিখে দিলেন, তোমরা শৈশবে জ্ঞান শেখো এবং বড় হয়ে সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করো। তিনি আরও বলেছেন, প্রত্যেকে ভালো বা মন্দ যে বীজ বপন করে তারই ফসল সংগ্রহ করে।[১৯]

ইসলামি বিশ্বে মক্তবে শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্যসূচি একইরকম ছিল না। বিভিন্ন স্থানে তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যদিও সব জায়গায় পাঠ্যসূচিতে কুরআনুল কারিম, পাঠ ও লেখা, ইতিহাস ও কাহিনি, প্রাথমিক দ্বীনি হুকুম-আহকাম, কবিতা, প্রাথমিক গণিত, আরবি ভাষার ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্তবে শিশুদের বড়জোর পাঁচ-ছয় বছর পড়ালেখা করতে হতো। তারা পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে মক্তবে ভর্তি হতো। শিশুরা এই সময়ের মধ্যে পুরো কুরআন হিফয করত। কেউ কেউ অধিকাংশ সুরা বা কিছু সুরা হিফয করত। মক্তবে শিশুদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হলে এবং কুরআন হিফয

---

১৮. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৮, পৃ. ২৬৯।

১৯. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৭০, পৃ. ১৫৮।

সমাপ্ত হলে শিক্ষকেরা তাদের পরীক্ষা নিতেন এবং যাচাই-বাছাই করতেন। পরীক্ষা শেষ হলে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো।[২০]

শিশুদের শিক্ষাদান ও শিষ্টাচার শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের বড় বড় ফকিহ ও লেখক শিশুদের শিক্ষাদানের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা শিক্ষাদানের সেসব নীতি প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন যেগুলো শিক্ষকদের ও পিতাদের তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করতে সহায়ক হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি রহ.[২১] তার অতি মূল্যবান গ্রন্থ *'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'*-এ بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم (প্রাথমিক বেড়ে-ওঠার সময়ে শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এবং তাদের শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠনের উপায়) শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, জেনে রাখো, শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছে আমানত। তাদের অন্তর স্বচ্ছ নির্মল মুক্তোর মতো, তাতে কোনো দাগ নেই, কোনো চিহ্ন নেই। তাদের অন্তরে যা অঙ্কন করা হবে তারই জন্য প্রস্তুত। তাদের অন্তরকে যেদিকে ঝোঁকানো হবে সেদিকেই ঝুঁকবে। তাদের যদি যা-কিছু ভালো তার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা তারই ওপর বেড়ে উঠবে। এতে দুনিয়াতেও সৌভাগ্যবান হবে, আখিরাতেও হবে। তাদের সওয়াবের অংশীদার যেমন তাদের মা-বাবারা হবে, তেমনই তাদের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীও অংশীদার হবে। কিন্তু তাদের মন্দের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হলে এবং জন্তুজানোয়ারের মতো অবহেলা দেখানো হলে তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে এবং ধ্বংস হবে। এই পাপ তাদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল সবাইকে বহন করতে হবে।[২২]

---

২০. রহিম কাযিম আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, ১৪৭-১৪৯।

২১. আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাযালি আত-তুসি (৪৫০-৫০৫ হি./১০৫৮-১১১১ খ্রি.)। উপাধি : হুজ্জাতুল ইসলাম। শাফিয়িপন্থী ফকিহ। সুফিবাদী দার্শনিক। খুরাসানের তাবুরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২১৬-২১৮; আস-সুবকি, *তাবাকাত আশ-শাফিয়িয়্যাহ*, খ. ৬, পৃ. ১৯১-২১১।

২২. ইমাম গাযালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, খ. ৩, পৃ. ৭২।

মক্তবের এ সকল শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তার ফলও তারা পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন হয়েছিলেন, এমনকি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ইসমাইল ইবনে আবদুল হামিদ শিশুদের পড়াতেন। পরে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং তিনি মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের মন্ত্রী মনোনীত হলেন।[২৩] হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফিও মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রভাবশালী মন্ত্রী হন।

মক্তবের অধিকাংশ শিক্ষক শিশুদের শিক্ষাদানের অনুরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শাইখ আবু আবদুল্লাহ আত-তাওয়াদি (মৃ. ৫৮০ হি.) যা করতেন তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি মরক্কোর ফাস শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি শিশুদের শিক্ষাদান করতেন। ধনী শিশুদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন এবং দরিদ্র শিশুদের তা দিয়ে দিতেন![২৪]

মক্তবের কর্মঘণ্টা বা পাঠদানের সময়সীমা প্রাকৃতিক উপায়ে নির্ণীত হতো। সূর্যোদয়ের পর থেকে পাঠদান শুরু হতো এবং আসরের আজান পর্যন্ত চলত। সূর্যোদয়ের সময়ের কমবেশির ফলে পাঠদানের সময়েরও কমবেশি হতো।[২৫]

শিশুরা মসজিদেও শিক্ষাগ্রহণ করত। তবে সেটা সুশৃঙ্খলভাবে হয়নি। শিশুদের কারণে মসজিদে হইচই-চিৎকার বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ৪৮৩ হিজরিতে শিশুদের শিক্ষকদের ব্যাপারে এই ফতোয়া চাওয়া হলো যে তারা যেন মসজিদে শিশুদের শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকেন। এতে মসজিদ সুরক্ষিত থাকবে। ফলে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফতোয়া জারি করা হলো।[২৬]

মক্তবে পাঠদানের মাঝে মাঝে বিশ্রাম এবং ছুটির ব্যবস্থাও ছিল। পড়াশোনায় ক্লান্তি এসে গেলে শিশুদের বিশ্রামদানের ব্যাপারে মুসলিমরা গুরুত্ব দিতেন। এমনটাই পরিলক্ষিত হয়। ইবনুল হাজ আল-আবদারি (মৃ. ৭৩৭) মরক্কোর ফাস শহরের অধিবাসী ও মালেকি মাযহাবপন্থী

---

২৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ৬০।
২৪. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ২, পৃ. ২১০।
২৫. হাসান আবদুল আল, *আত-তারবিয়াতুল ইসলামিয়্যা ফিল-কারনির রাবিয়িল হিজরি*, পৃ. ১৮৫।
২৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ১৬৮।

আলেম ছিলেন। তিনি বলেছেন, শিশুদের বিশ্রামদান মুস্তাহাব। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ»

তোমরা আত্মাকে কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম দাও।[২৭]

তাই মক্তবের শিশুরা প্রতি জুমআয় (প্রতি সপ্তাহে) দুই দিন বিশ্রাম পেত, যাতে তারা সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে উদ্যমের সঙ্গে পড়াশোনা করতে পারে।[২৮] তা ছাড়া দুই ঈদের দিনগুলোতে ছুটি থাকত, কেউ অসুস্থ হলেও ছুটি পেত। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। বৃষ্টিবাদল ও ঝড়তুফানের সময়ও ছুটি হতো।

মক্তবের শিক্ষকের হঠাৎ কোনো ব্যস্ততা চলে এলে বা ছুটির প্রয়োজন হলে তাকে তার সমকক্ষ একজন ব্যক্তিকে রেখে যেতে হতো, যিনি তার অনুপস্থিতিতে শিশুদের পাঠদান করতেন। অনুপস্থিতি দীর্ঘ সময়ের জন্য না হলে এটা করা যেত...। শিক্ষক কোনো সফরে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত একজনকে রেখে যেতে হতো, যিনি তার পরিবর্তে সব দায়িত্ব পালন করতেন। অর্থাৎ, কাছাকাছি জায়গায় একদিন বা দুইদিন বা এরকম কয়েকদিনের আবশ্যক সফর হলে এটা করা যেত। আল্লাহ চাহে তো শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি মক্তবের শিশুদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলত না। কিন্তু দূরবর্তী স্থানের সফর হলে অথবা নানা কারণে সফর বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করলে শিক্ষক তা করতে পারতেন না।[২৯]

দামেশকে শিশুশিক্ষা কতটা পদ্ধতিগত উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে জুবায়ের[৩০]। তিনি তার ভ্রমণকাহিনিতে তা বিস্তারিত

---

[২৭]. *মুসনাদুশ শিহাব কুদায়ি*, হাদিস নং ৬২৯; আল-ইসফাহানি, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ৩, পৃ. ১০৪। *মুসলিমে* বর্ণিত, يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً–'হে হানযালা, কিছুক্ষণ পরপর নিজেকে বিশ্রাম দাও।' হাদিসটি এই হাদিসের সমার্থক। কিতাব : আত-তাওবা, বাব : ফাদ্‌লু দাওয়ামিয যিক্‌র ওয়াল-ফিক্‌র ফি উমুরিল আখিরাহ, হাদিস নং ২৭৫০।

[২৮]. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩২১।

[২৯]. হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, *মুকাদ্দিমাতু কিতাবি আদাবিল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৫৭; আলি ইবনু নায়িফ শাহুদ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা বাইনা আসালাতিল মাযি ওয়া-আমালিল মুসতাকবাল*, পৃ. ৩৮।

[৩০]. ইবনে জুবায়ের : আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে জুবায়ের আল-উন্দুলুসি (৫৪০-৬১৪ হি./ ১১৪৫-১২১৭ খ্রি.)। সাহিত্যিক, পর্যটক। তিন দফা প্রাচ্য ভ্রমণ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে *'রিহলাহ ইবনে জুবায়ের'* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি স্পেনের

বলেছেন, এই সকল প্রাচ্যীয় দেশে শিশুদের কুরআনশিক্ষা পুরোটাই তালকিন[৩১] ভিত্তিক। কবিতা ও অন্যান্য বিষয় লিখিয়ে তারা হস্তাক্ষর শিখিয়ে থাকেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত লিখিয়ে শিশুদের হস্তাক্ষর শেখান না, কারণ তা রেখে দিতে হয় অথবা মুছে ফেলতে হয়। অধিকাংশ এলাকায় তালকিনকারী এবং হস্তাক্ষর শিক্ষাদানকারী আলাদাভাবে শিশুদের শিখিয়ে থাকেন। ফলে তালকিন (কুরআন শেখানো) ও হস্তাক্ষর শেখানোর আলাদা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ক্ষেত্রে তাদের চমৎকার পদ্ধতি রয়েছে। এ কারণে শিশুরা সুন্দর হস্তাক্ষর শিখে থাকে। কারণ, যে শিক্ষক হস্তাক্ষর শিখিয়ে থাকেন তিনি আর কিছুতে ব্যস্ত হন না। হস্তাক্ষর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই তারা সব শ্রম ব্যয় করেন। শিশুরা পড়াশোনাতেই ব্যস্ত থাকে। এটা তাদের জন্য সহজও বটে। কারণ তারা আক্ষরিক অর্থে শিক্ষকদের অনুসরণ করে থাকে।[৩২]

সুতরাং মক্তবে শিশুশিক্ষা একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিভাজন মুসলিমদের জানাই ছিল। তারা প্রতিটি বিষয়ের জন্য ওই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। বরং প্রাচ্যবাসীরা তাদের সন্তানদের হস্তাক্ষর সুন্দর করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ দিকেই ইবনে জুবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একে ইসলামি প্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে জুবায়ের শিশুশিক্ষার যে পদ্ধতি ও রীতির উল্লেখ করেছেন প্রাচ্যে শিশুশিক্ষা সেই পদ্ধতি ও রীতি অনুসরণ করেই এগিয়ে চলছিল। ইবনে জুবায়ের যে মন্তব্য করেছেন, ইবনে বতুতাও[৩৩] দেড়শ বছরের বেশি পরে

ভ্যালেন্সিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১৯-৩২০।

৩১. তালকিন : শিক্ষক উচ্চৈঃস্বরে পড়েন, ছাত্ররা তা শুনে শুনে পড়ে।

৩২. ইবনে জুবায়ের : *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৪৫।

৩৩. ইবনে বতুতা : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানজি (৭০৩-৭৭৯ হি./১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি.)। পর্যটক, ইতিহাসবিদ। মরক্কোর তাঞ্জিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মারাকেশে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বতুতা সারা জীবন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবী ভ্রমণের জন্যই তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন। একুশ বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে তিনি প্রায় ৭৫,০০০ মাইল (১,২১,০০০ কি.মি.) পথ পরিভ্রমণ করেছেন। তিনিই একমাত্র পরিব্রাজক যিনি তার সময়কার সমগ্র মুসলিমবিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এবং তৎকালীন সুলতানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বর্তমান পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, কাজাকিস্তান,

তার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনিতে প্রাচ্যের শিক্ষা সম্পর্কে একই মন্তব্য করেছেন। তিনি দামেশকের মসজিদে উমাইয়ার শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেছেন, এই মসজিদে একদল শিক্ষক রয়েছেন যারা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন। তাদের এক-একজন মসজিদের এক-একটি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেন এবং শিশুদের কুরআন তালকিন করান, তাদের থেকে কুরআন পাঠ শোনেন। শিশুরা আল্লাহর কিতাবের সম্মানার্থে তাদের শ্লেটে কুরআনের আয়াত লেখে না। শিক্ষক কুরআন পাঠ করেন, শিশুরা তা শুনে শুনে পড়ে।[৩৪] হস্তাক্ষরের শিক্ষক ও কুরআনের শিক্ষক ভিন্ন। যিনি হস্তাক্ষর শেখান তিনি কুরআন শেখান না। কবিতা ও অন্যান্য বাক্য দিয়ে তাদের হস্তাক্ষর শেখান। শিশুরা কুরআন শেখার পর হস্তাক্ষর শিখতে যায়। এতে তাদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হয়। কারণ, যিনি হস্তাক্ষর শেখান তিনি আর কিছু শেখান না।[৩৫]

লক্ষণীয় যে, শিশুরা মসজিদে কুরআনুল কারিম শিখত। তারপর তারা হস্তাক্ষর ও লেখার দরসে যেত। হস্তাক্ষর-শিক্ষকের কাছে শুদ্ধ লেখা ও পাঠ শিখত।

প্রহার ও মারধর করে শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে ফকিহগণ বিশেষ নীতি ও নির্দেশনা দিয়েছেন। মুসলিমরা সূচনাকাল থেকে শিশুদের শিক্ষা ও শিষ্টাচার শেখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইবনে মুফলিহ আল-মাকদিসি (মৃ. ৭৬৩ হি.) *'আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ'* গ্রন্থে বলেছেন, আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল) শিক্ষক কর্তৃক শিশুদের প্রহার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তাদের অপরাধের মাত্রা অনুপাতে প্রহার করা যেতে পারে। শিক্ষক যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন প্রহার না করতে এবং যে শিশুরা ছোট ও অবুঝ তাদের প্রহার করবেন না।[৩৬]

অসংখ্য ফকিহ ও আলেম শিশুদের প্রহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না করতে শিক্ষকদের সতর্ক করেছেন। শিশুদের সঙ্গে রূঢ়

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন ভ্রমণ করেছেন তিনি।-অনুবাদক। যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৩৫।

[৩৪]. অর্থাৎ, তালকিনের দ্বারা কুরআন শেখে।

[৩৫]. ইবনে বতুতা, *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ৮৭।

[৩৬]. ইবনে মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শারইয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬১।

আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল-আবদারি বলেছেন, এই যুগে (হিজরি অষ্টম শতক) কিছু শিক্ষক যা করছেন তা সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত। তারা শিশুদের প্রহার করতে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। যেমন শুকনো কাঠবাদামের লাঠি, খেজুরগাছের পাতাহীন ডাল, নুওবি[৩৭] চাবুক, দুই মাথায় রশিযুক্ত মোটা লাঠি ইত্যাদি। তারা নিজেরাও নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছেন। আরও অনেক কিছু। অথচ যারা পবিত্র কুরআন বহন করে তাদের জন্য কিছুতেই এগুলো উপযোগী নয়। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ فَكَأَنما أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُوْحَى إِلَيْهِ»

> যে কুরআন হিফয করেছে তার দুই কাঁধের মাঝখানে যেন নবুয়ত প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও তার নিকট ওহি প্রেরিত হয় না।[৩৮]

শিক্ষক তাদেরকে কুরআন হিফয যেমন করাবেন, তেমনই তাদের হস্তাক্ষর ও আয়াত বের করাও শেখাবেন। এতে তাদের হিফয ও বোধগম্যতার ওপর দখল বাড়বে। গ্রন্থ পাঠ ও মাসআলা-মাসায়েল বোঝার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত সহায়ক উপায়।[৩৯]

মক্তবের দায়দায়িত্ব কেবল শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকাও পালন করত। মক্তব ও সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা প্রতিবন্ধকতার কোনো সুযোগ রাখেননি মুসলিমরা। সমাজের সঙ্গে মক্তবের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল এবং মক্তব সমাজের দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করত।

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের উপকার সাধনকারী কোনো বড় আলেম বা কর্মে ও চিন্তায় দেশের কল্যাণকারী কোনো রাষ্ট্রপ্রধান অথবা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী কোনো আমির মারা গেলে মক্তবগুলো ছুটি ঘোষণা করত এবং তাদের দাফনের দিন কোনো পড়ালেখা হতো না। মক্তবগুলো

---

৩৭. নুওবাহ : মিশরের দক্ষিণে অবস্থিত একটি এলাকা।

৩৮. হাদিসটি এই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে : «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه» *মুসনাদে হাকিম*, হাদিস নং ২০২৮। তিনি বলেছেন, এটা সহিহ, যদিও ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা সংকলন করেননি।

৩৯. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩১৭।

এভাবে সাধারণ শোকে অংশগ্রহণ করত, সমবেদনা প্রকাশ করত এবং সৎ মানুষের কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত।[৪০]

মিশরের গভর্নর আহমাদ ইবনে তুলুনের[৪১] অসুস্থতা তীব্র হয়ে উঠলে এবং জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেলে শিক্ষকেরা শিশুদের নিয়ে মরুভূমিতে বেরিয়ে পড়েন এবং তার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন।[৪২]

সমাজের সাধারণ সমস্যায় এবং বিপদে-দুর্যোগে মক্তবের শিশুরাও অংশগ্রহণ করুক তা আন্তরিকভাবে চাইতেন শিক্ষকেরা। ইবনে সাহনুন[৪৩] বলেছেন, মানুষ খরায় আক্রান্ত হলে এবং ইমাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে মক্তবের শিক্ষকেরা যেসব শিশু নামায জানে তাদের নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। আল্লাহর কাছে কাকুতিমিনতি করে বৃষ্টি চাইতেন। আমার কাছে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিস সালাম)-এর কওম শাস্তির মুখোমুখি হলে তারা শিশুদের নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের নিয়ে আল্লাহর কাছে অনুনয় করে কেঁদেকেটে প্রার্থনা করে।[৪৪]

মক্তবের শিশুদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা দৃষ্টি এড়ায় না। তারা অসুস্থ শিশুকে তার সহপাঠীদের থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়িয়ে না পড়ে। ইবনুল হাজ আল-আবদারি বলেছেন, মক্তবে থাকা অবস্থায় কোনো শিশু যদি চোখের যন্ত্রণা বা শারীরিক সমস্যা ও অসুস্থতার কথা জানায় এবং জানা যায় যে সে সত্যই বলছে, তাহলে শিক্ষক তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে

---

৪০. হাসান হাসানি আবদুল ওয়াহহাব, *মুকাদ্দিমাতু কিতাবি আদাবিল মুআল্লিমিন*, পৃ. ৫৭।

৪১. আহমাদ ইবনে তুলুন (মৃ. ২৭০ হিজরি) ছিলেন শাম, উপকূলীয় এলাকা ও মিশরের গভর্নর। আল-মু'তায বিল্লাহ তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। ইবনে তুলুন ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, বদান্য, সাহসী, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সব কাজ তিনি নিজে আঞ্জাম দিতেন, প্রজাদের খোঁজখবর করতেন, জ্ঞানীদের ভালোবাসতেন। দেশে সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ৮৭০।

৪২. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৫, পৃ. ৭৩।

৪৩. ইবনে সাহনুন : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস সালাম (সাহনুন) ইবনে সাইদ ইবনে হাবিব আত-তানুখি (২০২-২৫৬ হি./৮১৭-৮৭০ খ্রি.)। মালিকি ঘরানার ফকিহ, তার্কিক। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২০৪।

৪৪. ইবনে সাহনুন, *আদাবুল মুআল্লিমিন*, পৃ. ১১১।

দেবেন। তাকে মক্তবে বসিয়ে রাখবেন না।[৪৫] এতে শিশুটির পরিবার তার সেবাযত্নের সুযোগ পাবে এবং চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলবে। তা ছাড়া সে মক্তবে থেকে গেলে শিশুদের মধ্যে রোগের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মক্তবের শিক্ষকেরা শিশুদেরকে ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে খোলা খাবার বা মিষ্টান্ন খেতে দিতেন না। কোনো ফেরিওয়ালাকে মক্তবের সামনে শিক্ষকেরা দাঁড়াতে দিতেন না এবং শিশুদের কাছে কিছু বিক্রি করতেও দিতেন না। কারণ, ফেরিওয়ালাদের থেকে কিছু কিনে খেলে শারীরিক সমস্যা হতে পারে।[৪৬] বরং তারা শিশুদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, প্রতি মাসে একজন ডাক্তার এসে মক্তবের শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন।[৪৭]

ইসলামি সভ্যতা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই শিশুদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ এই সভ্যতা বড় ও ছোটর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। বরং ছোটদের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটা জানা কথা যে, আজকের শিশুরা আগামী দিনের নেতা। তাই তাদের সুন্দর ও সৎভাবে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করেছে। অগুনতি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আমাদের বর্তমান যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের ছিল। এসব মক্তব থেকে বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি তৈরি হয়েছে যারা মানবসভ্যতাকে উজ্জ্বল করেছেন কেবল উপকারী জ্ঞানের দ্বারা নয়, উৎকর্ষ ও অগ্রগতির দ্বারাও।

---

৪৫. ইবনুল হাজ আল-আবদারি, *আল-মাদখাল*, খ. ২, পৃ. ৩২২।

৪৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৩।

৪৭. আবদুল গনি মাহমুদ আবদুল আতি, *আত-তালিমু ফি মিসর যামানাল আইয়ুবিয়্যিনা ওয়াল-মামালিক*, পৃ. ১৪৫; ড. মুহাম্মাদ মুনির সাদুদ্দিন, *দাওরুল কুত্তাব ওয়াল মাসাজিদ ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

মসজিদ

ইসলামি সমাজে শিক্ষার ইতিহাস মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মসজিদ ছিল ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। একইসঙ্গে তা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার মসজিদকে শিক্ষাদানকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে সাহাবিরা সমবেত হতেন এবং তিনি যতটুকু কুরআন নাযিল হতো তা তাদের তিলাওয়াত করে শোনাতেন। বক্তব্য ও কর্মের দ্বারা তাদের দ্বীনের হুকুম-আহকাম শেখাতেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগেও এই মসজিদ তার দায়িত্ব পালন করেছে। উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের যুগে ও তার পরেও মসজিদ তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। আলেমগণ মসজিদটিতে সমবেত হতেন এবং হাদিসের আলোচনা করতেন ও কুরআনের আয়াতের তাফসির করতেন। বহু মুহাদ্দিস এই মসজিদে বসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ.। দামেশকের জামে মসজিদও মসজিদে নববির অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। এটি ছিল ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এতে জ্ঞানচর্চার বেশ কয়েকটি আসর বসত।[৪৮] মসজিদের কয়েকটি কোণে ছাত্ররা পাঠ গ্রহণ করত এবং পাণ্ডুলিপি কপি করত। এই মসজিদে খতিব বাগদাদির একটি বড় আসর ছিল। তিনি সেখানে দরস দিতেন। প্রতিদিনই তার কাছে লোকজন সমবেত হতো।[৪৯]

মসজিদে নববিতে সাহাবিদের কয়েকটি আসর বসত, তারা জ্ঞানচর্চা করতেন। মাকহুল এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা

---

৪৮. আবদুল্লাহ মাগুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৪।
৪৯. আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৯১।

মদিনার মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আসরে বসে ছিলাম এবং ফাজায়েলে কুরআনের আলোচনা করছিলাম। এ সময় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-এর চমৎকারিত্ব-সম্পর্কিত হাদিস উল্লেখ করা হলো।[৫০]

মসজিদে নববিতে আবু হুরাইরা রা.-এর একটি আসর ছিল। এতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস শিক্ষা দিতেন। এই আসরটি আবু হুরাইরা রা.-এর হিফযুল হাদিসের ব্যাপকতার প্রতিবিম্ব ছিল। তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আবেগে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতেন এবং ক্রন্দন করতেন। মুআবিয়া রা.-এর কাছে এক লোক এলো এবং বলল, আমি মদিনায় গিয়েছিলাম। আবু হুরাইরাকে মসজিদে বসে থাকতে দেখলাম। তার চারপাশে লোকজনের জটলা। তিনি তাদের হাদিস বর্ণনা করছেন। বললেন, 'আমার প্রাণপ্রিয় আবুল কাসিম আমাকে বর্ণনা করেছেন,' বলে কেঁদে উঠলেন। তারপর শান্ত হলেন। বললেন, 'আমার প্রাণপ্রিয় আল্লাহর নবী আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,' বলে কেঁদে উঠলেন। তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন![৫১]

আবু ইসহাক সাবিয়ি বারা ইবনে আযিব রা.-এর মজলিসে ইলমি হালকার শৃঙ্খলা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা এক সারির পেছনে আরেক সারি করে বারা ইবনে আযিবের কাছে বসতাম।[৫২] তার এই কথা থেকে আসরটি যে বড় ছিল তা বোঝা যায়। মসজিদে নববিতে সে সময় আরও যেসব আসর পরিচিত ছিল তার অন্যতম হলো সাহাবি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রা.-এর আসর।[৫৩]

দামেশকের জামে মসজিদে মুআয ইবনে জাবাল রা.-এরও একটি বিখ্যাত হালকা বা আসর ছিল। আবু ইদরিস আল-খাওলানি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করে একজন যুবককে দেখতে পেলাম। তার দাঁতগুলো উজ্জ্বল। শান্ত স্বভাব। তার চারপাশে লোকজন রয়েছে, তারা আলোচনা করছে। কোনো বিষয়ে

---

৫০. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৭, পৃ. ২১৬।

৫১. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ৬১১।

৫২. খতিব বাগদাদি, *আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি*, খ. ১, পৃ. ১৭৪।

৫৩. আকরাম উমারি, *আসরুল খিলাফাতির রাশিদা*, পৃ. ২৭৮।

তাদের মধ্যে বিরোধ হলে তার কাছে উত্থাপন করছে এবং তার মত জানতে চাচ্ছে। আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বলা হলো, তিনি হলেন মুআয ইবনে জাবাল রা.।[৫৪]

এ কারণে মসজিদের জ্ঞানচর্চার আসরগুলো আমাদের বর্তমান যুগের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার সমপর্যায়ের ছিল। ইসলামি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। মুজতাহিদ, আলেম ও সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সকল আসরে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন, আলি ইবনে হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেন এবং যায়দ ইবনে আসলাম রা.-এর আসরে বসতেন। নাফে ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতয়িম তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি কুরাইশের নেতা তো বটেই, সাধারণ মানুষেরও নেতা। আপনি মসজিদে এসে বড় বড় জ্ঞানীদের আসর ডিঙিয়ে এই কালো দাসের[৫৫] সঙ্গে বসে পড়েন?! আলি ইবনে হুসাইন বললেন, মানুষ সেখানেই বসে যেখানে সে উপকৃত হয় এবং ইলম যেখানেই থাকুক অবশ্যই তা কাঙ্ক্ষিত।[৫৬]

ইসলামের ইতিহাসে অনেক ইলমি হালকা বা জ্ঞানচর্চার আসর বিখ্যাত হয়ে আছে। মসজিদে হারামে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হিবরুল উম্মাহ (উম্মাহর জ্ঞানী) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর আসর। তার ইনতেকালের পর এই আসরে যোগ দিয়েছিলেন আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ.।[৫৭]

এসব আসরে শিক্ষকের বয়স বেশি নাকি কম তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, বরং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আল্লাহভীরুতাই বিবেচ্য বিষয় ছিল। বয়সে ছোট না বড় সেটা কোনো কথা নয়। ইতিহাসবেত্তা হাফিজ আল-ফাসাবি (মৃ. ২৮০ হি.) মসজিদে ইলমি হালকার একজন পথিকৃতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই মসজিদটি দেখেছি, এখানে কেবল মুসলিম ইবনে ইয়াসারের মজলিসেই ফিকহি আলোচনা হতো। এই

---

৫৪. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

৫৫. যায়দের পিতা আসলাম ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আযাদকৃত দাস।

৫৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ১২৪।

৫৭. প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৩৩৭।

মজলিসে তার চেয়ে বয়সে বড় অনেক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার নামেই ছিল মজলিসটির নাম।[৫৮]

ইলমি হালকার শিক্ষকেরা কখনো কখনো অভিজ্ঞ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাতেন। ইবনে আসাকির[৫৯] বর্ণনা করেছেন, একজন লোক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে আবু ইদরিস আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ খাওলানিকে[৬০] দামেশকের মসজিদে দেখতে পান, তিনি একটি খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছেন। মসজিদের সব হালকাই কুরআন তিলাওয়াত করছে, কুরআন অধ্যয়ন করছে। যখনই কোনো হালকার সিজদার আয়াত পাঠের সময় হয়েছে, তারা আবু ইদরিসকে ওই আয়াতটি পাঠের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। তিনি তা পাঠ করেছেন, সবাই তন্ময় হয়ে শুনেছে; তিনি সিজদা করেছেন, সবাই তার সঙ্গে সিজদা করেছে। কখনো কখনো তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে বারোটি পর্যন্ত সিজদা দিয়েছেন। তাদের সবার কুরআন পাঠ শেষ হলে তিনি কাহিনি শোনাতে দাঁড়িয়েছেন।[৬১]

এই ঘটনায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা তো জানিই, আবু ইদরিস খাওলানি দামেশকে ইলমুল কিরাআত (কুরআন পাঠবিদ্যা) সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এই কারণে দামেশকের মসজিদে শিক্ষকেরা তাকে পাশে রেখে নিজেরা সিজদার আয়াত পাঠ করতে অপারগ বোধ করতেন। বরং তারা তাকে (সিজদার আয়াত পাঠের ক্ষেত্রে) তাদের হালকায় শরিক করে নিতেন। এভাবে তাকে সম্মান

---

৫৮. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ২, পৃ. ৪৯।

৫৯. ইবনে আসাকির : আবু কাসিম আলি ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ আদ-দিমাশকি (৪৯৯-৫৭১ হি./১১০৫-১১৭৬ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, হাফেয, পরিব্রাজক। তিনি দিয়ারে শামিয়ার মুহাদ্দিস ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

تاريخ دمشق الكبير، الإشراف على معرفة الأطراف، تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، معجم الصحابة ।

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৪০৫।

৬০. আবু ইদরিস আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-খাওলানি আল-উযি আদ-দিমাশকি (৮-৮০ হি./৬৩০-৭০০ খ্রি.)। তাবিয়ি, ফকিহ। দামেশকের বাসিন্দাদের ওয়ায়েজ ছিলেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময় তিনি তাদের শিক্ষামূলক গল্প-কাহিনি বলতেন। বিচারকও হয়েছিলেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২৩৯।

৬১. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ২৬, পৃ. ১৬৩।

জানাতেন, তার গভীর জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন এবং তার থেকে ফায়দা হাসিল করতেন।

কোনো কোনো ইলমি হালকার পরিচিতি ও খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এসে এসব হালকায় জড়ো হয়েছিল। সেই সময়ে মসজিদে নববিতে নাফে ইবনে আবদুর রহমান আল-কারির[৬২] হালকাটি ছিল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) শেখার জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। সব জায়গা থেকে ছাত্ররা তার কাছে পড়তে আসত। ইমাম ওয়ার্‌শ মিশরি[৬৩] মসজিদে নববিতে ইমাম নাফে ইবনে আবদুর রহমানের হালকায় তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি নাফেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানোর জন্য মিশর থেকে বের হয়ে পড়লাম। মদিনায় পৌঁছে নাফের মসজিদে (মসজিদে নববিতে) গেলাম। কিন্তু ছাত্রদের ভিড়ের কারণে তাকে তিলাওয়াত শোনানোর কোনো সুযোগই পেলাম না। তিনি ত্রিশজনকে পড়াচ্ছিলেন। আমি মজলিসের পেছনে বসলাম। একজন লোককে জিজ্ঞেস করলাম, নাফের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? লোকটি বলল, বড় জাফারি। আমি বললাম, কীভাবে তার কাছে যাব? লোকটি বলল, আমি তোমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাব। আমরা তার বাড়িতে পৌঁছলাম। একজন শাইখ বেরিয়ে এলেন। আমি বললাম, আমি মিশর থেকে এসেছি। নাফেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনাতে চাই। কিন্তু কোনো সুযোগই পাচ্ছি না। আপনি তার ঘনিষ্ঠজন বলে জেনেছি। আপনি আমার জন্য কিছু করুন, যাতে নাফের কাছে যেতে পারি। শাইখ বললেন, অবশ্যই। তিনি তার তায়লাসান[৬৪] নিলেন। আমাদের নিয়ে নাফের কাছে চললেন। নাফের দুটি উপনাম ছিল, আবু রুওয়াইম ও আবু আবদুল্লাহ। যেকোনো একটি

---

৬২. নাফে আল-কারি : নাফে ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু নাইম আল-মাদানি আল-কারি (৭০-১৬৯ হি./৬৮৯-৭৮৫ খ্রি.)। নাফে আল-মাদানি নামে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত সাত কারির অন্যতম এবং মদিনায় কারিদের ইমাম। তিনি ইস্পাহানি বংশোদ্ভূত।

৬৩. ওয়ার্‌শ : উসমান ইবনে সাইদ ইবনে আদি আল-মিশরি (১১০-১৯৭ হি./৭২৮-৮১২ খ্রি.)। একজন বিখ্যাত কারি। তার শারীরিক শুভ্রতার কারণে 'ওয়ার্‌শ' নামে খ্যাতি পেয়েছেন। কায়রাওয়ানি বংশোদ্ভূত। জন্ম ও মৃত্যু মিশরে। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০৫।

৬৪. *তায়লাসান* : বুযুর্গ ব্যক্তিদের পরিধেয় সবুজ রঙের পোশাকবিশেষ।

নামে ডাকলেই তিনি সাড়া দিতেন। জাফারি আমাকে দেখিয়ে তাকে বললেন, আমি এর জন্য তোমার কাছে সুপারিশ করছি। সে মিশর থেকে এসেছে। ব্যবসার জন্যও আসেনি, হজের জন্যও নয়। সে কেবল কেরাত শেখার জন্য এসেছে। নাফে বললেন, মুহাজির ও আনসারদের সন্তানদের যে কী ভিড় তা তো তোমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। তার বন্ধু বললেন, তুমি তার জন্য একটি উপায় বের করে নেবে। নাফে আমাকে বললেন, তোমার পক্ষে কি মসজিদে রাত যাপন করা সম্ভব হবে? আমি বললাম, জি। আমি মসজিদেই রাত যাপন করলাম। ফজরের সময় নাফে এলেন। বললেন, আগন্তুক লোকটি কোথায়? আমি বললাম, আমি এখানেই আছি। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বললেন, তুমিই কুরআন তিলাওয়াত করার অধিক হকদার। ওয়ার্‌শ বলেন, তা ছাড়া আমার কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর, হৃদয়কাড়া। আমি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলাম। আমার আওয়াজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ ভরে উঠল। আমি ত্রিশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। তিনি ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন, আমি চুপ হয়ে গেলাম। হালকা থেকে একজন যুবক উঠে এলো। বলল, উস্তাদজি, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন, আমরা তো আপনার সঙ্গেই থাকি। তিনি তো বিদেশি মানুষ। আপনাকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানোর জন্যই এত দূর সফর করে এসেছেন। আপনি তাকে এক দশমাংশ পড়তে বলেছেন, তিনি দুই দশমাংশ পড়েই থেমে গেছেন। তিনি আমাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি পড়ো। আমি এক দশমাংশ পড়লাম। তারপর আরেকজন যুবক উঠে এলো এবং তার সহপাঠীর মতো আমার জন্য সুপারিশ করল। আমি আরও এক দশমাংশ পড়লাম, তারপর বসলাম। তাকে তিলাওয়াত শোনানোর মতো কোনো ছাত্র থাকল না। তিনি আমাকে বললেন, পড়ো। এভাবে আমাকে পঞ্চাশ আয়াত পড়ালেন। পরে আমি প্রত্যেকবারই পঞ্চাশ আয়াত করে পড়তে থাকলাম। মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার আগে তাকে কয়েক খতম শোনালাম।[৬৫]

এই বর্ণনা হলো পরিশ্রমী ছাত্র ইমাম ওয়ার্‌শ আল-মিশরির, হিজরি দ্বিতীয় শতকে ইলমি হালকার স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি অনেক কষ্ট

---

৬৫. যাহবি, *মারিফাতুল কুররায়িল কিবার আলাত তাবাকাতি ওয়াল আছার*, খ. ১, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

ও পথশ্রম ব্যয় করে মিশর থেকে মদিনায় গিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল একটিই, মদিনার ইমাম, ইমাম নাফে থেকে ইলমে কেরাত শেখা। শিক্ষক ও তার ছাত্রদের মধ্যে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাও তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তার বর্ণনা থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, ইমাম নাফের হালকায় ফজরের পরপরই পাঠ-দিবস শুরু হতো।

ইলমি হালকা ছিল অসংখ্য। কারণ এক-এক হালকায় এক-এক বিষয়ে পাঠদান করা হতো। কিছু কিছু হালকায় ছাত্র ছিল প্রচুর। এসব হালকা ভিনদেশি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ইমাম আবু হানিফা আন-নুমানের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছিল। তিনি বলেছেন, আমি ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছি। ৯৬ হিজরিতে আমার বাবার সঙ্গে হজ করেছি। তখন আমার বয়স ১৬ বছর। মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখি এক বিশাল হালকা। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই হালকাটি কার? বাবা বললেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জুয্‌অ আয-যুবাইদির হালকা এটি। আমি এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, তিনি বলছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب»

> যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন (দ্বীনের জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহই তার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাকে এমনভাবে রিযিক দান করেন যে সে তা ধারণাও করতে পারে না।[৬৬]

বাগদাদের মসজিদে চল্লিশটিরও বেশি ইলমি হালকা (জ্ঞানশিক্ষার আসর) ছিল। এ সমস্ত হালকা ইমাম শাফিয়ির অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে তার হালকায় এসে মিশে গিয়েছিল। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবু ইসহাক আয-যাজ্‌জাজ[৬৭] এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম শাফিয়ি যখন বাগদাদে এলেন তখন বাগদাদের জামে মসজিদে

---

৬৬. ইবনু আন-নাজ্জার আল-বাগদাদি, *যায়লু তারিখি বাগদাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৯।

৬৭. আয-যাজ্জাজ : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে আস-সারি ইবনে সাহ্‌ল (২৪১-৩১১ হি./ ৮৫৫-৯২৩ খ্রি.)। ভাষাবিদ ও ব্যাকরণ-পণ্ডিত। বাগদাদে জন্ম ও মৃত্যু। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تفسير أسماء الله الحسنى، معاني القرآن وإعرابه، ما ينصرف وما لا ينصرف، العروض، القوافي أو الكافي في أسماء القوافي। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ২২৮।

চল্লিশটিরও বেশি বা পঞ্চাশটি ইলমি হালকা ছিল। তিনি এক-একটি হালকায় যেতে লাগলেন এবং তাদের বলতে লাগলেন, আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন। অথচ তারা বলছিল, আমাদের সঙ্গীরা বলেছে। অবশেষে এই মসজিদে ইমাম শাফিয়ির হালকা ছাড়া আর কোনো হালকাই থাকল না।[৬৮]

মিশরেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। আমর ইবনুল আস রা. মসজিদে ইমাম শাফিয়ি রহ. তালিবুল ইলমদের সঙ্গে মিলিত হতেন। কিছু কিছু জামে মসজিদ জ্ঞানের নানান শাখায় পঠনপাঠনের ফলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এসব মসজিদে বহু বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও ছিলেন। তা ছাড়া গভর্নরগণ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিযুক্ত করতেন।

যেসব ইলমি হালকা ও মজলিস সমাজের অবস্থার সঙ্গে সমকাতারে থাকত না এবং সমাজের বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটে মাথা ঘামাত না সেগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ আপত্তি জানাতে পারতেন। এটা ছিল তাদের নাগরিক অধিকার। কারণ, মানুষকে তাদের বাস্তবিক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং বিদ্যমান অবস্থায় কোন জিনিসটি তাদের জন্য উপকারী তা তাদের জানানো সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয়।

আহমাদ ইবনে সাইদ উমাবি বর্ণনা করেছেন, মক্কায় আমার একটি ইলমি হালকা ছিল। আমি মসজিদুল হারামে বসতাম এবং আমার কাছে বিদ্যার্থীরা সমবেত হতো। আমরা একদিন ব্যাকরণের কিছু বিষয় ও ছন্দ নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলাম। একসময় আমাদের আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ছিল খলিফা আল-মুহতা (মৃ. ২৫৬ হি.)-এর শাসনামলের। হঠাৎ এক পাগল কাছে এসে দাঁড়াল এবং আমাদের দিকে ভালো করে তাকাল। তারপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করল,

أما تستحون الله يا معدن الجهل☆ شغلتم بذا والنّاس في أعظم الشغل

إمامكم أضحى قتيلا مجدلا☆ وقد أصبح الإسلام مفترق الشمل

وأنتم على الأشعار والنحو عكفا ☆ تصيحون بالأصوات في استِ ام ذا العقل

---

৬৮. আল-মিযযি, *তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, খ. ২৪, পৃ. ৩৭৫।

> হে মূর্খতার খনি, তোমরা কি আল্লাহকে লজ্জা পাও না? তোমরা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ, অথচ মানুষ ভয়াবহ সংকটে। তোমাদের নেতা তো পরাভূত-পরাজিত হয়ে পড়েছে, আর ইসলাম হয়ে পড়েছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তোমরা কবিতা-ছন্দ-ব্যাকরণের সঙ্গে লেপটে আছ, হইহল্লা-চেঁচামেচি করছ, তোমরা তো বুদ্ধিমান নও।

এই কবিতা বলে পাগল লোকটা চলে গেল। আমরাও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লোকটার বলা কথা আমাদের ভয় ধরিয়ে দেয়। আমরা কবিতাটি মনে রাখি।[৬৯]

উপর্যুক্ত কবিতা আবৃত্তির কারণ ছিল এই যে, লোকটি আলেমদের ও মজলিসে সমবেত লোকদের সতর্ক করতে চেয়েছে। তারা মজলিসে অহেতুক তর্কবিতর্কে লিপ্ত ছিল, অথচ রাজধানী বাগদাদে ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে। তুর্কি সেনাপতি ও খলিফা আল-মুহতাদির সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত আছে। লোকটি চাচ্ছে যে, এখানে মজলিসে যারা আছে তারাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চারপাশের লোকদের সঙ্গে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করুক।

ইমাম আবুল ওয়ালিদ আল-বাজির[৭০] ইলমি হালকার খ্যাতি আন্দালুসের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। হাফেয মুহাদ্দিসের অনন্য ব্যক্তিত্ব তার ছিল। আন্দালুসে মুহাদ্দিসদের ইমাম হওয়ার অধিকারও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আল-বাজির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তাকে পালমা[৭১] শহরে এসে মালিকি মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে

---

৬৯. খতিব আল-বাগদাদি, *তারিখু বাগদাদ*, খ. ৪, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮।

৭০. আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি : সুলাইমান ইবনে খালফ ইবনে সাদ আত-তুজিবি আল-কুরতুবি (৪০৩-৪৭৪ হি./১০১২-১০৮১ হি.)। প্রখ্যাত মালিকি ফকিহ, মুহাদ্দিস, বিচারক ও কবি। তিনি আন্দালুসের বিতলিউস (Badajoz) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তার দাদা পরিবারসহ বাজায় চলে যান। সেখানেই তিনি বেড়ে ওঠেন। এ কারণেই তাকে আল-বাজি বলা হয়। এটি বর্তমানে পর্তুগালের বেজা (Beja) শহর। তিনি বাজার কাজি বা বিচারক ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনা :

الاستيفاء في شرح الموطأ، السراج في علم الحجاج ومسائل الخلاف، المهذب في اختصار المدونة، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تبيين المنهاج والتسديد إلى معرفة طريق التوحيد، فرق الفقهاء، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح.

দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১২৫।

৭১. ميورقة, Palma de Mallorca.

ইবনে হাযমের[৭২] সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে আহ্বান জানানো হয়। তিনি পালমায় আসেন এবং শিক্ষাদানে ব্রতী হন। সেভিলেও[৭৩] যান এবং শিক্ষাদান করেন। মুরসিয়া[৭৪] শহরে গিয়ে মুআত্তার পাঠদান করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেখানে থাকতাম সেখানকার মসজিদে আমার একটি ইলমি হালকা ছিল। মুআত্তার প্রসঙ্গে আলোচনা শুনতে লোকজন আমার কাছে সমবেত হতো। তিনি দানিয়া[৭৫] শহরেও গমন করেন এবং সেখানে অসংখ্য মানুষ তার কাছ থেকে *সহিহুল বুখারি* শ্রবণ করে। ৪৬৩ হিজরির রজব মাসে তিনি সারকাসতাহ[৭৬] শহর সফর করেন এবং ৪৬৮ হিজরিতে সফর করেন ভ্যালেন্সিয়ার[৭৭] রাহবাহ আল-কাজি মসজিদ। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য শহর সফর করেন। হাফিজ আবুল ওয়ালিদের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে ছাত্ররা ছুটে আসত এবং তার থেকে ইলম অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। কাছাকাছি এলাকা তো বটেই, অধিকাংশ ছাত্র দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে পড়তে এসেছে। দেশের ভেতরের ছাত্ররা যেমন এসেছে, দেশের বাইরের ছাত্ররাও এসেছে। যেমন : উরিইউলা[৭৮], সেভিল, শাবুনা (সুদান), রান্দা (জিবুতি), ভ্যালেন্সিয়া, বাগদাদ, তুতিলা (তুদেলা)[৭৯], আলেপ্পো, দানিয়া, তারতুসা[৮০] (স্পেন), তুলাইতালা (টলেডো)[৮১], লুরকা[৮২] (স্পেন), মালাগা[৮৩] (স্পেন), মুরবাতার[৮৪], মুরজিক ও মুরসিয়া...।[৮৫]

---

৭২. আবু মুহাম্মাদ আলি ইবনে হাযম আল-উন্দুলুসি (৩৮৪-৪৫৪ হি.)।

৭৩. اشبيلية, Seville. আন্দালুসিয়ার সেভিল প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর।

৭৪. Murcia.

৭৫. Dénia.

৭৬. سرقسطة : Zaragoza.

৭৭. بَلَنْسِيَة : Valencia.

৭৮. أوريُولَة : Orihuela.

৭৯. تُطِيلَة : Tudela.

৮০. طرطوشة : Tortosa.

৮১. طُلَيْطِلَة : Toledo.

৮২. لورقة : Lorca.

৮৩. مالقة : Málaga.

৮৪. Sagunto. মুরবাতার প্রাচীন নাম।

৮৫. সুলাইমান ইবনে খালফ আল-বাজি, *আত-তা'দিল ওয়াত-তাজরিহ*, খ. ১, পৃ. ১০৬।

মসজিদের হালকাগুলোতে শিক্ষাদানে নারীদের যে ভূমিকা ও অবদান তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাসের পাতায় বহু নারী শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে যারা মসজিদে পাঠদান করেছেন। নারীদের ছিল বিশেষ ইলমি হালকা। উম্মুদ দারদা রা. দামেশকের জামে মসজিদে একটি ইলমি হালকা পরিচালনা করতেন। তার আসল নাম হুজাইমা বিনতে হুওয়াই রা.। তিনি আবুদ দারদা রা., সালমান আল-ফারসি রা. এবং ফুযালা ইবনে উবাইদা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান উম্মুদ দারদা রা. থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি উম্মুদ দারদার দরসে নিয়মিত উপস্থিত হতেন, এমনকি আমিরুল মুমিনিন হওয়ার পরও তার দরসে উপস্থিত হতেন। তিনি দামেশকের মসজিদে শেষ প্রান্তে বসে ছিলেন। উম্মুদ দারদা রা. তাকে দেখে বললেন, শুনলাম আপনি ইবাদত-বন্দেগির পর এখন মদ পান করেছেন?

আবদুল মালিক বললেন, হ্যাঁ, তাই। রক্তও আমি পান করেছি। এ সময় তার একটি চাকর এসে উপস্থিত হলো। চাকরটিকে তিনি কোনো কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এত দেরি কেন? তোর ওপর আল্লাহর লানত। উম্মুদ দারদা রা. বললেন, হে আমিরুল মুনিনিন, আপনি এভাবে অভিশাপ দেবেন না। আমি আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لا يدخل الجنة لعان»

অভিসম্পাতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না...।[৮৬]

ইবনে বতুতা তার ভ্রমণকাহিনিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দামেশকের উমাবি জামে মসজিদে শিক্ষিকা শাইখা যাইনাব বিনতে আহমাদ ইবনে আবদুর রহিমের কাছ থেকে *সহিহ মুসলিম* শুনেছেন। যাইনাব ৭৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। একইভাবে ইবনে বতুতাকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি দেন বিশিষ্ট শাইখা আয়িশা বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আল-হুররানি (মৃ. ৭৩৬ হিজরি)। তিনি ইমাম বাইহাকি রহ.-এর '*ফাযায়িলুল আওকাত*' (পুস্তিকাটি) বর্ণনা করেছেন।[৮৭]

---

৮৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৬৬।

৮৭. ইবনে বতুতা, *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ৭০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৬, পৃ. ৩৪৮।

সব এলাকা ও গোত্র থেকে শিক্ষার্থীরা এসব মসজিদে পড়তে আসত। তাদের জন্য সব ধরনের উপকরণ সরবরাহ করা হতো। যাতে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে। তাদের খাবার ও পোশাক সরবরাহ করা হতো, থাকার জন্য আলাদা বাসস্থান ছিল। তাদেরকে ভাতাও দেওয়া হতো।[৮৮] এ সকল জামে মসজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

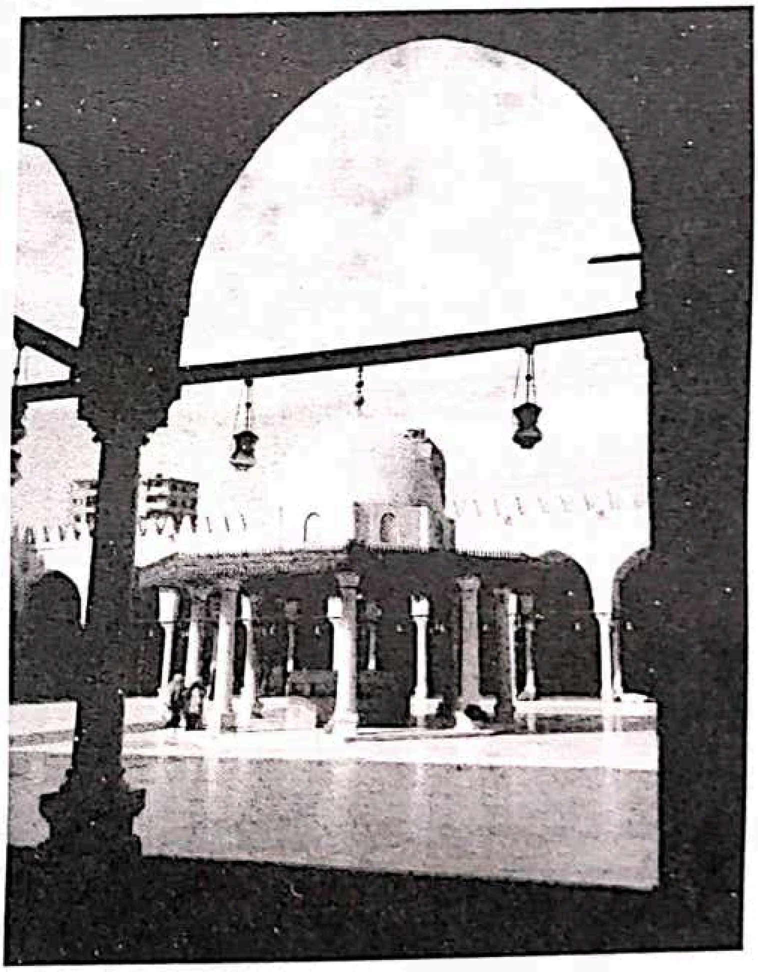
* **জামে আল-উমাবি :** এটি দামেশকে অবস্থিত। খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এটি নির্মাণ করেছেন। এই মসজিদে ইলমি হালকা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। মালিকি মাযহাবপন্থীদের জন্য মসজিদের একটি কর্নার নির্ধারিত ছিল, একইভাবে শাফিয়ি মাযহাবপন্থীদের জন্যও। খতিব আল-বাগদাদিরও একটি হালকা ছিল। ছাত্ররা তার কাছে সমবেত হতো। তিনি তাদের হাদিসের দরস দিতেন। এই মসজিদের হালকাগুলো শুধু দ্বীনি ইলমের শিক্ষাব্যবস্থায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হতো।



চিত্র নং-১
আল-উমাবি জামে মসজিদ

৮৮. আবদুল্লাহ মাগুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৪৫।

জামে আমর ইবনুল আস রা. : এটি মিশরের ফুসতাতে অবস্থিত। এই মসজিদে চল্লিশটিরও বেশি পাঠদানের আসর ছিল। শিক্ষার্থী ও যারা গবেষণায় ব্রতী ছিল তারা এসব আসর পরিচালনা করত। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর আসর। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে এই মসজিদে পাঠদানের আসরের সংখ্যা একশ দশে পৌঁছায়। কয়েকটি হালকা ছিল মহিলাদের জন্য খাস। তারপর অনুমোদনদানের (হাদিস পাঠদানের ইজাযত বা উচ্চ সনদপত্রের) প্রথা চালু হয়। ইজাযত পাওয়ার পর ছাত্ররা তাদের উস্তাদের কিতাবপত্র ব্যবহার করতে পারত এবং তার থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারত।[৮৯]



চিত্র নং-২
আমর ইবনুল আস রা. জামে মসজিদ

৮৯. রহিম কাযিম আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, ১৫০।

* **জামে আল-আযহার :** ৩৬১ হিজরিতে জামে আল-আযহারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ইসলামি বিশ্বের ছাত্রদের জন্য এটি একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। খলিফাগণ জামে আল-আযহারের জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেছেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। জামে আল-আযহারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এখানে শিক্ষার্থীরা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেত। ফলে মুসলিমবিশ্বের সব এলাকা থেকে এখানে ছাত্ররা পড়তে আসত। এমনকি ৮১৮ হিজরিতে (১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে) জামে আল-আযহারের ছাত্র-শিক্ষক ছিল মাকরিযির[৯০] বর্ণনামতে সাতশ পঞ্চাশজন। এখানে অনারব শিক্ষার্থী ছিল, সোমালিয়ার যাইলাআ (Zeila) অঞ্চলের শিক্ষার্থীও ছিল।[৯১] মিশরের গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থী যেমন ছিল, তেমনই মাগরিবের (মরক্কোর) শিক্ষার্থীও ছিল। প্রত্যেক গোত্রের আলাদা তাঁবু ছিল, তাঁবু দেখে তাদের চেনা যেত।



চিত্র নং-৩
আল-আযহার জামে মসজিদ

---

৯০. মাকরিযি : তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনে আলি আল-মাকরিযি (৭৬৬-৮৪৫ হি.)। মিশরীয় ইতিহাসবিদদের গুরু। মামলুকদের শাসনামলে জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ : السلوك لمعرفة دول الملوك، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

৯১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩১০।

জামে আল-আযহার যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের কেন্দ্র ও আলোকবর্তিকা হিসেবে ধারাবাহিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অসংখ্য মনীষীর জন্ম দিয়েছে, অজস্র গ্রন্থ এখানে রচিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই জামে আল-আযহার এমন এক শিক্ষালয় যা জ্ঞান ও জ্ঞানার্থীর যুগপৎ মিলনস্থল।[৯২]

জামে আয-যাইতুনা : এই মসজিদ তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। বনি উমাইয়ার খলিফাদের শাসনামলে (৭৯ হিজরিতে) এটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। জামে আয-যাইতুনার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইফ্রিকিয়ার গভর্নর আমির উবাইদুল্লাহ ইবনে হাবহাব। তিনি খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। ২৫০ হিজরিতে (৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) কয়েকবার মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়। যিয়াদাতুল্লাহ ইবনুল আগলাব—আগালিব রাজবংশের শাসনামলে—মসজিদটি সম্প্রসারণ করেন। এ মসজিদটিতে ইলমের বিভিন্ন শাখায় পাঠদানের কারণে এটির অবস্থান অনেক উঁচু। বহু বড় বড় আলেম এই মসজিদে পাঠদান করেছেন। যেমন আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল-মাআফিরি[৯৩]। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস (হাদিসবিশারদ) ছিলেন। আবু সাইদ সাহনুন আত-তানুখিও এখানে শিক্ষকতা করতেন। এখানে শিক্ষকদের মধ্যে আরও ছিলেন ইমাম আল-মাযিরি[৯৪] ও অন্যরা।

---

৯২. আবদুল্লাহ মাশুখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৭।

৯৩. আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ : আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-মুআফিরি আল-ইফ্রিকি (৭৫-১৬১ হি./৬৯৪-৭৭৮ খ্রি.)। তিনি শাসকদের সবসময় হুমকি-ধমকির ওপর রাখতেন। কড়া ভাষায় তাদের অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাকতে বলতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। বারকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। দুইবার কায়রাওয়ানের বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন।

৯৪. আল-মাযিরি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে উমর আল-মাযিরি (৪৫৩-৫৩৬ হি./১০৬১-১১৪১ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, হাফিয, ফকিহ, আদিব। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : نظم الفرائد أمالي على رسائل إخوان في علم العقائد، إيضاح المحصول من برهان الأصول، المعين على التلقين، المعلم بفوائد مسلم الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء، في نقد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الصفا، । দেখুন, যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ৫২; উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ১১, পৃ. ৩২।



চিত্র নং-৪
আয-যাইতুনা জামে মসজিদ

জামে আয-যাইতুনায় সব এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করতে আসত। এখানে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ভাষাবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাবলির পাঠদান করা হতো। আল-হাশাইশি[৯৫] জামে আয-যাইতুনায় জ্ঞানচর্চা ও পঠনপাঠনের যে অবস্থা ছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জামে আয-যাইতুনা ছিল একটি জ্ঞানসমুদ্র। সব ধরনের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল এখানে। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, এই মসজিদের প্রায় প্রত্যেক খুঁটির সামনে একজন করে শিক্ষক বসতেন। মসজিদটির ভান্ডারে ছিল দুই লাখেরও বেশি খণ্ডের কিতাব।[৯৬]

জামে আল-কারাউইন : মরক্কোর ফেজ শহরে জামে আল-কারাউইন প্রতিষ্ঠিত হয় ২৪৫ হিজরিতে/৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। ইদরিসি রাজবংশের[৯৭] শাসনামলে এটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। যানাতি আমির আহমাদ ইবনে আবু বকর আয-যানাতি (৩২২ হিজরি/৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদটি সমৃদ্ধ করেন এবং অনেকাংশে বর্ধিত করেন। হিজরি ষষ্ঠ শতকের শুরুতে জামে

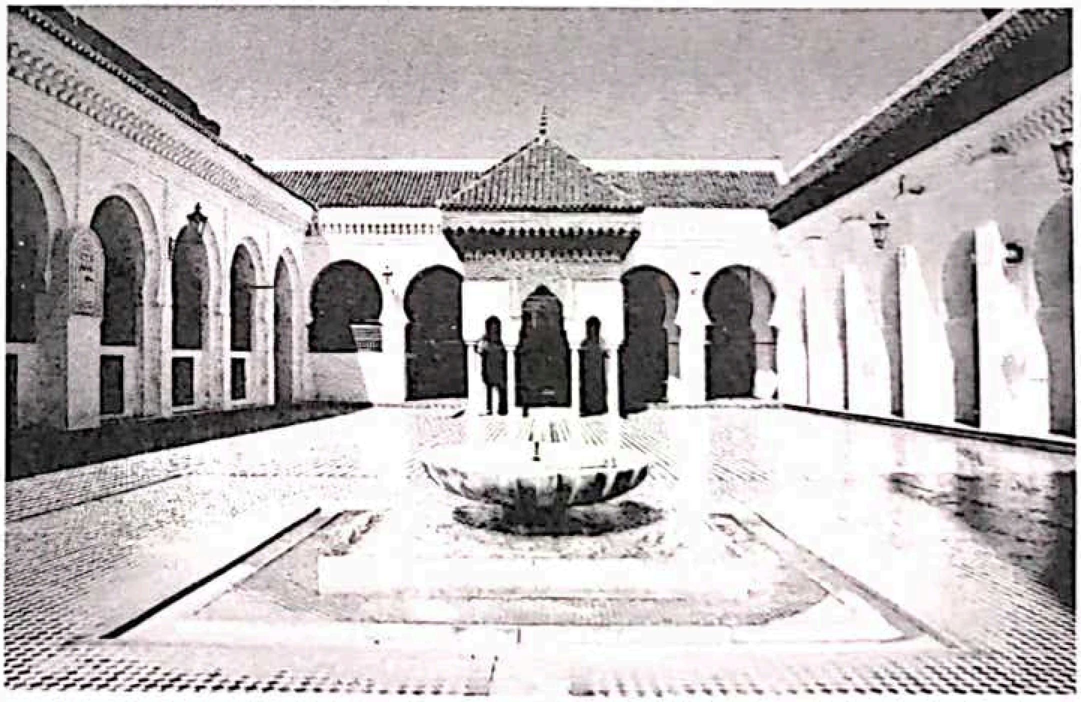
---

৯৫. আল-হাশাইশি : মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-হাশাইশি আশ-শারিফ ফাদিল (১২৭১-১৩৩০ হি./১৮৫৫-১৯১২ খ্রি.)। তিউনিসের অধিবাসী। জামে আয-যাইতুনার গ্রন্থভান্ডার ঘাঁটাঘাঁটি করাই ছিল তার কাজ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৬৩।

৯৬. আবদুল্লাহ মাত্তখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৫।

৯৭. ইদরিসি রাজবংশ (الأدارسة) : ৭৮৮ খ্রি. থেকে ৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত মরক্কোর একটি রাজবংশ। হাসান ইবনে আলি রা.-এর প্রপৌত্র ইদরিস এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইদরিসিদেরকে সাধারণত মরক্কো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়। তারা ছিল শিয়া মতবাদের যায়েদি শাখার অনুসারী।

আল-কারাউইনের সম্প্রসারণকাজ সম্পন্ন হয় এবং এটির সীমানা বিস্তৃত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। শিক্ষাদীক্ষায় উচ্চ অবস্থানের কারণে জামে আল-কারাউইন ছিল অনন্য ও অসাধারণ। বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসত। প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে তারা সব ধরনের খরচাদি পেত। জামে আল-কারাউইনের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ছিল। কারণ ওয়াকফকৃত সম্পত্তির পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল আমির-উমারার অনুদান। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ছিল বিপুল, এ কারণেও অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হতো। অন্যান্য দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসত। এমনকি ইউরোপের শিক্ষার্থীরাও এই জ্ঞানকেন্দ্রে আসতে শুরু করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশপ জার্বার্টাস (Gerbertus)[৯৮] কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পর জামে আল-কারাউইনে পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি ৯৯৯ খ্রি. থেকে ১০০৩ খ্রি. পর্যন্ত রোমের পোপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন তার নাম হয়েছিল দ্বিতীয় সিলভেসটার (Sylvester II)। তিনি Gerbert of Aurillac নামেও পরিচিত।[৯৯]



চিত্র নং-৫
আল-কারাউইন জামে মসজিদ

[৯৮]. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল হাদি আত-তাযি, *আহদু আশারা কারনান ফি জামিআতি কাযবিন*, পৃ. ১৯।
[৯৯]. আবদুল্লাহ মাওখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৬।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মাদরাসা বা বিদ্যালয়

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী থেকে ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসা পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তার কারণ, মসজিদগুলোতে ইলমি হালকা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে মসজিদটি মাদরাসায় রূপান্তরিত করা হয় তা হলো জামে আল-আযহার। ৩৭৮ হিজরিতে এটিকে মাদরাসা বা বিদ্যালয়ের রূপ দেওয়া হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের শহরগুলো মাদরাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ওপর এ সকল মাদরাসার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা, ব্যবসায়ী, আমির-উমারা ও বাদশাহ-উজিরদের ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে এসব মাদরাসা পরিচালিত হতো।

সত্যি বলতে, ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসা এই সভ্যতার মতোই প্রাচীন। ইবনে কাসির ৩৮৩ হিজরি সালের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, উজির আবু নাসর সাবুর ইবনে আরদাশির[১০০] কারখে[১০১] একটি বাড়ি কিনলেন। বাড়িটির ইমারত নতুনভাবে সংস্কার করলেন। অসংখ্য বইপত্র এনে এতে জমা করলেন। তারপর বাড়িটি ফকিহদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। বাড়িটির নাম রাখলেন দারুল ইলম। আমি ধারণা করি এটিই প্রথম মাদরাসা যা ফকিহদের জন্য ওয়াকফ করা হয়। এটি বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বের ঘটনা।[১০২]

---

১০০. সাবুর ইবনে আরদাশির : আবু নাসর সাবুর ইবনে আরদাশির (মৃ. ৪১৬) বাহাউদ দাওলা আবু নাসর ইবনে আদুদ দাওলার উজির (মন্ত্রী) ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের অন্যতম ছিলেন। সাবুর ছিলেন দুঃসাহসী, তাকে দেখলেই সবার সমীহ জাগত। ছিলেন বদান্য ও সৌজন্যশীল এবং প্রশংসাভাজন। বাগদাদে দারুল ইলম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৭, পৃ. ৩৮৭; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪।

১০১. বাগদাদের পশ্চিম অর্ধাংশের ঐতিহাসিক নাম কারখ।

১০২. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ৩১২।

মাদরাসা-প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতা লাভ করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দামেশকে প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৯১ হিজরিতে। এটি নির্মাণ করেন শুজা উদ-দাওলা সাদির ইবনে আবদুল্লাহ[১০৩]। মাদরাসাটির নাম রাখা হয় আল-মাদরাসাতুস সাদিরিয়্যাহ[১০৪]। তারপর তাকে অনুসরণ করেন দামেশকের কারি রাশা ইবনে নাযিফ[১০৫]। তিনি প্রায় চারশর মতো রাশায়ি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদে যেসব ইলমি হালকা বসত সেগুলো থেকে বেরিয়ে ছাত্ররা এসব মাদরাসায় ভর্তি হয়। বিশেষ শাখার জ্ঞান অর্জনের জন্য তারা নির্ধারিত স্থান পায়। ফলে এখানে ছাত্রদের জন্য এবং শাইখ ও শিক্ষকদের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। তাদের সকলের জন্য জ্ঞানচর্চার অবারিত উপকরণ মেলে।[১০৬]

প্রথম দিকে এসব মাদরাসা ছিল পারিবারিক বা ব্যক্তিগত। তারপর খিলাফত ও সরকারি প্রতিষ্ঠান মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। এ কাজটি শুরু হয় (সেলজুক সাম্রাজ্যের) প্রখ্যাত উজির নিজামুল মুলক আত-তুসির[১০৭] কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তিনি তার শাসনকালে মাদরাসাগুলোকে সরকারীকরণ করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানই মাদরাসার ব্যয়ভার বহন করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষক নিয়ে আসে।

তিনি বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে যে অবদান রেখেছেন তা তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মাবলির

---

১০৩. সাদির ইবনে আবদুল্লাহ : আল-মাদরাসাতুস সাদিরিয়্যাহর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দামেশকের জামে উমাবির (উমাবি জামে মসজিদের) পশ্চিম ফটকের সামনে বাবুল বারিদে ৪৯১ হিজরিতে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। দেখুন, ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৫২, পৃ. ৪৬।

১০৪. আবদুল কাদির আন-নাইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ৪১৩।

১০৫. রাশা ইবনে নাযিফ : আবুল হাসান রাশা ইবনে নাযিফ ইবনে মাশাআল্লাহ আদ-দিমাশকি (৩৭০-৪৪৪ হি./৯৮০-১০৫২ খ্রি.)। কারি ও প্রখ্যাত আলেম। তিনি সিরিয়ার মাআররায় জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা অর্জন করেন সিরিয়া, মিশর ও ইরাকে। দামেশকেই জীবন অতিবাহিত করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২১।

১০৬. আরিফ আবদুল গনি, *নুযুমুত তালিম ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮৯।

১০৭. নিযামুল মুলক আত-তুসি : আবু আলি আল-হাসান ইবনে আলি আত-তুসি, উপাধি, নিযামুল মুলক (৪০৮-৪৮৫ হি./১০১৮-১০৯২ খ্রি.)। তুসের নুকান এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হন। সুলতান মুহাম্মাদ আলপ আরসালানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি তাকে উজির নিযুক্ত করেন। বাগদাদের সবচেয়ে বড় মাদরাসা এবং অন্যান্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দেখুন, যাহবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৯, পৃ. ৯৪; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২০২।

মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং তা তাকে অমরত্ব দিয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন আল-মাদারিসুন নিযামিয়্যাহ। এসব মাদরাসাকে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রকারের জ্ঞান-সংস্থা ও নিযামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিবেচনা করা হয়। এসব মাদরাসার ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ও জীবনযাপনের সব রকমের উপকরণ সরবরাহ করা হতো। নিযামি মাদরাসাগুলো ছিল হাদিস ও ফিকহ পঠনপাঠনের জন্য বিশেষায়িত। এসব মাদরাসার ছাত্ররা খাবার ও আবাসন পেত, তাদের অনেককে মাসিক ভাতাও প্রদান করা হতো।

নিযামুল মুলকের উৎসাহ ও উদ্যম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে যা ঘটল তা অভাবনীয়। ডজন ডজন মাদরাসায় ইরাক ও খোরাসান ভরে গেল। এমনকি এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, ইরাক ও খোরাসানের প্রতিটি শহরে ও নগরে একটি করে মাদরাসা ছিল। নিযামুল মুলক শহরে তো বটেই, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি যে অঞ্চলেই কোনো আলেম পেয়েছেন এবং তাকে জ্ঞান-বিদ্যায় দক্ষ ও অনন্য দেখেছেন, তার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। মাদরাসাটির জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন এবং গ্রন্থাগারও নির্মাণ করেছেন। এ সকল মাদরাসায় ছাত্ররা বিনা পয়সায় পড়াশোনা করত। তা ছাড়া দরিদ্র ছাত্রদেরকে তাদের জন্য গঠিত বিশেষ তহবিল/বরাদ্দ থেকে নির্ধারিত পরিমাণে ভাতা দেওয়া হতো।[১০৮]

নিযামুল মুলক যেসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাগদাদের আল-মাদরাসাতুন নিযামিয়্যাহ (নিযামিয়া মাদরাসা)। ৪৫৭ হিজরিতে মাদরাসাটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় ৪৫৯ হিজরিতে।[১০৯] আব্বাসি খলিফা মাদরাসাটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তিনি নিজে শিক্ষকমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। নিযামিয়া মাদরাসায় হাদিস ও ফিকহ পড়ানো হতো, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েরও পাঠদান করা হতো। জ্ঞান ও চিন্তার জগতে যে-সকল মনীষী তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছিলেন তারা নিযামিয়া মাদরাসায়

১০৮. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০৩-১০৪।
১০৯. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ৯২।

পাঠদান করেছেন। যেমন *'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'*-এর লেখক হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আল-গাযালি।[১১০] এই সময়ে নিশাপুরের নিযামিয়া মাদরাসায় আরেকজন মনীষী পাঠদান করতেন, তিনি হলেন ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি[১১১]।[১১২]

বাগদাদ, ইস্পাহান, নিশাপুর ও মারভে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাগুলো সুন্নি মাযহাবের নীতিমালার সুরক্ষা ও দৃঢ়ীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে সময়ে যে নানা প্রকারের বিদআত ও বিকৃত মাযহাবের সয়লাব ঘটেছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। নিযামুল মুলক প্রতি বছর মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ফকিহ ও আলেমদের জন্য যে টাকা ব্যয় করতেন তার পরিমাণ ছিল তিন লাখ দিনার। সেলজুকি সুলতান জালালুদ দাওলা মালিক শাহ (ইবনে মুহাম্মাদ আলপ আরসালান) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আমাকে যা দিয়েছেন তা আর কাউকে দেননি। আমরা কি তার বিনিময়ে আল্লাহর দ্বীনের ধারকবাহক ও তার কিতাবের হেফাজতকারীদের জন্য তিন লাখ দিনার ব্যয় করব না?[১১৩]

---

[১১০]. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১৬৯।

[১১১]. আবুল মাআলি আল-জুওয়াইনি : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুওয়াইনি (৪১৯-৪৭৮ হি./১০২৮-১০৮৫ খ্রি.)। উপাধি, ইমামুল হারামাইন, ফাখরুল ইসলাম। ইমামদের ইমাম। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী বিখ্যাত ফকিহ। ইমাম গাযালির উস্তাদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব*। দেখুন, তাকিউদ্দিন আস-সিরফিনি রচিত *আল-মুনতাখাব মিন কিতাবিস সিয়াক লি-তারিখি নিসাবুর*, খ. ১, পৃ. ৩৬১।

[১১২]. ইবনুল জাওযি, *আল-মুনতাযাম*, খ. ৯, পৃ. ১৬৭।

[১১৩]. আবদুল হাদি মুহাম্মাদ রেজা, *নিযামুল মুলক*, পৃ. ৬৫১।



চিত্র নং-৬
আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহ

হিজরি চতুর্থ ও খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ইসলামি সভ্যতায় মাদরাসার বিস্তৃতি ঘটে। তা প্রমাণ করে যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা কতটা অগ্রগামী। জ্ঞানের এমন বিস্তৃতির সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসভ্যতা তখনও পরিচিত ছিল না। উল্লেখ্য সে সময়ে ইউরোপ জ্ঞানের যৎসামান্য অংশেরই অধিকারী ছিল। বরং সে সময় চার্চ জ্ঞানের সকল উপকরণ নিজেদের একচেটিয়া করে নিয়েছিল। তার পরিণাম ছিল এই যে, ইউরোপীয়রা যুগের পর যুগ অন্ধকার, অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতায় কাটিয়েছে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিরাজমান থেকেছে। বিশেষ করে জার্মান গোত্রগুলো একসময় রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং অন্যান্য সময় অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া বর্ণপ্রথা একটি পবিত্র রূপ নিয়ে তখন ইউরোপে জেঁকে বসেছিল। তার ফলে ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা অবজ্ঞা ও উপেক্ষার শিকার হয়েছে।[১১৪]

---

১১৪. জোহান হুইজিঙ্গা, *The Waning of the Middle Ages* (১৯২৪), আরবি অনুবাদ, اضمحلال العصور الوسطى, পৃ. ১৭৫।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক অবক্ষয়ের দিনেও জ্ঞান-আন্দোলন প্রভাবিত হয়নি। বরং তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। ৬৩১ হিজরিতে/১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় তাতাররা ইসলামি বিশ্বের পূর্বাঞ্চলকে তছনছ করে দিচ্ছিল। আব্বাসি খেলাফতকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। সবচেয়ে দুর্বল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল আব্বাসি খেলাফত। তারপরও এই অবিনশ্বর মাদরাসাটির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে কাসির রহ. মাদরাসাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মাদরাসাটি অভূতপূর্ব। এর আগে এমন মাদরাসা নির্মিত হয়নি। চার মাযহাবের প্রত্যেকটির জন্য ৬২ জন ফকিহ এবং চারজন সহকারী (পুনরাবৃত্তিকারী) আছেন। প্রত্যেক মাযহাবের একজন মুদাররিস, একজন শাইখুল হাদিস, দুইজন কারি এবং দশজন শ্রোতা আছেন। চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ আছেন একজন। চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চায় ব্রত আছেন দশজন মুসলিম। তাদের জন্য মাদরাসাটি ওয়াকফ করা হয়। এতিমদের জন্য আছে একটি মক্তব। মাদরাসাটির সকলের জন্য রুটি, গোশত ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত খরচাদি নির্ধারিত রয়েছে। ৫ রজব বৃহস্পতিবার মাদরাসাটিতে দরস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ নিজেও উপস্থিত হন। তার রাজ্যের আমির-উমারা, উজিরবৃন্দ, বিচারকবৃন্দ, ফকিহগণ, সুফিগণ ও কবিরাও উপস্থিত হন। তাদের কেউই বাদ পড়েননি। মাদরাসায় বিশাল দস্তরখানে ভোজের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকলেই খাদ্য গ্রহণ করেন। বাগদাদের প্রত্যেক গলিতে বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষের ঘরে এই দস্তরখান থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়। মাদরাসার শিক্ষকদের, ফকিহদের ও সহকারীদের সবাইকে মূল্যবান বস্তু উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও মূল্যবান উপহার পান। দিনটি ছিল স্মরণীয়। কবিরা খলিফার প্রশস্তি ও স্তব বর্ণনা করে উৎকৃষ্ট মানের কবিতা আবৃত্তি করেন। ইবনুস সায়ি[১১৫] তার ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনার বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন।

---

১১৫. ইবনুস সায়ি : আবু তালিব আলি ইবনে আনজাব ইবনে উসমান ইবনে আবদুল্লাহ (৫৯৩-৬৭৪ হি./১১৯৭-১২৭৫ খ্রি.)। বিখ্যাত ইতিহাসলেখক। বাগদাদে জন্ম ও মৃত্যু। আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহর গ্রন্থাগারের জিম্মাদার ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো পঁচিশ খণ্ডে রচিত *আল-জামিউল মুখতাছার ফি উনওয়ানিত তাওয়ারিখি ওয়া উয়ুনিস সিয়ার*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৬৫।

মাদরাসাটিতে শাফিয়ি মাযহাবের পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হয় ইমাম মুহিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইবনে ফাদলানকে[১১৬], হানাফি মাযহাবের পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হয় ইমাম আল্লামা রশিদুদ্দিন আবু হাফস উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল-ফারগানিকে[১১৭] এবং ইমাম মুহিউদ্দিন ইউসুফ ইবনে শাইখ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযিকে[১১৮] নিযুক্ত করা হয় হাম্বলি মাযহাবের পাঠদানের জন্য। সেদিন তার অনুপস্থিতিতে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস দান করেন তার পুত্র আবদুর রহমান[১১৯]। মুহিউদ্দিন ইউসুফ কোনো সম্রাটের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্বে ছিলেন। মালিকি মাযহাবের পক্ষে দরস দান করেন আশ-শাইখ আস-সালেহ আবুল হাসান আল-মাগরিবি আল-মালিকি। তিনিও অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দরস দান করেন। মালিকি মাযহাবের দরস দানের জন্য অন্য একজন শাইখকে নিযুক্ত করা হয়। গ্রন্থাগারও ওয়াকফ করা হয়। এটির গ্রন্থ-সমৃদ্ধি অভূতপূর্ব, কপিগুলোও চমৎকার, ওয়াকফকৃত গ্রন্থাবলিও অসাধারণ।[১২০]

আইয়ুবীয় সাম্রাজ্যে এত বেশি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা আমাদের মনোযোগ দাবি করে। এসব মাদরাসা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল

---

১১৬. ইবনে ফাদলান : মুহিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ ইবনে ফাদলান আল-বাগদাদি আশ-শাফিয়ি (মৃ. ৬৩১ হি./১২৩৩ খ্রি.)। আল-মাদরাসাতুল মুসতানসিরিয়্যাহর শিক্ষক, প্রধান বিচারক। শাফিয়ি মাযহাবের উঁচু স্তরের আলেম। খোরাসান ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার আলেমদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ১৩২।

১১৭. আল-ফারগানি : উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবু উমর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু নাসর আল-আন্দাকানি ৬৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে আবুল ওয়াফা আল-কুরাশি, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যা ফি তবাকাতিল হানাফিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬৬২-৬৬৩।

১১৮. ইউসুফ আল-জাওযি : মুহিউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনুল জাওযি আল-কুরাশি আল-বাগদাদি (৫৮০-৬৫৬ হি./১১৮৫-১২৫৮ খ্রি.)। 'আস-সাহিব ইবনুল জাওযি' নামে পরিচিত। আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি নামে পরিচিত। তার পিতা ও অন্যদের কাছে জ্ঞান অর্জন করেছেন। বাগদাদের অন্যায়-প্রতিরোধ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াকফ-পরিদর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন। তাতার ঘাতকরা তাকে হত্যা করে। তাদের প্রতিহত করতে গিয়ে তিনি ও তার তিন পুত্র শহিদ হন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ২৩৬।

১১৯. আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনুল জাওযি। তার পিতার সঙ্গে শহিদ হন। বাগদাদে হালাকুখানের অনুপ্রবেশের সময় (৬৫৬ হি./১২৫৮ খ্রি.) নিহত হন। তিনি তখন মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। তার একটি কাব্যসংকলন আছে। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৫, পৃ. ২০০।

১২০. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ. ১৩৯-১৪০।

শিয়া মতাদর্শের মূলোৎপাটন, যা আইয়ুবি শাসনের পূর্বে উবাইদিয়া রাজবংশের শাসনামল থেকে মিশরে শেকড় বিস্তার করে ছিল।

এ কারণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মিশরের সকল প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাদরাসা-প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এসব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছিলেন মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ এবং নিরাপত্তা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। ইবনুল আসির[১২১] ৫৬৬ হিজরির ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, মিশরে দারুল মাউনা নামে একটি পুলিশ-কেন্দ্র ছিল। তারা যাকে চাইত তাকেই এতে বন্দি করে রাখত। সালাহুদ্দিন এটি গুঁড়িয়ে দেন এবং এটিকে শাফিয়ি মাযহাবের মাদরাসায় রূপান্তরিত করেন। এখানে যেসব জোরজুলুম ও অন্যায়-অবিচার হতো সেগুলোর অবসান ঘটান।[১২২]

ইসলামি মিশরের ইতিহাসে মাদরাসা-নির্মাণে যিনি প্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন সালাহুদ্দিন। তিনি আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যা, আল-মাদরাসাতুন নাসিরিয়্যাহ ও আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যাহ[১২৩] প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৪]

আমির-উমারা, ধনাঢ্য বক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ীরাও মাদরাসা-প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতা করতেন। মাদরাসাগুলো যাতে চালু থাকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা এসে অবৈতনিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করতেন। অসংখ্য মানুষ তাদের বাড়িকে মাদরাসায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তারা তাদের সংগৃহীত গ্রন্থাবলি ও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মাদরাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফও করেছিলেন। এ

---

১২১. ইবনুল আসির, আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারিম আল-জাযারি (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ খ্রি.)। বিখ্যাত ও বিদগ্ধ ঐতিহাসিক। জাযিরা ইবনে উমরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মসুলে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الكامل في التاريخ, التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية, أسد الغابة في معرفة الصحابة, اللباب في تهذيب الأنساب। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২২, পৃ. ৩৫৪-৩৫৬।

১২২. ইবনুল আসির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ৩১-৩২।

১২৩. আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যাহ নামকরণের কারণ হলো এই মাদরাসায় নিযুক্ত ফকিহদের জন্য গমের (কাম্‌হ) চাষ করা হতো। মাদরাসাটির জন্য মধ্য মিশরের ফাইয়ুম এলাকায় এক বিশাল ভূমি ওয়াকফ করেছিলেন সালাহুদ্দিন। এখানে গমের চাষ হতো। দেখুন, ইবনে ওয়াসিল, *মুফাররিজ আল-কুরুব*, খ. ১, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

১২৪. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ৫, পৃ. ১৩৭।

কারণে প্রাচ্যে মাদরাসার সংখ্যা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তা ছিল আশ্চর্যজনক ও হতবুদ্ধিকর। এমনকি আন্দালুসীয় পর্যটক ইবনে জুবায়ের প্রাচ্যে মাদরাসার আধিক্য ও মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রাচুর্য দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমের লোকদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রাচ্যে আগমনের আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তাতে এ কথাও ছিল, প্রাচ্যের সব দেশেই শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়। বিশেষ করে দামেশকে সবচেয়ে বেশি...। আমাদের পশ্চিমের (মাগরিবের) সন্তানদের মধ্যে যারা সফলকাম হতে চায় তারা যেন এসব দেশে ভ্রমণ করে। তারা তালিবুল ইলমদের জন্য সহায়ক বস্তুরাশির প্রাচুর্য এখানে পাবে। তার প্রথমটি হলো জ্ঞানচর্চার জন্য রুটিরুজির চিন্তামুক্ত হওয়া।[১২৫]

সুলতানগণ এবং আমির-উমারা যে মাদরাসা-নির্মাণ ও মাদরাসায় সাহায্য-সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা করতেন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। গজনি ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সুলতান ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ নিজের জন্য কোনো ঘরও নির্মাণ করেননি, কিন্তু তিনি মাদরাসা-নির্মাণ ও সাহায্য-সহযোগিতায় সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন।[১২৬]

ইসলামি সভ্যতায় নারীদেরও এই সভ্যতার ছেলে-মেয়েদের জন্য হিতকর মাদরাসা নির্মাণের অধিকার ছিল। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বোন সাইয়িদা রাবিয়া খাতুন বিনতে আইয়ুব হাম্বলি মাযহাবের পাঠদানের জন্য দামেশকের কাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে আল-মাদরাসাতুস সাহিবিয়্যাহ (মাদরাসাতুস সাহিবাহ) প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১২৭]

বাগদাদে অবস্থিত মাদরাসাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে জুবায়ের বলছেন, বাগদাদে প্রায় ত্রিশটি মাদরাসা রয়েছে। সবগুলোই বাগদাদের পূর্বাংশে। প্রত্যেকটি মাদরাসার নির্মাণশৈলীর কাছে সুরম্য অট্টালিকাও তুচ্ছ। এসব মাদরাসার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত হলো নিযামিয়া মাদরাসা। এটি নির্মাণ করেছেন নিযামুল মুলক। ৫০৪ হিজরিতে মাদরাসাটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই মাদরাসার জন্য ওয়াকফের পরিমাণ বিপুল, ভূসম্পত্তিও প্রচুর। ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে মাদরাসায় শিক্ষক

---

১২৫. ইবনে জুবায়ের : *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২৫৮।

১২৬. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১২, পৃ. ১৫৭।

১২৭. প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩১৭।

হিসেবে নিযুক্ত ফকিহদের ব্যয়নির্বাহ করা হয় এবং অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়।[১২৮]

মিশরে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বপর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি বলছেন, মিশরে মাদরাসার সংখ্যা এত বেশি যে কেউ তার সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবে না।[১২৯] আল-মাকরিযি উল্লেখ করেছেন যে, মিশরে সত্তরটিরও বেশি মাদরাসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।[১৩০]

সেই সময়ে ইসলামি বিশ্বে মাদরাসার অবস্থা কীরূপ ছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় বুতরুস আল-বুস্তানি[১৩১] যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে তা থেকে। তাতে বলা হয়েছে, আরবদের মাদরাসাগুলো ছিল জ্ঞানে উজ্জ্বল, বাগদাদ থেকে কর্ডোভা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সেগুলো। তাদের মহাবিদ্যালয় ছিল সতেরোটি। কর্ডোভার মহাবিদ্যালয়টি ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। বলা হয়ে থাকে, এই মহাবিদ্যালয়ে যে গ্রন্থাগার ছিল তাতে ৬ লাখ কপি বই ছিল। তারা রূপমূলতত্ত্ব (ইলমুস সারফ), ব্যাকরণ, ছন্দতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করত। তাদের প্রত্যেক মসজিদের পাশে প্রাথমিক মাদরাসা ছিল। এতে তারা পাঠ ও হস্তলিপি শিক্ষা দিত।[১৩২]

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এসব মাদরাসায় পঠনপাঠন কেবল ধর্মীয় জ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রকৃতিবিজ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হতো। যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদি। বরং কিছু কিছু মাদরাসা এসব প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ায় বিশেষায়িত ছিল।

---

১২৮. ইবনে জুবায়ের, *রিহলাহ ইবনে জুবায়ের*, পৃ. ২০৫।

১২৯. *রিহলাহ ইবনে বতুতা*, পৃ. ২০।

১৩০. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ২, পৃ. ৩৬২-৪০০।

১৩১. বুতরুস আল-বুস্তানি (১৮১৯-১৮৮৩ খ্রি.) : বুতরুস ইবনে পল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কারাম আল-বুস্তানি। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি লেবাননের খারুব প্রদেশের দিব্বিয়ায় একটি ম্যারোনাইট খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৩, পৃ. ৪৮।

১৩২. বুতরুস আল-বুস্তানি, *দাইরাতুল মাআরিফ*, খ. ৬, পৃ. ১৬১-১৬২; আবদুল্লাহ মাওখি, *মাওকিফুল ইসলাম ওয়াল-কানিসাহ মিনাল ইলম*, পৃ. ৫৯ থেকে উদ্ধৃত।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের জন্য কয়েকটি বিশেষ মাদরাসা ছিল। হাসপাতালগুলোতে তারা চিকিৎসাশাস্ত্র শেখাত।[১৩৩]

আন্দালুসে প্রাথমিক মাদরাসা ছিল অসংখ্য। তবে এসব মাদরাসায় শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি ছিল। এ কারণে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় হাকাম (মৃ. ৩৬৬ হি.) দরিদ্র মানুষের সন্তানদের বিনা পয়সায় শিক্ষাদানের জন্য সাতাশটি মাদরাসা বৃদ্ধি করেছিলেন। মেয়েরাও ছেলেদের মতো মাদরাসায় যেত, সমানভাবেই।

উচ্চশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন স্বতন্ত্র পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। তারা এসব মাদরাসায় বক্তৃতা দিতেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ডরূপে যে শিক্ষাকাঠামো রয়েছে তা আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের সময় গঠিত হয়েছে। একইভাবে গ্রানাডা, তুলাইতালা (টলেডো), সেভিল, মুরসিয়া (Murcia), আলমেরিয়া, ভ্যালেন্সিয়া ও কাদিজে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১৩৪]

মাগরিবের আমির-উমারা ও সুলতানগণ মাদরাসা-নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন। মুরাবিত রাজন্যবর্গ নগরীতে ও প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে সুস অঞ্চলে[১৩৫] বহু মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। এসব মাদরাসা বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম দিয়েছে। এমন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। তাদের জ্ঞান তাদেরকে ইসলামি বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষদের কাতারে জায়গা করে দিয়েছে। সুস অঞ্চলে মাদরাসা ছিল প্রায় চারশ। মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি[১৩৬] তার রচিত গ্রন্থ '*সুস আল-আলিমা*'-য় সুসের প্রঞ্চাশটি মাদরাসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন[১৩৭]

---

১৩৩. প্রাগুক্ত।

১৩৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ৩০৬।

১৩৫. Souss-Massa-Drâa.

১৩৬. আল-মুখতার আস-সুসি : মুহাম্মাদ আল-মুখতার ইবনে আলি ইবনে আহমাদ আল-ইলগি আস-সুসি (১৩১৮-১৩৮৩ হি./১৯০০-১৯৬৩ খ্রি.) ছিলেন ইতিহাসবিদ, ফকিহ, আদিব। তিনি মুখে মুখে কবিতা বলতেন। ওয়াজির আত-তাজ হিসেবে পরিচিত। তার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : رجال العلوم العربية في سوس، خلال جزولة في أربعة أجزاء، المعسول في عشرين جزءا.। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৯৩।

১৩৭. মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি, *সুস আল-আলিমা*, পৃ. ১৫৪-১৬৭।

এবং *'মাদারিস সুস আল-আতিকা'* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন একশটি মাদরাসা সম্পর্কে।[১৩৮]

মুসলিম গোত্রগুলোই এসব মাদরাসার অর্থায়ন করত। তাদের ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশের কিয়দংশ এসব মাদরাসার জন্য নির্ধারিত ছিল। মাদরাসার সুরক্ষা ও খরচাদির জন্য তারা মালিকানাধীন অনেক সম্পত্তি ওয়াকফও করে দিয়েছিল। মাদরাসার যাবতীয় ব্যয়ভার তারা বহন করত। সুস অঞ্চলের মুসলিম গোত্রগুলো পাহাড়ে ও সমতলভূমিতে মাদরাসা-নির্মাণের প্রতিযোগিতা করত। প্রত্যেক গোত্রেরই মাদরাসা থাকত একটি বা দুটি বা তিনটি। মুরাবিত রাজন্যবর্গের শাসনামলে যেসব মাদরাসা নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো—ইতিপূর্বে যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও—'মাদারিসে সাবতা'[১৩৯]। এ ছাড়া তানজা[১৪০], আগমাত[১৪১], সিজিলমাসা[১৪২], তিলিমসান[১৪৩] ও মারাকেশে কয়েকটি বিখ্যাত মাদরাসা রয়েছে। এসব মাদরাসা কায়রাওয়ানের জ্ঞানসম্ভার এবং আন্দালুসের বিখ্যাত সংস্কৃতির আশ্রয়ে গড়ে উঠেছিল। বড় বড় মনীষীর জন্ম হয়েছে এসব মাদরাসা থেকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন কাজি ইয়ায[১৪৪] এবং আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ[১৪৫]। তিনি *কিতাবুল মুকাদ্দিমাতিল আওয়ায়িলি লিল-মুদাওয়ানাতি*,

---

১৩৮. মুহাম্মাদ আল-মুখতার আস-সুসি, *মাদারিস সুস আল-আতিকা*, পৃ. ৯৩-১৩৪।

১৩৯. সাবতা : Ceuta, Spain.

১৪০. তানজা : Tangier, Morocco.

১৪১. আগমাত : Aghmat, Morocco.

১৪২. সিজিলমাসা : Sijilmassa, Morocco.

১৪৩. তিলিমসান : Tlemcen, Algeria.

১৪৪. কাজি ইয়ায : আবুল ফযল ইয়ায ইবনে মুসা ইবনে ইয়ায আল-ইয়াহসুবি আস-সাবতি (৪৭৬-৫৪৪ হি./১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.)। হাদিস, ইলমুল হাদিস, ব্যাকরণ, ভাষা, আরবদের কথা, ইতিহাস ও বংশতালিকাবিদ্যা ইত্যাদিতে তার যুগের ইমাম ছিলেন। তার জন্ম সাবতায় এবং তিনি এখানকার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর তিনি গ্রানাডার বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছেন। মারাকেশে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪৮৩-৪৮৫।

১৪৫. ইবনে রুশদ : আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি (৫২০-৫৯৫ হি./১১২৬-১১৯৮ খ্রি.)। ইবনে রুশদ আল-হাফেয (নাতি ইবনে রুশদ) নামে বিখ্যাত। তিনি দার্শনিক ইবনে রুশদের নাতি। কাজি ইয়াযের শিক্ষক। কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কর্ডোভার প্রধান বিচারক ছিলেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২১, পৃ. ৩০৭-৩০৯; ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭।

আল-বায়ান ওয়াত-তাহসিল ওয়াত-তাওজিহ ওয়াত-তালিল ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৪৬]

যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার তা এই যে, প্রাচ্যের ও মাগরিবের (মরক্কোর) এসব শিক্ষার্থীরা পর্যাপ্ত ভরণপোষণ পেত। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অর্থ—সবই পেত তারা। এ কারণেই ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহরের পরিচয় ঘটেছে পাশ্চাত্যের চেয়ে কয়েকশ বছর আগে। ৭২১ হিজরিতে মরক্কোয় মারিনীয়[১৪৭] সাম্রাজ্যের সুলতান আবু সাইদ উসমান ইবনে ইয়াকুব (মৃ. ৭৩১ হি.)[১৪৮] নতুন ফাসে (নিউ ফেজ) যে মাদরাসাটি রয়েছে তা নির্মাণের নির্দেশ দেন। একটি মজবুত ও সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। কুরআন অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের ভর্তি করেন এবং শিক্ষকতার জন্য ফকিহদের নিযুক্ত করেন। তাদের জন্য মাসিক ভাতা, বেতন ও অন্যান্য খরচাদি নির্ধারণ করে দেন। মাদরাসাটির জন্য বাড়ি ও ভূসম্পত্তি ওয়াকফ করেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশাতেই তিনি এসব কাজ সম্পাদন করেন।[১৪৯]

মরক্কোর মারিনীয় যেসব সুলতান মাদরাসা-নির্মাণের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সুলতান আবু সাইদ। ৭২৩ হিজরির শাবান মাসের শুরুতে সুলতান আবু সাইদ ফাসে জামে আল-কারায়্যিয়িনের পাশে (উত্তরে) সবচেয়ে বড় মাদরাসাটি নির্মাণের নির্দেশ দেন। সেটি আজ মাদরাসাতুল আত্তারিন নামে পরিচিত। মাদরাসাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন শাইখ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে কাসিম আল-মিযওয়ার এবং একদল ফকিহ ও কল্যাণকামী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে

---

১৪৬. হাসান আস-সায়িহ, *আল-হাদারাতুল মাগরিবিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ৬৪।

১৪৭. المرينيون/The Marinid Sultanate.

১৪৮. আবু সাইদ উসমান ইবনে ইয়াকুব ইবনে আবদুল হক (৬৭৫-৭৩১ হি./১২৭৫-১৩৩১ খ্রি.) ছিলেন মরক্কোর দশম মারিনীয় সুলতান। তিনি একুশ বছর চারমাস রাজত্ব পরিচালনা করেন। তিনি ১৩২৩-২৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসাতুল আত্তারিন নির্মাণ করেন। এটি মরক্কোয় নির্মিত অন্যতম সুন্দর মাদরাসা। বিস্তারিত জানতে দেখুন, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে খালিদ আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৩, পৃ. ১০৩-১১৬; ইসমাইল ইবনুল আহমার, *রাওযাতুন নিসরিন ফি দাওলাতি বানি মারিন*, পৃ. ২৩-২৪।

১৪৯. আবুল আব্বাস আন-নাসিরি, *আল-ইসতেকসা লি-আখবারি দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা*, খ. ৩, পৃ. ১১১-১১২।

সুলতান আবু সাইদ নিজেও উপস্থিত থাকেন। মাদরাসাটির নির্মাণকাজ সুলতানের উপস্থিতিতেই শুরু হয়। নির্মাণকাজ শেষ হলে এই মাদরাসা মারিনীয় সাম্রাজ্যের আশ্চর্যজনক স্থাপত্যে পরিণত হয়। তার আগে কোনো সুলতান এমন মাদরাসা নির্মাণ করেননি। মাদরাসার প্রাঙ্গণে সেখানকার ঝরনা থেকে প্রবহমান পানি আনার জন্য নালা তৈরি করা হয়। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে ওঠে। সুলতান মাদরাসাটির জন্য একজন ইমাম, দুজন মুয়াজ্জিন ও একদল কর্মচারী নিয়োগ দেন। শিক্ষকতার জন্য ফকিহদের নিযুক্ত করেন। মাদরাসার প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেন পর্যাপ্তেরও বেশি ভাতা, বেতন ও খোরপোশ। কয়েকটি তালুক কিনে তা মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেন এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই।[১৫০]

অসংখ্য মাদরাসা নির্মিত হয়েছে বলে মামলুক শাসনামলের খ্যাতি রয়েছে। মামলুক আমির-উমারা ও সুলতানরা ধর্মীয় ও সাধারণ মাদরাসা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করেছেন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অট্টালিকা ও ভবন নির্মাণ করেছেন। এসব মাদরাসায় তারা শ্রেষ্ঠ ও বড় বড় আলেমদের নিযুক্ত করেছেন। শাইখ ইযযুদ্দিন আবদুল আযিয ইবনে আবদুস সালাম[১৫১] ৬৫০ হিজরিতে বাইনাল কাসরাইন[১৫২]-এ অবস্থিত আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় পাঠদান করেছেন।[১৫৩] এই মাদরাসায় ৬৮০ হিজরিতে পাঠদান করেছেন তাকিউদ্দিন ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয[১৫৪]। ৭৭৯

---

১৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১২।

১৫১. আল-ইয ইবনে আবদুস সালাম : আবদুল আযিয ইবনে আবদুস সালাম আদ-দিমাশকি (৫৭৭-৬৬০ হি./১১৮১-১২৬২ খ্রি.)। তার লকব বা উপাধি হলো ইযযুদ্দিন। তিনি সুলতানুল উলামা (আলেমদের সম্রাট) হিসেবে পরিচিত। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী ফকিহ, মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। মিশরের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *আত-তাফসিরুল কাবির*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২১।

১৫২. এটি ফাতেমীয় রাজবংশের শাসনামলের দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী এলাকা বা ময়দান বা সড়ক। ময়দানের পুব পাশের বড় প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন খলিফা আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ এবং পশ্চিম পাশের ছোট প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহর পুত্র খলিফা আল-আযিয বিল্লাহ। এই ময়দানে দশ হাজার সৈন্য কুচকাওয়াজ করতে পারত।-অনুবাদক।

১৫৩. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৫, পৃ. ৪৮৫।

১৫৪. তাকিউদ্দিন ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয : মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে খালফ আল-আলায়ি (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৬ খ্রি.), কাজি শিহাবুদ্দিন ইবনে কাজি আলাউদ্দিন ইবনে কাজিউল কুযাত তাজুদ্দিন, ইবনে বিন্‌ত আল-আ'আয আল-মিশরি আশ-

হিজরিতে আল-মাদরাসাতুন নাসিরিয়্যায় পাঠদান করেছেন সিরাজুদ্দিন আল-বুলকিনি[১৫৫]। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনে খালদুন ৭৮৬ হিজরিতে পাঠদান করেছেন আল-মাদরাসাতুল কামহিয়্যায় এবং মামলুক রাজবংশের ইতিহাসজুড়ে প্রখ্যাত আলেম-উলামা এসব মাদরাসায় পাঠদান করেছেন।[১৫৬]

আলেম-উলামা, ফকিহগণ, সাধারণ মানুষ এবং তাদের সঙ্গে সুলতানরাও কোনো মাদরাসা উদ্বোধনের সময় বড় ধরনের মাহফিল ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। ৬৬১ হিজরিতে আল-মালিক আয-যাহির বাইবার্স আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ উদ্বোধন করেন। বাইনাল কাসরাইন-এ মাদরাসা-ভবনের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে এখানে আলেম-উলামা সবাই সমবেত হন। কারিরা উপস্থিত হন এবং প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীরা তাদের জন্য নির্ধারিত হলঘরে বসেন। হানাফি মাযহাবের পাঠদানের সূচনা করেন মাজদুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনুস সাহিব কামালুদ্দিন ইবনুল আদিম, শাফিয়ি মাযহাবের পাঠদানের সূচনা করেন শাইখ তাকিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে রাযিন। কুরআনের দরসদানের সূচনা করার জন্য মনোনীত করা হয় ফকিহ কামালুদ্দিন আল-মাহাল্লিকে এবং হাদিসে নববির পাঠদানের সূচনা করার জন্য শাইখ শারফুদ্দিন আবদুল মুমিন ইবনে খাল্‌ফ আল-দিময়াতিকে মনোনীত করা হয়। তারা সবাই দরসদান করেন। দস্তরখানা বিছানো হয়। জামালুদ্দিন আবুল হাসান আল-জাযযার[১৫৭] কবিতা আবৃত্তি করেন ...। আরও কয়েকজন কবি কবিতা পাঠ করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সিরাজ আল-ওয়াররাক, শাইখ

শাফিয়ি নামে পরিচিত। দেখুন, আল-ফাসি, *যাইলুত তাকলিদ ফি রুওয়াতিস সুনান ওয়াল আসানিদ*, খ. ১, পৃ. ৫২।

১৫৫. সিরাজুদ্দিন আল-বুলকিনি : আবু হাফ্‌স উমর ইবনে রাসলান ইবনে নাসির ইবনে সালিহ আল-কিনানি (৭২৪-৮০৫ হি./১৩২৪-১৪০৩ খ্রি.)। মুজতাহিদ, হাফেযে হাদিস, শাফিয়ি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম। মিশরের পশ্চিমাঞ্চল বুলকিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ৭৬৯ হিজরিতে শামের (সিরিয়ার) বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। জামে ইবনে তুলুন ও আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাতে তাফসিরের পাঠদান করেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৪৬।

১৫৬. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭; খ. ৫, পৃ. ১৬৩।

১৫৭. আল-জাযযার : ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল আযিম ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ (৬০১-৬৭৯ হি./১২০৪-১২৮০ খ্রি.)। মিশরের প্রখ্যাত কবি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৫৩।

জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনুল খাশশাব। তাদের সবাইকে সম্মানসূচক পোশাক পরিধান করানো হয়। দিনটি ছিল স্মরণীয়। সুলতান এই মাদরাসাকে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থের ভান্ডারে পরিণত করেন। মাদরাসার পাশেই এতিমদের জন্য একটি মক্তব নির্মাণ করেন। মক্তবের এতিম শিশুদের জন্য প্রতিদিন রুটি এবং প্রত্যেক শীতে ও গ্রীষ্মে পোশাক বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১৫৮]

অসংখ্য মামলুক আমির ছিল যারা তাদের বাড়ির পাশে মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। মাদরাসার প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহ থেকেই তারা এ কাজটি করেছেন। ৭৩০ হিজরিতে আমির আলাউদ্দিন মুগলতাই আল-জামালি[১৫৯] তার বাড়ির পাশে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। মাদরাসাটি কায়রোর দারব-মুলুখিয়ার কাছেই। তিনি এই মাদরাসার জন্য বহু সম্পত্তি ওয়াকফ করেন।[১৬০]

মামলুক শাসনামলে কিছু মাদরাসা পাঠদানের পাশাপাশি আরও একটি ভূমিকা পালন করত। এসব মাদরাসা বিচারালয় ও আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বড় বড় অপরাধের বিচার-মীমাংসা হতো। ইবনে সাবআ নামের এক লোক ছিল ভয়ংকর অপরাধী। তার বিচার হয়েছিল এমন একটি মাদরাসা-আদালতে। শাফিয়ি মাযহাবপন্থী ফকিহগণ তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে বন্দি করেন। অন্যদিকে মালিকি মাযহাবপন্থী ফকিহগণ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং হত্যা করার নির্দেশ দেন। বাইনাল কাসরাইন-এ অবস্থিত আল-মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় ৭৯১ হিজরিতে এই বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।

---

১৫৮. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল* মুলুক, খ. ২, পৃ. ৩।

১৫৯. মুগলতাই : আবু আবদুল্লাহ আলাউদ্দিন মুগলতাই ইবনে কালিজ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসরি আল-হানাফি (৬৮৯-৭৬২ হি./১২৯০-১৩৬১ খ্রি.)। তুর্কি বংশোদ্ভূত আরব। হাফেযে হাদিস, মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ, বংশতালিকাবিশেষজ্ঞ। হানাফি মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম। মিশরের আল-মাদরাসাতুল মুযাফফারিয়্যায় হাদিসের দরসদান করেন। তিনি শাস্ত্রীয় সমালোচক ছিলেন। বহু মুহাদ্দিস ও ভাষাবিদের বিপক্ষে তার সমালোচনামূলক বক্তব্য রয়েছে। একশরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলো বিশ খণ্ডে মুদ্রিত *সহিহুল বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ২৭৫।

১৬০. মাকরিযি, *আস-সুলুক লি-মারিফাতি দুওয়ালিল* মুলুক, খ. ৩, পৃ. ১৩৩।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental science) ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের (Applied Science) জন্য বিশেষায়িত কিছু মাদরাসাও ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য কিছু বিশেষ মাদরাসা। যেমন দামেশকের আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ আল-বারানিয়্যাহ। এই মাদরাসায় মুসলিমবিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটেছিল। ৭২৪ হিজরিতে সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী নাজমুদ্দিন আবদুর রহিম ইবনে আশ-শাহহাম আল-মাওসিলি[১৬১] অতিথি শিক্ষক হিসেবে আল-মাদরাসাতুয যাহিরিয়্যাহ আল-বারানিয়্যাহতে যোগদান করেন। তার আগে তিনি উজবেকের (উজবেকিস্তানের) বিভিন্ন দেশে কয়েক বছরব্যাপী ভ্রমণ করে চিকিৎসাশাস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।[১৬২]

দামেশকে আল-মাদরাসাতুদ দাখওয়ারিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় জামে আল-উমায়ির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই। এটি ছিল সিরিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মাদরাসা ও চিকিৎসামহাবিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৬২১ হিজরিতে।[১৬৩] মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রখ্যাত শামীয় (সিরিয়ান) চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ আদ-দাখওয়ার আবদুর রহিম ইবনে আলি হামিদ[১৬৪]। তিনি ছিলেন এই মাদরাসার ওয়াক্ফকারী (মুতাওয়াল্লি) ও চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান (শাইখুত তিব্ব)। বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে আবি উসাইবিআ[১৬৫] তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি ছিলেন অনন্য ও যুগশ্রেষ্ঠ,

---

১৬১. আবদুর রহিম ইবনে আশ-শাহহাম আল-মাওসিলি : নাজমুদ্দিন ইবনে আশ-শাহহাম আশ-শাফিয়ি (৬৫৩-৭৩০ হি.) প্রাথমিক জীবনে ফিকহে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ৭২৪ হিজরিতে দামেশকে আসেন। খানকাহ আল-কাসরাইনের প্রধান শাইখরূপে বরিত হন। শাফিয়ি মাযহাবের স্বনামধন্য ফকিহ ছিলেন। ছিলেন চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, খ. ৩, পৃ. ১৫০।

১৬২. আবদুল কাদির আন-নুয়াইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ২৬১।

১৬৩. অন্যদিকে জামে আল-উমায়ির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ৭১৫ হিজরিতে।

১৬৪. মুহাযযাবুদ্দিন আদ-দাখওয়ার : আবদুর রহিম ইবনে আলি ইবনে হামিদ আদ-দাখওয়ার (৫৬৫-৬২৮ হি./১১৭০-১২৩০ খ্রি.)। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। আইয়ুবীয় সুলতান আল-মালিক আল-আদিলের সঙ্গে দেখা করেন। তার চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ الجنينة (The Embryo) ও مختصر الحاوي للرازي। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭।

১৬৫. ইবনে আবি উসাইবিআ : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনুল কাসিম ইবনে খলিফা (৫৯৬-৬৬৮ হি./১২০০-১২৭০ খ্রি.)। চিকিৎসক, ইতিহাসবিদ। উয়ুনুল *আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি সিরিয়ার সারখাদে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, মুহাম্মাদ আল-খলিলি, *উদাউল আতিব্বা*, খ. ১, পৃ. ৫২।

সমকালে তার মতো কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের শীর্ষগুরু এবং তিনি এর উপযুক্তও ছিলেন। চিকিৎসা-গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। অবশেষে যুগশ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদে পরিণত হয়েছেন এবং রাজাবাদশাদের কাছে মূল্যায়ন পেয়েছেন।[১৬৬]

মিশরে কিছু মাদরাসা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের। এগুলোতে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগ ছিল। যেমন আল-মাদরাসাতুল মানসুরিয়্যাহ। কায়রোর বাইনাল কাসরাইনে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মিশরের সুলতান আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আল-আলফি। তাতে ফিকহি মাযহাবভিত্তিক পাঠদানের আলাদা আলাদা বিভাগ ছিল। প্রত্যেক মাযহাবের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও নির্ধারিত স্থান ছিল। একইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠদানের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। হাদিস বিভাগ ছিল, তাফসিরুল কুরআন বিভাগ ছিল। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও পণ্ডিতগণ এসব বিভাগে পাঠদান করতেন।[১৬৭]

কতিপয় ঐতিহাসিক রচনায় প্রত্যেক শহরে অবস্থিত উপরিউক্ত মাদরাসাগুলোর হাল-হাকিকত বর্ণনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মাদ আন-নুয়াইমি আদ-দিমাশকি (মৃ. ৯২৭ হি.) الدارس في تاريخ المدارس *(আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস)* নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে নিম্নবর্ণিত অধ্যায়গুলো রয়েছে :

فصل : دور القران الكريم (অধ্যায় : কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : دور الحديث الشريف (অধ্যায় : হাদিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : دور القرآن والحديث معا (অধ্যায় : কুরআন ও হাদিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ)

فصل : مدارس الطب (অধ্যায় : চিকিৎসা-বিদ্যালয়সমূহ)

فصل : الخوانق (অধ্যায় : খানকা)

فصل : الرباطات (অধ্যায় : রাবাত বা সুফিগৃহসমূহ)

---

১৬৬. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ৪, পৃ. ৩১৮।
১৬৭. মাকরিযি, *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*, খ. ৩, পৃ. ৪৮০।

فصل : الزوايا (অধ্যায় : যাবিয়াসমূহ)[১৬৮]

فصل : الترب (অধ্যায় : কবরস্থানসমূহ)

فصل : المساجد والجوامع (অধ্যায় : ছোট মসজিদ ও জামে মসজিদসমূহ)

এসব অধ্যায় ছাড়া তিনি একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করেছেন। তার বর্ণনাশৈলী এরূপ : প্রথমে তিনি মাদরাসা বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছেন, সেটির অবস্থান কোথায় তার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত সম্পত্তির সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। তারপর লেখকের জীবদ্দশা পর্যন্ত মাদরাসায় যে-সকল শিক্ষক পাঠদান করেছেন তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ করেছেন। জ্ঞাতব্য যে, এই গ্রন্থে কেবল দামেশকের মাদরাসা ও মসজিদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, অন্যকোনো শহরের নয়।

আল-মাকরিযিও তার রচিত বিখ্যাত বিশ্বকোষ *আল-মাওয়ায়িয ওয়াল-ইতিবারি বিযিকরিল খুতাতি ওয়াল-আসার*-এ মাদরাসার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এক বিরাট কীর্তি রেখে গেছেন। আইয়ুবি শাসনামল ও মামলুকি শাসনামলে কায়রোতে যত মাদরাসা ছিল তার সবগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬৯]

মুসলিমরা ইসলামি সমাজের সর্বস্তরে মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সভ্যতা জ্ঞানকে যাবতীয় প্রগতি ও উন্নতির ভিত্তি বলে স্থির করেছে এবং ধনী ও দরিদ্র, বড় ও ছোট, পুরুষ ও নারী সকলের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ফলে ইসলামি সভ্যতা কয়েক শতাব্দীব্যাপী জ্ঞানগত উৎকর্ষের চূড়ায় অবস্থান করেছে।

---

১৬৮. الزاوية এর বহুবচন الزوايا। এখানে এর অর্থ : জামে মসজিদ নয় এমন ছোট মসজিদ, যাতে মিম্বার নেই। অথবা, সুফি ও আবেদদের আশ্রয়স্থল। এগুলোতে জ্ঞানের চর্চা হতো।

১৬৯. ড. ফাতহিয়্যাহ আন-নাবরাবি, *তারিখুন নুযুমি ওয়াল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২২৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামি সভ্যতায় গ্রন্থাগার

এটা কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয় যে মুসলিম খলিফাগণ গণগ্রন্থাগার নির্মাণে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এসব গ্রন্থাগারে আরবির ও অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থের সমাহার ঘটিয়েছেন। নিশ্চয় ইসলাম—আমরা যেমন দেখেছি—জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং জ্ঞান-অন্বেষণ, শিক্ষাগ্রহণ, পড়ালেখার মধ্য দিয়ে বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত ও আলোকিত করতে আহ্বান জানায়। একইভাবে জীবনের সব বিষয়ে চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করে।

ইসলামে গ্রন্থাগারের ইতিহাস মূলত ইসলামি আরব সভ্যতার ও ইসলামি চিন্তার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধির ইতিহাস মানে সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস, গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ও উৎকর্ষের ফলে সভ্যতার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, ইসলামি চিন্তা পেয়েছে পরিপক্বতা। গ্রন্থের ইতিহাস মুসলিমদের কাছে একটি মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবীয় জ্ঞানের যে বিকাশ তার তথ্যতালাশের জন্য এটা জরুরি। গ্রন্থপ্রেম, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান এবং জ্ঞানচর্চায় মুসলিমদের চেয়ে অগ্রগামী ও উন্নত কোনো জাতি নেই। যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের বিকাশে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামে গ্রন্থাগারের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। এটি চিরন্তন ইসলামি সভ্যতার একটি দান। সাধারণভাবে ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহ যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে সেগুলো মূলত ইসলামি সভ্যতারই পর্যায়।[১৭০]

ইসলামি সভ্যতায় কয়েক ধরনের গ্রন্থাগার খ্যাতি কুড়িয়ে নিয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এসব গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : গ্রন্থাগার ও তার প্রকারসমূহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাগদাদ গ্রন্থাগার (ক্রমবিকশিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়)

---

১৭০. সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইল আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, পৃ. ২।

প্রথম অনুচ্ছেদ

গ্রন্থাগার ও তার প্রকারসমূহ

ইসলামি সভ্যতা কয়েক ধরনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পরিচিত, যা অন্যকোনো সভ্যতার বেলায় ঘটেনি। ইসলামি সাম্রাজ্যের সব প্রান্তেই এসব গ্রন্থাগার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। খলিফাদের প্রাসাদে গ্রন্থাগার যেমন ছিল, তেমনই ছিল মাদরাসায়, মক্তবে ও মসজিদে। রাজ্যসমূহের রাজধানীতে গ্রন্থাগার যেমন পাওয়া যেত তেমনই পাওয়া যেত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও অজপাড়া গাঁয়ে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সভ্যতার সন্তানদের অন্তরে জ্ঞানপ্রেম কতটা বদ্ধমূল ছিল। ইসলামি সভ্যতায় যেসব শ্রেণির গ্রন্থাগার পরিচিতি পেয়েছিল তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. একাডেমিক গ্রন্থাগার : এই শ্রেণির গ্রন্থাগার ইসলামি সভ্যতায় সবচেয়ে বিখ্যাত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাগদাদ গ্রন্থাগার (বাইতুল হিকমা)। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

২. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার : ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলে ও সব প্রান্তে এই শ্রেণির গ্রন্থাগার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। যেমন : ১. খলিফা আল-মুসতানসিরের গ্রন্থাগার[১৭১]। ২. ফাত্‌হ ইবনে খাকানের গ্রন্থাগার; খাকান যখন হাঁটতেন জামার আস্তিনে বই রাখতেন এবং তা দেখতেন।[১৭২] ৩. বুয়িহ রাজবংশের (Buyid dynasty) খ্যাতিমান উজির ইবনুল আমিদের গ্রন্থাগার। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে মিসকাওয়াইহ[১৭৩] উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এই ইবনুল আমিদ

---

১৭১. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬।

১৭২. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ১৮, পৃ. ৩৭৫।

১৭৩. ইবনে মিসকাওয়াইহ : আবু আলি আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মিসকাওয়াইহ (৩২০-৪২১ হি./৯৩২-১০৩০ খ্রি.)। ইরানের রাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইস্পাহানে বসবাস করেন। ইতিহাসবিদ, দার্শনিক, রসায়নশাস্ত্রবিদ। তিনি বিশটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।-অনুবাদক

গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। একবার ইবনুল আমিদের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এই বাড়িতেই তার গ্রন্থাগারটি ছিল। চুরির ঘটনার পর ইবনুল আমিদ তার গ্রন্থাগারের জন্য অত্যধিক বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তার ধারণা হয় অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার গ্রন্থাগারও চুরি হয়ে গেছে। ইবনে মিসকাওয়াইহের এই ঘটনার উল্লেখের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে ইবনুল আমিদের গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ ছিল এতে। ইবনে মিসকাওয়াইহ বলেছেন, ইবনুল আমিদের মন তার সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এগুলোর চেয়ে মূল্যবান ও দামি কিছু ছিল না তার কাছে। পাণ্ডুলিপি ছিল অনেক। সব ধরনের জ্ঞানরত্ন দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল এ পাণ্ডুলিপিগুলো। হিকমা, দর্শন ও সাহিত্যের পাণ্ডুলিপিও ছিল। একশটি বোঝা[১৭৪] তৈরি করে এগুলো বহন করা হতো। আমাকে দেখে তিনি গ্রন্থাগারের কী অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, গ্রন্থাগার সুরক্ষিত আছে। কেউ তাতে হাত দেয়নি। আমার কথায় তিনি সান্ত্বনা পেলেন। বললেন, তুমি সৌভাগ্যবান। অন্যান্য যত গ্রন্থাগার আছে সেগুলোর পরিপূরক বা বিকল্প আছে, কিন্তু আমার এই গ্রন্থভান্ডারের কোনো বিকল্প নেই। আমি তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখলাম। আমাকে বললেন, সকালে গ্রন্থভান্ডারের সব গ্রন্থ নিয়ে অমুক স্থানে যাবে। সকালে আমি তা-ই করলাম। তার গ্রন্থভান্ডার তার অন্যান্য সম্পদ থেকে আলাদা করে সুরক্ষিত রাখা হলো।[১৭৫] ৪. কাজি আবুল মুতাররাফের গ্রন্থাগার। তিনি তার এই গ্রন্থাগারে এত এত বই সংগ্রহ করেছিলেন যে তৎকালীন আন্দালুসের কেউই তা করতে পারেননি।[১৭৬]

৩. **গণগ্রন্থাগার** : এসব গ্রন্থাগার মূলত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা সংস্থা। এগুলোতে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে। সর্বস্তরের, সব শ্রেণির, সব বয়সের, সব পেশার ও সব ধর্মের মানুষের নাগালে থাকে এসব গ্রন্থাগার। ইসলামি সভ্যতায় এসব গ্রন্থাগারও অনেক। যেমন কর্ডোভা গ্রন্থাগার। উমাইয়া খলিফা আল-হাকাম আল-মুসতানসির ৩৫০ হিজরিতে/৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গ্রন্থাগারটির দেখভাল করার জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিযুক্ত

---

১৭৪. জন্তুর পিঠে বা মানুষের মাথায় চাপানোর জন্য তৈরি বোঝা।

১৭৫. ইবনে মিসকাওয়াইহ, *তাজারিবুল উমাম*, খ. ৬, পৃ. ২৮৬।

১৭৬. যাহবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ২৮, পৃ. ৬১।

করেন। অনুলিপিকারীদের নিয়ে আসেন। বহুসংখ্যক পুস্তক-বাঁধাইকারী নিয়োগ দেন। গ্রন্থাগারটি আন্দালুসে আলেম-উলামা ও বিদ্যার্থীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইউরোপীয়রাও এই গ্রন্থাগারের প্রস্রবণে পরিতৃপ্ত হতে এবং জ্ঞানের পাথেয় সংগ্রহ করতে আন্দালুসে আগমন করে। গ্রন্থাগারটিতে সুরক্ষিত বইপুস্তকের নামের তালিকা বা গ্রন্থসূচি ছিল চুয়াল্লিশটি, প্রতিটি তালিকায় পাতা ছিল বিশটি। এসব গ্রন্থসূচিতে কেবল নামাবলিই স্থান পেয়েছিল।[১৭৭] আরও একটি বিখ্যাত গণগ্রন্থাগার হলো শামের (সিরিয়ার) ত্রিপোলির বানি আম্মার গ্রন্থাগার (মাকতাবা বানি আম্মার)। তাদের প্রতিনিধিদল ছিল, তারা মুসলিমবিশ্বের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াত এবং মূল্যবান গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করে এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করত। গ্রন্থাগারটির অনুলিপিকারী ছিল পঁচাশিজন। তারা দিনরাত গ্রন্থের অনুলিপি তৈরিতে ব্যস্ত থাকত।

৪. মাদরাসার গ্রন্থাগার : ইসলামি সভ্যতা সব মানুষের শিক্ষাদীক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে এসব মাদরাসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে থেকেছে গ্রন্থাগার। এটা ছিল সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষে পরিপূর্ণতা দানকারী স্বাভাবিক বিষয়। ইসলামে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মাদরাসার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বিশেষ করে ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও পার্শ্ববর্তী দেশের শহরগুলোতে। ইসলামি মাদরাসার অধিকাংশেরই ছিল নিজস্ব গ্রন্থাগার। নুরুদ্দিন মাহমুদ দামেশকে একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং এতে একটি গ্রন্থাগার যুক্ত করেন। সালাহুদ্দিন আইয়ুবিও মাদরাসার সঙ্গে গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। সালাহুদ্দিনের উজির কাজি আল-ফাদিল কায়রোতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম দেন আল-মাদরাসাতুল ফাদিলিয়্যাহ। এই মাদরাসার সঙ্গে তিনি একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রন্থাগারটিতে তিনি প্রায় দুই লাখ গ্রন্থের (খণ্ডসহ) সমাবেশ ঘটান। এসব গ্রন্থ তিনি ফাতেমি আমলের উবাইদি গ্রন্থভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেন। ইয়াকুত হামাবি উল্লেখ করেছেন যে, ইরানের মারভে কয়েকটি মাদরাসা ছিল, যেগুলোতে তার যুগে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। এসব গ্রন্থাগারের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।[১৭৮]

---

১৭৭. ইবনুল আব্বার, *আত-তাকমিলাতু লি-কিতাবিস সিলাতি*, খ. ১, পৃ. ১৯০।

১৭৮. রিবহি মুস্তাফা উলয়ান, *মাকতাবাতুন ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৪।

৫. মসজিদ-গ্রন্থাগার : এসব গ্রন্থাগারকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রন্থাগার বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ, মসজিদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে গ্রন্থাগারের বিকাশ ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে কায়রোর জামে আল-আযহার গ্রন্থাগার, কায়রাওয়ানের জামে আল-কাবির গ্রন্থাগার।[১৭৯]

এই তো গেল গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাজন। তবে সব শ্রেণির গ্রন্থাগারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তা এই যে, গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য এসব গ্রন্থাগারের নামে বিপুল ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ছিল। রাষ্ট্র গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্টভাবে ওয়াকফ করত। ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষেরাও গ্রন্থাগারের জন্য ওয়াকফ করেছেন। এসব ওয়াকফ থেকেই গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হতো।[১৮০]

---

[১৭৯]. সাইদ আহমাদ হাসান, *আনওয়াউল মাকতাবাত ফিল-আলামাইল আরাবি ওয়াল-ইসলামি*, পৃ. ১৮-৭৮, ঈষৎ পরিবর্তিত।

[১৮০]. মুহাম্মাদ হুসাইন মুহাসিনাহ, *আদওয়াউন আলা তারিখিল উলুমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বাগদাদ গ্রন্থাগার
(ক্রমবিকশিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়)

মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে ইসলামি গ্রন্থাগারসমূহের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এর ফলেই মানবসভ্যতা বর্তমান রূপ লাভ করেছে। কিন্তু সেসব গ্রন্থাগারের মধ্যে—কোনো সন্দেহ নেই যে—সবচেয়ে বিখ্যাত হলো বাগদাদের বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার। এটিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র বিবেচনা করা হয়। না, এতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। শুধু তাই নয়, এটি ইসলামি চিন্তাধারার ফলে সৃষ্ট প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারগুলোর মধ্যে অন্যতম। যদিও ইসলামি চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ বাইতুল হিকমার ভূমিকা ভুলে গেছে, অথচ এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠের সমপর্যায়ের। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে ছুটে এসেছে। তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে, নানা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। বাইতুল হিকমার আলোকবর্তিকা প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মানবতাকে তার পথ দেখিয়েছে। তাতারদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আলো ছড়িয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর খিলাফতের সময় রাজধানী বাগদাদে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছু ভবন নির্দিষ্ট করে সেখানে অতি মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলির সমাবেশ ঘটান। আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি যেমন ছিল, তেমনই অন্যান্য ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থরাজিও ছিল। ১৭০ হিজরিতে খলিফা হারুনুর রশিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (১৯৩ হিজরি পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।) তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আব্বাসি খলিফা এবং ইতিহাসের পাতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত ও নন্দিত। খলিফা হওয়ার পর তিনি খিলাফত-প্রাসাদে সুরক্ষিত অসংখ্য মূল ও অনুবাদকৃত গ্রন্থাবলি ও পাণ্ডুলিপি বের করে আনতে মনোযোগী হন। খিলাফত-প্রাসাদে

ছিল গ্রন্থরাজির বিপুল ভান্ডার। এখানে অসংখ্য সংকলনমূলক পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি ছিল মৌলিক ও অনূদিত পাণ্ডুলিপি। তিনি বাগদাদ গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভবনে আলাদাভাবে এসব গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করেন। ভবনটি ছিল বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ সংরক্ষণের উপযোগী। সকল ছাত্র ও বিদ্যার্থীর জন্য উন্মুক্ত ছিল এই ভবন।

তিনি গ্রন্থাগারের জন্য একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেন এবং সমস্ত গ্রন্থভান্ডার এখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এটির নামকরণ করেন বাইতুল হিকমা (House of Wisdom)। সংগৃহীত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির অপরিসীম মূল্য ও গুরুত্বের কারণে তিনি এই নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগার ক্রমবিকশিত হতে থাকে ও উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিখ্যাত একাডেমিক জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়, যা ইতিহাসে সুপরিচিত।[১৮১] খলিফা আল-মামুনের যুগে গ্রন্থাগারটির সর্বাধিক উন্নতি হয়। তিনি বিখ্যাত অনুবাদক, অনুলিপিকারী ও লেখক জ্ঞানী-গুণীদের সমবেত করতে সক্ষম হন। এমনকি তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গবেষক ও অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। তার এসব কাজ এই জ্ঞানসুলভ অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৮২]

বাইতুল হিকমার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে, তারপর তা অনুবাদকেন্দ্রের রূপ পায়, তারপর তা পরিণত হয় গবেষণা ও সংকলনকেন্দ্রে, অবশেষে তা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে পাঠদান ও ইজাযতদানের কার্যক্রম চালু হয়। তারপর এতে যুক্ত করা হয় একটি মানমন্দির (Astronomical observatory)। এভাবে বাইতুল হিকমা কয়েকটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। তা নিম্নরূপ :

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান কাজ ছিল সম্ভাব্য সব এলাকা থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করা, সেগুলোকে তাকে তাকে সাজানো এবং যারা পড়তে চায় তাদের সরবরাহ করা। এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনুলিপি ও বাঁধাইকরণ অনুবিভাগ। এখানে অবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাবলির অনুলিপি তৈরি ও বাঁধাইয়ের ফরমায়েশ দেওয়া হতো। রক্ষিত গ্রন্থাবলির মধ্যে যেগুলো নষ্ট হওয়ার

---

১৮১. খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ২৯।

১৮২. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৬।

উপক্রম করত সেগুলোকে মেরামত করার দায়িত্বও ছিল এই অনুবিভাগের। বাইতুল হিকমায় গ্রন্থ সংগ্রহের পন্থা ছিল অনেক। তার মধ্যে একটি হলো ক্রয় করা। খলিফা আল-মামুন কনস্টান্টিনোপলে সংগ্রাহক দল প্রেরণ করতেন এবং তাদেরকে যেকোনো প্রকারের গ্রন্থ সংগ্রহের নির্দেশ দিতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও সফরে বের হতেন এবং গ্রন্থাবলি ক্রয় করে তা বাইতুল হিকমায় পাঠাতেন। আরেকটি পন্থা ছিল উপঢৌকন গ্রহণ। খলিফাগণ বহির্দেশীয় রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতেন, ওইসব দেশের রাজাবাদশারা তাদেরকে গ্রন্থ উপহার দিতেন। কখনো কখনো যাদের ওপর জিযিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল তাদের থেকে বইপুস্তক গ্রহণ করা হতো। এটাও ছিল গ্রন্থ সংগ্রহের একটি পন্থা। খলিফা আল-মামুন শত শত অনুলিপিকারী, ব্যাখ্যাদাতা, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদক নিযুক্ত করেছিলেন। অন্যান্য ভাষার গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করা হতো। সংকলন ও নতুন গ্রন্থ রচনাও ছিল আরেকটি পন্থা। এগুলো তো বটেই, গ্রন্থ সংগ্রহের আরও পন্থা ছিল। এ কারণে বাইতুল হিকমার গ্রন্থাবলি সংখ্যায় ও প্রকারে ছিল অভূতপূর্ব।

খলিফা আল-মামুন রোমান সম্রাটের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আবেদন জানান যে, তার কাছে গ্রিকদের থেকে প্রাপ্ত যে প্রাচীন জ্ঞানভান্ডার রয়েছে তা যেন পাঠানোর অনুমতি দেন। রোমান ঐতিহ্যে তখন সেসব গ্রন্থের পাঠ অনুমোদিত ছিল না। সম্রাট কিছুকাল নীরব থেকে চিঠির জবাব দেন। আল-মামুন একটি জ্ঞান-অনুসন্ধানী দল প্রস্তুত করেন। এই দলে কয়েকজন অনুবাদককেও যুক্ত করেন। বাইতুল হিকমার গ্রন্থাগারিককে সেই দলের প্রধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই অনুসন্ধানী দল রোমে গিয়ে বিভিন্ন রকমের বহু স্থানে ঘুরে। যেখানে মনে হয়েছে প্রাচীন গ্রিক গ্রন্থভান্ডার রয়েছে সেখানেই দলটি গিয়েছে। অনুসন্ধান শেষে তারা দুর্লভ ও অতি মূল্যবান গ্রন্থের ভান্ডার নিয়ে ফিরে আসে। দর্শন, প্রকৌশল, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ তাদের হস্তগত হয়। খলিফা আল-মামুন তার শাসনামলে অন্যান্য রাজাবাদশার কাছেও প্রাচীন গ্রন্থভান্ডার অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজির জন্য অনুসন্ধানী দল প্রেরণের অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠান। একবার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একটি অনুসন্ধানী দল পারস্যে যায় এবং একটি প্রাচীন দুর্গের নিচে কয়েকটি

সিন্দুকের দেখা মেলে। এসব সিন্দুকে ছিল অসংখ্য গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো পচে গিয়েছিল এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। অনুসন্ধানী দল এগুলো উদ্ধার করে এবং বাগদাদে নিয়ে আসে। এগুলো শুকাতে এক বছর লাগে। শুকিয়ে গেলে এগুলোতে পরিবর্তন ঘটে এবং দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। তারপর তারা গ্রন্থগুলোর পাঠোদ্ধারে উঠেপড়ে লাগে।[১৮৩]

অনুবাদকেন্দ্র

খলিফা আল-মামুনের কাছে প্রাচীন গ্রন্থাবলির বিশাল সম্ভারের সমাবেশ ঘটে। তিনি দক্ষ অনুবাদক, ব্যাখ্যাতা ও অনুলিপিকারীর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। গ্রন্থাবলির মেরামত ও আরবিতে ভাষান্তরই ছিল এই কমিটির দায়িত্ব। তিনি প্রত্যেক অনারব ভাষার জন্য একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন যিনি ওই ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদকারীদের তত্ত্বাবধান করবেন। তাদের সবার জন্য বিরাট অঙ্কের বেতন নির্ধারণ করেন। কারও কারও জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করেন পাঁচশ দিনার।[১৮৪] (যা দুই কেজি সোনার চেয়েও বেশি!)

অনুবাদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাবলি আরবিতে রূপান্তরিত করা এবং মাঝে মাঝে আরবি থেকে অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। এই বিভাগে যেসব অনুলিপিকারী বা নকলনবিশকে নিযুক্ত করা হতো তারা ছিল গ্রন্থাগার বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের থেকে জ্ঞান ও যোগ্যতার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুবাদ বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ, জিবরিল ইবনে বুখতিশু এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। গ্রিক ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য হুনাইনকে রোমান দেশে ভ্রমণে পাঠানো হয়েছিল। ভিনদেশি গ্রন্থাবলি বাইতুল হিকমায় নিয়ে আসা হতো এবং সেখানেই অনুবাদ করা হতো। কতিপয় অনুবাদক বাইতুল হিকমার বাইরে থেকেও অনুবাদ করতেন এবং অনূদিত গ্রন্থ এখানে জমা দিতেন। খলিফা আল-মামুন অনুবাদকদের বড় হাতে সম্মানী দিতেন, এমনকি তিনি অনূদিত গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণও দিতেন![১৮৫]

---

১৮৩. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩০৪; ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭২।

১৮৪. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ১৩৩।

১৮৫. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ১৭২।

ইবনে নাদিম তার *'আল-ফিহরিসত'* গ্রন্থে কয়েক ডজন অনুবাদকের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা ভারতীয় ভাষা, গ্রিক ভাষা, ফারসি ভাষা, সুরয়ানি ভাষা (Syriac language), নাবাতি ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করতেন। তারা কেবল আরবিতে অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং ইসলামি সমাজে যেসব ভাষা জীবন্ত ও ব্যাপ্ত ছিল সেগুলোতেও অনুবাদ করেছেন। যাতে ইসলামি সমাজে বসবাসকারী ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেই এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদকদের কেউ মূল গ্রন্থটিকে তার মাতৃভাষায় অনুবাদ করতেন, তারপর অন্য একজন অনুবাদক তা আরবিতে ও অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেন। যেমন ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ মূল গ্রন্থকে সুরয়ানি ভাষায় অনুবাদ করতেন, তারপর অন্যজন ওই অনুবাদকে আরবিতে রূপান্তর করতেন। সঙ্গে সঙ্গে মূল গ্রন্থও বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হতো।[১৮৬]

বাইতুল হিকমা থেকে সংরক্ষিত গ্রন্থতালিকা নিরীক্ষণ করলে যে-কেউ এ ব্যাপারে অসংখ্য ইঙ্গিত পাবে যে এখানে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের নাবাতি কপি (নুসখা), কিবতি কপি, সুরয়ানি কপি, ফারসি কপি, ভারতীয় কপি, গ্রিক কপি ছিল। (কারণ, একেকটি গ্রন্থ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।) মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা এমনসব জ্ঞানভান্ডারের অনুবাদ করেছেন যা ধ্বংসই হতে যাচ্ছিল। তারা না থাকলে আধুনিক যুগের মানুষ প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান রচনাবলি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারত না। কারণ, এসব মূল্যবান জ্ঞানভান্ডার আহরণ করা হয়েছে যেসব দেশ থেকে তার অধিকাংশতেই এগুলোর পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। যেসব গ্রন্থ শাসকদের বা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ত সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হতো। যেমন রোমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একবার পনেরো বোঝা গ্রন্থ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের গ্রন্থাবলিও ছিল।[১৮৭]

এই সকল আলেমের ভূমিকা কেবল অনুবাদে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা অনূদিত গ্রন্থাবলিতে টীকাও সংযোজন করেছেন। সেগুলোতে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোকে

---

১৮৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩০৪ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

প্রায়োগিক উপযোগিতার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। অসম্পূর্ণ বিষয়গুলোর পূর্ণরূপ দিয়েছেন। ভ্রান্তি-বিভ্রাটের সংশোধন করেছেন। বর্তমান যুগে যাকে 'সম্পাদনা' বলা হয় তাদের কাজ ছিল তারই অনুরূপ। ওইসব গ্রন্থের কয়েকটিতে ইবনে নাদিম যে টীকাবলি সংযোজন করেছেন তা থেকে এটাই বোঝা যায়।[১৮৮]

কাজি সায়িদ আল-আন্দালুসি তার *'তাবাকাতুল উমাম'* গ্রন্থে বাইতুল হিকমায় অনুবাদ-পদ্ধতি কী ছিল সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। খলিফা আল-মামুন এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের প্রতি কতটা গুরুত্ব দিতেন সেটাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব যখন তাদের (আব্বাসিদের) সপ্তম খলিফা আবদুল্লাহ আল-মামুন ইবনে হারুনুর রশিদের হাতে এলো... তিনি তার পিতামহ আল-মানসুর যেসব কাজ শুরু করেছিলেন সেগুলো সম্পন্ন করতে থাকলেন। যেখানে জ্ঞান রয়েছে বলে মনে করলেন সেখান থেকেই তা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। জ্ঞানের খনি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে থাকলেন। তার ছিল দৃঢ় সংকল্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা; আত্মশক্তিও ছিল প্রবল। তিনি রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ও শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাদের জন্য মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠালেন। তাদের কাছে দর্শনশাস্ত্রের যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো তার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানালেন। তারা তা-ই করলেন। তাদের কাছে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, গ্যালেন[১৮৯], ইউক্লিড, টলেমি ও অন্যান্য দার্শনিক-বিজ্ঞানীর যেসব গ্রন্থ ছিল তা তারা পাঠিয়ে দিলেন। আল-মামুন এসব গ্রন্থের আরবি অনুবাদের জন্য দক্ষ অনুবাদকদল নির্বাচন করলেন। তাদেরকে এসব গ্রন্থের অনুবাদের নির্দেশ দিলেন। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে এসব গ্রন্থের অনুবাদ করা হলো। আল-মামুন এসব গ্রন্থ পাঠের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন, এগুলোর পঠনপাঠনের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে তুললেন। ফলে তার যুগে জ্ঞানের বাজার রমরমা হয়ে উঠল। জ্ঞান-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো। জ্ঞান অর্জন ও বিকাশে মেধাবীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। কারণ তারা দেখলেন যে, খলিফা আল-মামুন জ্ঞান অর্জনকারীদের বিশেষভাবে গণ্য করেন, যারা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত তাদের খাস লোক হিসেবে কাছে টেনে

---

১৮৮. প্রাগুক্ত, ৩৩৯ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।
১৮৯. Aelius Galenus or Claudius Galenus.

নেন। তাদের সঙ্গে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন, তর্কবিতর্ক করে আনন্দ পান, নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলে সুখ পান। তারা খলিফার কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন, উচ্চ পদ-পদবি ও বেতন-ভাতা পান।[১৯০]

কাজি সায়িদ আল-আন্দালুসির উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, খলিফা আল-মামুন বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের অনুবাদের জন্য বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই একাডেমির জন্য বিশ্বের সব অঞ্চল থেকে বড় বড় অনুবাদকদের এখানে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। গ্রিক বংশোদ্ভূত মনীষী আবু ইয়াহইয়া ইবনে আল-বিতরিক এখানে যোগ দিয়েছিলেন, আরও যোগ দিয়েছিলেন নাসতুরিয়ান খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত হুনাইন ইবনে ইসহাক। অনুবাদকদের মধ্যে আরও ছিলেন বিখ্যাত মনীষী ইউহান্না ইবনে মাসাওয়াইহ।[১৯১]

খলিফা আল-মামুনের শাসনামল শেষ হতে না হতে দেখা গেল যে, ইউনানি (গ্রিক), পারসিক ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থ যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন ও প্রকৌশলবিদ্যা আরবিতে অনূদিত হয়ে নতুনরূপে বাইতুল হিকমার গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলো। এ প্রসঙ্গে *স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন* গ্রন্থের প্রণেতা উইল ডুরান্ট বলেছেন, মুসলিমরা পূর্ববর্তীদের থেকে জ্ঞানের যে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তার অধিকাংশ করেছেন ইউনান (গ্রিকদের) থেকে। ইউনানের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে ভারত।[১৯২]

সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্র

বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্র। রচয়িতারা এই গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ সকল রচয়িতা সংকলন ও গবেষণাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বসেই তাদের কাজ আঞ্জাম দিতেন। কেউ কেউ গ্রন্থাগারের বাইরেও কাজ করতেন। তারপর তাদের রচিত বা সংকলিত গ্রন্থ এখানে পেশ করতেন। খলিফার পক্ষ থেকে প্রত্যেক লেখক ও রচয়িতাকে উদার হস্তে বড় ধরনের সম্মানী দেওয়া হতো।[১৯৩] বাইতুল হিকমার অনুলিপিকারদের মূলত

---

১৯০. কাজি সাইদ আল-আন্দালুসি, *তাবাকাতুল উমাম*, পৃ. ৪৯।
১৯১. মানসুর সারহান, *আল-মাকতাবাত ফিল-উসুর আল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫৬।
১৯২. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অফ সিভিলাইজেশন*, খ. ১৪, পৃ. ৪০।
১৯৩. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৩, পৃ. ১৩১।

বিশেষ কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাছাই করা হতো। যাতে অনুলিপিকারদের পক্ষ থেকে মূল রচনায় কিছু মিশে না যায় সেজন্য সতর্কতাবশতই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। এই কারণে আমরা দেখি যে, হিজরি তৃতীয় শতকের বিখ্যাত মনীষী আল্লান আশ-শাওবি খলিফা হারুনুর রশিদ ও খলিফা আল-মামুনের যুগে বাইতুল হিকমায় অনুলিপিকারের কাজ করতেন।[১৯৪]

জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক মানমন্দির

খলিফা আল-মামুন বাগদাদের কাছাকাছি আশ-শামাসিয়্যাহ মহল্লায় এই মানমন্দির নির্মাণ করেন। এটি ছিল বাইতুল হিকমারই অধিভুক্ত। তার এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল বাইতুল হিকমায় প্রায়োগিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা। ছাত্ররা যেসব থিউরি ও তাত্ত্বিক বিষয় শিখছে তা যেন এখানে প্রয়োগ করে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই মানমন্দিরে কাজ করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, ভূগোলবিদেরা ও গণিতজ্ঞরা।[১৯৫] তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আল-খাওয়ারিজমি, মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা ও আল-বিরুনি। খলিফা আল-মামুন এই মানমন্দিরে বিজ্ঞানীদের দুটি দলের গবেষণার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করতে সক্ষম হন।[১৯৬]

মাদরাসা

খলিফা হারুনুর রশিদের পরে যারা খলিফা হয়েছেন তারা তাদের যুগের খ্যাতিমান ও প্রসিদ্ধ আলেমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছেন। তারা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য এ সকল আলেমকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদেরকে উদার হস্তে উপঢৌকন দিয়েছেন। তাদের অন্যতম ছিলেন আল-কিসায়ি আলি ইবনে হামযাহ[১৯৭]। তিনি খলিফা আল-

---

[১৯৪]. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ৩৬৭।

[১৯৫]. ইবনুল আবারি, *মুখতাসারু তারিখিদ-দুওয়াল*, পৃ. ৭৫।

[১৯৬]. কর্নেলিয়াস ভ্যান অ্যালেন ভ্যান ডাইক (Cornelius Van Alen Van Dyck), *ইকতিফাউল কানুয়ি বিমা হুয়া মাতবুউন*, পৃ. ২৩৫। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ও টীকা সংযুক্ত করেছেন সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলি বিবলাবি।

[১৯৭]. আল-কিসায়ি : আবুল হাসান আলি ইবনে হামযাহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কুফি ছিলেন ভাষা ও ব্যাকরণের ইমাম। প্রখ্যাত সাত কারির অন্যতম। তিনি হারুনুর রশিদের পুত্র আল-আমিনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ইরানের রাইয়ে ১৮৯

মামুনের[১৯৮] কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। তিনি খলিফার দুই পুত্রকে ভাষা ও ব্যাকরণ শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ ও ভাষা বিষয়ে তার বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আরেকজন হলেন ইয়াকুব ইবনে আস-সিক্কিত[১৯৯]। তিনি জাফর আল-মুতাওয়াক্কিলের পুত্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন।[২০০]

অনেক আলেমেরই জ্ঞানের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের পারদর্শিতা ছিল। ফলে তাদের নাম ফকিহদের সঙ্গেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাদের কেউ কেউ সব শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করতেন। যেমন আবু ইসহাক আয-যুজাজ। তার নাম ফকিহদের সঙ্গেও ছিল, আলেমদের সঙ্গেও ছিল। উভয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ভাতা তিনি গ্রহণ করতেন। ফলে প্রতি মাসে তিনি দুইশ দিনার ভাতা পেতেন।[২০১] ইবনে দুরাইদ[২০২] যখন কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাগদাদে এসে উপস্থিত হন, খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ তার জন্য মাসিক পঞ্চাশ দিনার ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[২০৩]

মাদরাসা নির্মাণের পর শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ দেওয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, তাদেরকে সাধারণ তহবিল থেকে মাসিক বেতন-ভাতা দেওয়া হবে, অথবা ওয়াকফকৃত সম্পত্তির প্রাপ্ত আয় থেকে তা দেওয়া হবে। অর্থাৎ,

---

হিজরিতে/৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে। দেখুন, হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ৪, পৃ. ১৭৩৭-১৭৫২; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

১৯৮. সঠিক তথ্য : খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে।

১৯৯. ইবনে আস-সিক্কিত : আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (১৮৬-২৪৪ হি./৮০২-৮৫৮ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। খলিফা তার সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব দেন তাকে। শুধু তাই নয়, তাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবেও গ্রহণ করেন। পরে অবশ্য তাকে হত্যা করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৫-৪০১।

২০০. সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৯।

২০১. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬০।

২০২. ইবনে দুরাইদ : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে দুরাইদ আল-বসরি (২২৩-৩২১ হি./৮৩৮-৯৩৩ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الجمهرة في علم اللغة، السرج واللجام، كتاب الخيل الكبير، كتاب الخيل الصغير، كتاب السلاح، كتاب الأنواء، الأمالي، الأشربة। দেখুন, হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, খ. ৬, পৃ. ২৪৮৯-২৪৯৬; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ৩২৩-৩২৮।

২০৩. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ৮০।

যেসব ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় এসব খাতে ব্যয়ের জন্য সাধারণভাবে নির্ধারিত ছিল। শিক্ষকদের পদের ভিন্নতা এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয়ের তারতম্যের কারণে তাদের বেতন-ভাতাও ভিন্ন ভিন্ন হতো। কিন্তু তার দ্বারা অবশ্যই সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করা যেত।[২০৪]

খলিফা হারুনুর রশিদ ও আল-মামুন উভয়ে বাইতুল হিকমায় ছাত্রদের জন্য যেমন, তেমনই শিক্ষকদের জন্য বাসভবন নির্মাণ করেছেন।[২০৫]

বাইতুল হিকমার শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত শিক্ষণব্যবস্থা দুটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো : ১. শিক্ষক বক্তৃতা দিতেন, ছাত্ররা তা শুনত এবং ২. শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর হতো। শিক্ষক কখনো উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে বড় হলঘরে বক্তৃতা দিতেন। সহকারী তাকে সাহায্য করতেন। এসব বক্তৃতা শুনতে শত শত ছাত্র সমবেত হতো। তাদেরকে বক্তৃতার কঠিন কঠিন অংশগুলো ব্যাখ্যা করে দিতেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করতেন। কিন্তু শাইখ বা শিক্ষকই চূড়ান্ত জবাব ও সিদ্ধান্ত দিতেন। ছাত্ররা এক হালকা থেকে অন্য হালকায় যেত। এভাবে তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনুশীলন ও চর্চা করত।[২০৬]

বাইতুল হিকমার মাদরাসায় জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য সব শাখারই পাঠদান করা হতো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, বিভিন্ন ভাষা, যেমন আরবি ভাষার পাশাপাশি গ্রিক, ফারসি, ভারতীয় ও অন্যান্য ভাষা।

বাইতুল হিকমা থেকে যারা কোনো বিষয়ের বা শাস্ত্রের শিক্ষা সমাপ্ত করতেন শিক্ষক তাদেরকে ইজাযত বা অনুমতি দিতেন। অনুমতিপত্রে তিনি বলতেন যে, এই শিক্ষার্থী জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে। যারা মুমতায হতেন বা প্রথম বিভাগে পাশ করতেন তাদের সনদপত্রে উল্লেখ থাকত যে, এই সনদধারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি দেওয়া হলো। কেবল শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের অনুমোদন দিতে

---

[২০৪]. আবদুল কাদির আন-নুয়াইমি, *আদ-দারিস ফি তারিখিল মাদারিস*, খ. ১, পৃ. ৪১৮; খ. ২, পৃ. ১৮, ৫২, ৩০৬।

[২০৫]. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ৪, পৃ. ৩১৯; আহমাদ শালবি, *তারিখুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৪; খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ২৪৬।

[২০৬]. খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ, *বাইতুল হিকমা ফি আসর আল-আব্বাসিন*, পৃ. ১৪০।

পারতেন। শিক্ষক ছাড়া অন্য কারও এই অধিকার ছিল না। অনুমোদনদানের পদ্ধতি এরূপ : শিক্ষক শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীর জন্য একটি অনুমোদনপত্র বা সনদপত্র লিখতেন, তাতে শিক্ষার্থীর নাম, তার শাইখের নাম, তার ফিকহি মাযহাব ও অনুমোদনদানের তারিখ উল্লেখ করতেন।[২০৭]

বাইতুল হিকমার পরিচালনাপর্ষদ বা প্রশাসন

বাগদাদের বাইতুল হিকমার প্রশাসনে কয়েকজন আলেম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিচালকের পদবি-নাম ছিল 'সাহিব'। তাই বাইতুল হিকমার পরিচালককে বলা হতো 'সাহিবু বাইতিল হিকমা'। বাইতুল হিকমার প্রথম পরিচালক ছিলেন সাহল ইবনে হারুন আল-ফারিসি (মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.)। বাইতুল হিকমার গ্রন্থভান্ডার তত্ত্বাবধানের জন্য খলিফা হারুনুর রশিদ তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি যত পারসিক তত্ত্বজ্ঞান পেয়েছিলেন তা ফারসি থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন খলিফা হওয়ার পর সাহল ইবনে হারুনকে বাইতুল হিকমার পরিচালক নিযুক্ত করেন।[২০৮] এই পদে তাকে আরেকজন ব্যক্তি সাহায্য করতেন। তিনি হলেন সাইদ ইবনে হারুন। তিনি ইবনে হুরাইম নামে পরিচিত ছিলেন।[২০৯] বাইতুল হিকমার প্রশাসকদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হাসান ইবনে মাররার আদ-দাব্বি।[২১০]

এই তো গেল মোটামুটি কথা। আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি বাগদাদ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করে বলেন, ইসলামে সবচেয়ে বিশাল ও সমৃদ্ধ গ্রন্থভান্ডার তিনটি : ১. বাগদাদে আব্বাসি খলিফাদের গ্রন্থভান্ডার। এই গ্রন্থভান্ডারে এত বেশি গ্রন্থ ছিল, তা গুনে শেষ করা যায়নি। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারেও গ্রন্থভান্ডারটি ছিল অনন্য।[২১১] দ্বিতীয় গ্রন্থভান্ডারটি ছিল কায়রোতে, কর্ডোভায় ছিল তৃতীয়টি।

---

২০৭. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬।
২০৮. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১৪৪।
২০৯. সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ৮৬।
২১০. মুহাম্মাদ ইবনে শাকির কুতুবি, *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ১২২।
২১১. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা ফি কিতাবাতিল ইনশা*, খ. ১, পৃ. ৫৩৭।

ইসলামি বিশ্বে আরও অনেক গ্রন্থাগার ছিল যেগুলো সমৃদ্ধিতে ও সমৃদ্ধ ভূমিকা পালনে বাগদাদ গ্রন্থাগার থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। তার কারণ এই যে, মুসলিম খলিফারা ও গভর্নররা গ্রন্থ সংগ্রহে ও সংরক্ষণে প্রতিযোগিতা করতেন। এমনকি আন্দালুসের খলিফা আল-হাকাম ইবনে আবদুর রহমান আন-নাসির প্রাচ্যের সব দেশে লোক পাঠিয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। তারা প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাবলি ক্রয় করে নিতেন।[২১২]

অন্যান্য অসংখ্য ইসলামি গ্রন্থাগারের সঙ্গে বাগদাদ গ্রন্থাগার শুরুর যুগের মুসলিমদের সব ক্ষেত্রে জ্ঞানগত জাগরণ সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য জাতির সন্তানদের মধ্যে যারা এ সকল মুসলিমের শিষ্যত্ব করেছেন তারাও এতে আলোকিত হয়েছেন। জ্ঞানের এই জাগরণ ছিল অভূতপূর্ব। আধুনিক যুগের আগে ইতিহাস কখনো এমন জাগরণ দেখেনি। গোটা মানবসভ্যতার ওপর এই জ্ঞান-জাগরণের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। অথচ সেই সময়ে ইউরোপ ছিল চরম গ্রাম্য ও পশ্চাৎপদ অবস্থায়।[২১৩]

এখানে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, বাগদাদ গ্রন্থাগার বহু জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর উৎকর্ষ ও পরিপক্বতালাভে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এসব জ্ঞানী-বিজ্ঞানী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আল-খাওয়ারিজমির নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি ছিলেন গণিতের আলজেবরা শাখার উদ্ভাবক। ইবনে নাদিম আল-খাওয়ারিজমির এই উদ্ভাবন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার বিস্তৃত অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল-খাওয়ারিজমি খলিফা আল-মামুনের গ্রন্থাগারে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তখনকার মানুষ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি (Astronomical monitoring machines) আবিষ্কারের আগে ও পরে তার প্রদত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় তারকা-সারণির[২১৪] ওপর নির্ভর করেছেন। এ দুটি 'যিজুস সিন্দহিন্দ' (السندهند) নামে পরিচিত।[২১৫]

---

২১২. ইবনুল আব্বার, *আত-তাকমিলাতু লি-কিতাবিস সিলাতি*, খ. ১, পৃ. ২২৬।
২১৩. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ২৫০।
২১৪. আরবিতে একে الزيج الأول والزيج الثاني للخوارزمي বলা হয়।-অনুবাদক
২১৫. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৩।

বাইতুল হিকমা বা বাগদাদ গ্রন্থাগারে অবস্থান করে গবেষণা করেছেন এমন কয়েকজন হলেন আল-রাযি, ইবনে সিনা, আল-বিরুনি, আল-বাত্তানি[২১৬], ইবনে নাফিস, আল-ইদরিস[২১৭]। এমন আরও শত শত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী রয়েছেন ইসলামি চিন্তাধারা যাদেরকে পরিপক্বতা দিয়েছে। আর এই চিন্তার ভিত গড়ে দিয়েছে বাগদাদ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইসলামি গ্রন্থাগার।

কিন্তু যে কারণে চিত্ত ব্যথিত হয় এবং কপাল ঘেমে ওঠে তা এই যে, সভ্যতার এই নিদর্শন ও মিনার তাতারদের একের পর এক আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্বরতা ও নৃশংসতাই ছিল তাদের চালিকাশক্তি। তাতাররা মূল্যবান গ্রন্থাবলি—লাখ লাখ মূল্যবান গ্রন্থ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেসব গ্রন্থ দজলা নদীতে নিক্ষেপ

---

২১৬. বাত্তানি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল-হাররানি (জন্ম ৮৫৪ খ্রি. এবং মৃত্যু ৩১৭ হি./৯২৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। বাত্তানি মেসোপটেমিয়ার উচ্চভূমির অন্তর্গত হাররান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জায়গাটি এখন তুরস্কে অবস্থিত। তার বাবা ছিলেন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিখ্যাত নির্মাতা। তার উপাধি 'আস-সাবি' হওয়ায় অনেকে ধারণা করেন যে তার পূর্বপুরুষ সাবিয়িন গোত্রভুক্ত হতে পারে, তবে তার পুরো নাম পড়ে বোঝা যায় তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। কতিপয় পশ্চিমা ঐতিহাসিকের মতে তার পূর্বপুরুষ ছিল আরব রাজাদের মতো উচ্চবংশের। তিনি উত্তর সিরিয়ার অন্তর্গত রাক্কা শহরে বসবাস করতেন। জ্যোতির্বিদ্যায় বাত্তানির সর্বাধিক পরিচিত অর্জন হলো সৌরবর্ষ নির্ণয়। বাত্তানিই প্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন যে, এক সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড হয়, যার সাথে আধুনিক পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির আগের কিছু বিজ্ঞানীর ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত টলেমি যে মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, বাত্তানি তা ভুল প্রমাণ করে নতুন প্রামাণিক তথ্য প্রদান করেন। অনেক শতাব্দী পরে কোপার্নিকাস কর্তৃক আবিষ্কৃত বিভিন্ন পরিমাপের চেয়ে বাত্তানির পরিমাপ অনেক বেশি নিখুঁত ছিল। তিনি ত্রিকোণমিতি নিয়ে বিস্তর কাজ করেন এবং সাইন, কোসাইন, ট্যানজেন্ট, কোট্যানজেন্ট ইত্যাদি ধারণা নিয়ে কাজ করেন। বাত্তানি সামাররায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২, পৃ. ২০৯; জামালুদ্দিন আল-কিফতি, *ইখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা*, পৃ. ১৮৪-১৮৫।-অনুবাদক

২১৭. আল-ইদরিস : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস (৪৯৩-৫৬০ হি./১১০০-১১৬৫ খ্রি.)। ভূগোলবিদ। তিনি সিসিলিতে গমন করেন এবং সিসিলির নরমান সম্রাট দ্বিতীয় রজারের (Roger II of Sicily) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাটের তত্ত্বাবধানে نزهة المشتاق في اختراق الآفاق গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি *Tabula Rogeriana (The Map of Roger)* নামেও পরিচিত। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১, পৃ. ১৩৮।

করেছিল! কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা চরম নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকির পরিচয় দিয়েছিল।

ধারণা করা গিয়েছিল যে, তাতাররা এসব মূল্যবান গ্রন্থ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের রাজধানী কারাকোরামে নিয়ে যাবে এবং তারা যেহেতু সভ্যতার শৈশবকালে রয়েছে তাই এসব গ্রন্থ ও মূল্যবান জ্ঞানরাশির দ্বারা উপকৃত হবে। কিন্তু তাতাররা একটি বর্বর-অসভ্য জাতি... তারা কিছু পড়েনি এবং শিখতেও চায়নি কিছু... যেন কেবল কামচরিতার্থ, সুখভোগ ও বিলাসব্যসনের জন্যই বেঁচে ছিল। তারা মুসলিমদের কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টা ও সাধনার ফসল দজলা নদীতে নিক্ষেপ করে। গ্রন্থাবলির কালিতে দজলা নদীর পানি কালো বর্ণ ধারণ করে। এমনকি এ কথাও প্রচলিত ছিল যে, তাতার ঘোড়সওয়ার গ্রন্থাবলির স্তূপের ওপর দিয়ে নদীর এ তীর থেকে ও-তীরে যেতে পারত। এটা ছিল গোটা মানবতার বিরুদ্ধেই বড় অপরাধ।[২১৮]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এসব তাতার ও অন্য আক্রমণকারীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে যে মুষ্টিমেয় গ্রন্থ ও রচনাবলি বেঁচে গিয়েছিল তা ইউরোপের আধুনিক রেনেসাঁস ও জ্ঞানের জাগরণের কার্যকারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশ্চাত্যের বহু ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এভাবে বাগদাদের বাইতুল হিকমা মানবসভ্যতায় মহৎ অবদান রেখেছে এবং সভ্যতার অসংখ্য জ্ঞানকেন্দ্রের মধ্যে এটি তার যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে।

---

২১৮. রাগিব সারজানি, *কিসসাতুত তাতার মিনাল বিদায়াতি ইলা আইনি জালুত*, পৃ. ১৬১-১৬২।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানী-সমাজ

ইসলামি সভ্যতা হাজার হাজার বড় বড় আলেম ও জ্ঞানী-গুণীর জন্ম দিয়েছে। তারা এই সভ্যতার অগ্রযাত্রা ও উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মানবসভ্যতার জ্ঞানী-সমাজ থাকে, যারা সেই সভ্যতাকে চিরস্থায়ী রূপ দেন এবং সকল জাতির মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন।

ইসলামি সভ্যতায় যে বিষয়টা আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে তা এই যে, এই সভ্যতা নিজের জন্য উন্নত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছিল এবং সে তার সমৃদ্ধ যাত্রাপথে তা অবলম্বন করে এগিয়েছে। এই ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন এবং এই সভ্যতার যাপিত জ্ঞানগত অগ্রযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মুসলিম আলেমসমাজ যে জ্ঞানের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছেছেন এবং বিপুল শূন্যতা পূরণ করেছেন তা বিলাসব্যসনে লিপ্ত থেকে হয়ে যায়নি, বরং তাদের জ্ঞানযাত্রায় রয়েছে অসংখ্য কষ্ট-যন্ত্রণা ও ধৈর্যধারণের কাহিনি। তারা যে অনন্য জ্ঞানশিখরে আরোহণ করেছেন তার জন্য তারা যাবতীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত ক্লেশভার বহন করেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এসব বিষয় আলোচনা করব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানী-সমাজের বিকাশ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামি সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইজাযত

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানী-সমাজের বিকাশ

প্রথমেই যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার তা এই যে, ইসলামি সভ্যতায় বিদ্যার্থীরা তাদের দৃষ্টির সামনে একটি মহান লক্ষ্য স্থির করেছেন তাদের সভ্যতাকে অপরাপর বিশ্ব-সভ্যতার কাতারে উন্নীত করা। তবে এই লক্ষ্য মৌলিকভাবে ততটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না যতটা ছিল বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসেবে।

মানুষ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয় যখন তারা পড়ে যে, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় জ্ঞানী-গুণীরা সাধারণ মানুষের হাসির পাত্র ছিলেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই সভ্যতায় হাস্য-পরিহাসের নির্লজ্জ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন।[২১৯]

তবে ইসলামি সভ্যতায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি নাযিল হওয়ার শুরু থেকে এটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আলেমরাই বা জ্ঞানীরাই আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।[২২০]

ফলে এই ঐশী মূল্যবোধ এই সভ্যতার প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। মুসলিমরা বিশ্বাস করেছে যে আলেমরা এই উম্মাহর প্রকৃত নেতা ও পথপ্রদর্শক। কারণ,

«الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»

আলেমরাই নবীদের উত্তরাধিকারী।[২২১]

---

২১৯. Adam Mez, *Die Renaissance des Islâm*; আরবি অনুবাদ, মুহাম্মাদ আবদুল হাদি আবু রিদা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যাতু ফিল-কারনির রাবিয়ি হিজরিয়্যি*, খ. ১, পৃ. ৩২৭ (আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত)।

২২০. সুরা ফাতির : আয়াত ২৮।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামি সভ্যতার হাজারো সন্তান তাদের শৈশবকাল থেকেই জ্ঞান অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক অঞ্চল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে। এই সকল আলেমের উত্থান ও বিকাশ অনন্য দৃষ্টান্ত ও অবিনশ্বর কাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

এই সভ্যতায় বিদ্যার্থীরা জ্ঞান অর্জনে বিনয় ও কঠোর অধ্যবসায়ের পথ অবলম্বন করেছে। এই উম্মাহর পণ্ডিত ও জ্ঞানী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর আমি একজন আনসারি ব্যক্তিকে বললাম, চলুন, আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের জিজ্ঞেস করে হাদিস জানি, এখন তো তাদের সংখ্যা অনেক। তিনি বললেন, তোমার প্রতি বিস্ময় বোধ করছি হে ইবনে আব্বাস, তুমি কি মনে করো লোকজন তোমার মুখাপেক্ষী (তোমার কাছে হাদিস শিখতে আসবে), অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য সাহাবি তাদের মধ্যে রয়েছেন? এ কথা বলে তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি একাই উদ্যোগী হয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের থেকে হাদিস জিজ্ঞেস করতে শুরু করলাম। কারও কাছ থেকে হাদিসের কথা আমার কাছে পৌঁছলে আমি তার দ্বারে যেতাম। হয়তো তিনি দিবানিদ্রায় বিশ্রাম নিতেন। আমি আমার চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে তার দরজায় শুয়ে থাকতাম। বাতাস আমার গায়ের ওপর ধুলো ছড়িয়ে দিত। তিনি বের হয়ে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করতেন, হে আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই, কেন তুমি এসেছ? তুমি কি আমার কাছে কাউকে পাঠাতে পারলে না, আমিই তোমার কাছে যেতাম? আমি বলতাম, আমারই উচিত আপনার কাছে আসা। আমি তাকে হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। সে আনসারি ব্যক্তি তার জীবদ্দশাতেই দেখলেন যে লোকজন আমার চারপাশে সমবেত হচ্ছে এবং রাসুলের হাদিস ও অন্যান্য বিষয় জিজ্ঞেস করছে। এই অবস্থা দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, এই যুবক আমাদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান।[২২২]

---

[২২১]. *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ৩৬৪১; *সুনানে তিরমিযি*, হাদিস নং ২৬৮২।
[২২২]. ইয়াকুব আল-ফাসাবি, *আল-মারিফা ওয়াত-তারিখ*, খ. ১, পৃ. ২৯৮।

জ্ঞান অর্জনে সতীর্থ, বন্ধু ও সহপাঠীদের মাঝে প্রতিযোগিতা এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামি সভ্যতার যেকোনো যুগের কথাই আমরা পড়ি না কেন, দেখব যে জ্ঞান অন্বেষণে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ ব্যাপারে এমন সব ঘটনা ও কাহিনি রয়েছে যা চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর। মদিনার ফকিহ সালিহ ইবনে কাইসান (মৃ. ১৪০ হি.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ও যুহরি (ইবনে শিহাব) একত্র হলাম এবং জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা সুনান লিখব। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যত হাদিস পেলাম সব লিখলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, চলুন আমরা সাহাবিদের থেকে যত কথা বর্ণিত সেগুলো লিখি। সেগুলোও সুন্নাহ। আমি বললাম, সেগুলো সুন্নাহ নয়। আমরা তা লিখব না। তিনি সাহাবিদের কথা লিখতে শুরু করলেন, কিন্তু আমি তা করলাম না। ফলে তিনি সফলকাম হলেন এবং আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।[২২৩]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খলিফারা ও আমিররাও শৈশব থেকে জ্ঞান অন্বেষণে ও জ্ঞান অর্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বরং আমরা দেখি যে, তাদের কেউ কেউ সেইসব সোনালি দিনে ফিরে যেতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। বিদ্যার্থীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত বোধ করেছেন, যারা দরিদ্র অথচ সন্দেহাতীতভাবে সৌভাগ্যবান। খলিফা আল-মানসুর (মৃ. ১৫৮ হি.) তরুণ বয়সে যেখানে জ্ঞান রয়েছে বলে ধারণা করেছেন সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। হাদিস ও ফিকহেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে বেশ ভালো দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার কোনো আশা কি এখনো অপূর্ণ রয়েছে? কোনো আস্বাদ কি বাকি রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একটি বিষয় বাকি রয়েছে। সহচররা জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? তিনি বললেন, তা হলো মুহাদ্দিস কর্তৃক শাইখকে বলা, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। এ কথা শুনে তার উজিরবৃন্দ ও লেখকরা সমবেত হলেন এবং তার চারপাশে বসে গেলেন। তারা বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাদের কিছু হাদিস শোনান। তিনি বললেন, তোমরা তো তারা নও (তোমরা তালিবুল ইলমদের মতো নও), তাদের

২২৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

বস্ত্র জীর্ণ, তাদের পা ফেটে গেছে, তাদের চুল লম্বা, তারা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অনুসন্ধানে বেরিয়েছে, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, একবার ইরাকে গিয়েছে তো আরেকবার গিয়েছে হেজাযে, একবার শামে গিয়েছে তো আরেকবার গিয়েছে ইয়ামেনে, তারাই হাদিসের ধারক ও বাহক।[২২৪]

পিতারা সন্তানদের শিক্ষাদান, শৈশব থেকেই শিক্ষাগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করতে নির্দেশনা দান ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে আন্দালুসের আল্লামা আল-হুমাইদির (জন্ম ৪২০ হিজরির পূর্বে) ঘটনা চমকপ্রদ। তার পিতা তাকে হাদিস শোনানোর জন্য কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতেন। এটা ৪২৫ হিজরির কথা। ৪৪৮ হিজরিতে তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ করেন এবং মিশরে আগমন করেন। আন্দালুসে তিনি ইবনে আবদুল বার[২২৫] ও ইবনে হাযম থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। ইবনে হাযমের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন, তাকে তার রচনাবলি পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং তার থেকে গ্রহণ করেছেন প্রচুর। ইবনে হাযমের সহচর হিসেবে খ্যাতিও পেয়েছেন এবং তার মাযহাবের অনুসরণও করেছেন। তবে তার মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন না। আল-হুমাইদি দামেশক ও অন্যান্য শহরেও হাদিস শ্রবণ করেছেন। খতিব বাগদাদি থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তার অধিকাংশ রচনাবলি সম্পর্কে লিখেছেন। মক্কায় তিনি আল-যানজানি থেকে হাদিস শুনেছেন। বাগদাদ থেকে বেরিয়ে ওয়াসিতে কিছুকাল থেকেছেন। তারপর আবার বাগদাদে ফিরে এসে এখানেই স্থায়ী আবাস গড়েছেন। এই শহরে তিনি বহু হাদিস, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে লেখালেখি করেন এবং প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। মেধায় ও জ্ঞানে, দক্ষতায় ও বলিষ্ঠতায়, বিশ্বস্ততায় ও সত্যবাদিতায়, নিষ্ঠায় ও মহানুভবতায়, ধার্মিকতায় ও তাকওয়ায় তিনি মুসলিমদের অন্যতম ইমাম। এমনকি কতিপয় মনীষী তার সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন, আমার দুই চোখ আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদির মতো

---

২২৪. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৩২, পৃ. ৩৩০।

২২৫. ইবনে আবদুল বার : আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার আল-কুরতুবি আল-মালিকি (৩৬৮-৪৬৩ হি./৯৭৯-১১৭১ খ্রি.)। হাদিস ও আসারে যুগের ইমাম। তাকে 'হাফিযুল মাগরিব' বলা হতো। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، جامع بيان العلم وفضله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৭, পৃ. ৬৬-৭১; যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ৩, পৃ. ২১৭-২১৮।

কাউকে দেখেনি, মর্যাদায় ও মহত্ত্বে, চিত্তের পবিত্রতায় ও জ্ঞানের গভীরতায়, জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার আগ্রহে ও পরিবারের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারে।[২২৬]

অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পিতারাও জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফরে তাদের সন্তানদের সঙ্গে শরিক হতেন। উবাদাহ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনে উবাদাহ ইবনুস সামিত ও তার পিতা আল-ওয়ালিদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘটেছে। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা জ্ঞান অন্বেষণের জন্য আনসারদের এই মহল্লায় বের হলাম। মহল্লাটি তখনও ধ্বংস হয়ে যায়নি। আমরা প্রথমে যার দেখা পেলাম তিনি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আবুল ইয়ুসের সঙ্গে, তার একটি ছেলে ছিল। তিনি আমাদের হাদিস শোনালেন।[২২৭]

জ্ঞান অন্বেষণে সন্তানদের সঙ্গে পিতাদেরও ভ্রমণ মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় একটি ইসলামি নবসংযোজন। এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, অন্য কোনো জাতির এই বৈশিষ্ট্য নেই। আমিরুল মুমিনিন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক নিজে ও তার দুই পুত্র আতা রহ.-এর কাছে গেলেন। তার কাছাকাছি বসলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তাদের দিকে ঘুরলেন। তারা তাকে হজের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলেন। তারপর তিনি অন্যদিকে ঘুরলেন। সুলাইমান তার দুই পুত্রকে বললেন, তোমরা দাঁড়াও। তারা দাঁড়ালেন। তখন তাদের বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্ররা, জ্ঞান অন্বেষণে অলসতা করো না।[২২৮] একইভাবে খলিফাতুল মুসলিমিন হারুনুর রশিদ তার দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনকে নিয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর মুয়াত্তা শোনার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়েছিলেন।[২২৯]

কোনো কোনো পিতা তাদের সন্তানকে জ্ঞান অন্বেষণে বাধা দিতেন। তারা মনে করতেন, এতে তাদের জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে এবং তারা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

---

২২৬. আবুল আব্বাস মাক্কারি, *নাফহুত তিব্ব*, খ. ২, পৃ. ১১৩।
২২৭. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ১, পৃ. ৩৪১।
২২৮. ইবনে আসাকির, *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, খ. ৪০, পৃ. ৩৭৫।
২২৯. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওফায়াতুল মাশাহির ওয়াল-আলাম*, খ. ৪০, পৃ. ৪১।

তবে সমাজ এসব অধ্যবসায়ী অসাধারণ ছাত্ররা যাতে পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জন অব্যাহত রাখতে পারে তার জন্য সহায়তা করতে সদা প্রস্তুত ছিল। ইবনে কাসির একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হাশিম ইবনে বাশির ইবনে আবু হাযিম আল-কাসিম আবু মুআবিয়া আস-সুলামি আল-ওয়াসিতির পিতা বাশির ইবনে আবু হাযিম ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফির বাবুর্চি। এই চাকরির পর তিনি আচার বিক্রি করতেন। তিনি তার ছেলে হাশিমকে পড়াশোনা করতে না দিয়ে তার কাজে সাহায্য করতে বলতেন। কিন্তু হাশিম হাদিস শোনা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওয়াসিতের কাজি (বিচারক) আবু শাইবা তাকে দেখতে এলেন। তার সঙ্গে বহু লোকজন এলো। বাশির কাজিকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। ছেলেকে বললেন, হে বৎস, তোমার সুনাম কি এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে স্বয়ং কাজি এসে আমার ঘরে উপস্থিত! না, আজ থেকে তোমাকে আর হাদিস শুনতে মানা করব না। হাশিম ছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তিনি মালিক, শু'বা[২৩০], সুফয়ান সাওরি[২৩১] এবং অন্য অনেকের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ ও আবেদ।[২৩২]

কোনো সন্দেহ নেই যে এই সামাজিক দায়িত্ববোধই শহরের কাজিকে এবং আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তিকে একটি পীড়িত দরিদ্র তরুণের কাছে আসতে বাধ্য করেছে। যে তরুণ জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যবসায় এবং এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ার সামান্য বস্তুরও মালিক নয়। এসব ঘটনা থেকে যে ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় তা এই যে, ইসলামি সভ্যতা জ্ঞান ও জ্ঞান অন্বেষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শুরুটা হয়েছে বিদ্যার্থীদের দিয়ে এবং শেষ হয়েছে আলেম-উলামা, জ্ঞানী-গুণী

---

২৩০. শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ : আবু বুসতাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ারদ আল-আযদি আল-বসরি (৮২-১৬০ হি./৭০১-৭৭৬ খ্রি.)। হাদিস, কবিতা ও সাহিত্যের ইমাম। ইমাম শাফিয়ি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, শু'বা না থাকলে ইরাকে হাদিস কী জিনিস তা জানা যেত না। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১৬৪।

২৩১. সুফয়ান আস-সাওরি : আবু আবদুল্লাহ সুফয়ান ইবনে সাইদ ইবনে মাসরুক আস-সাওরি (৯৭-১৬১ হি./৭১৬-৭৭৮ খ্রি.)। হাদিসের ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনিন। কুফায় জন্মগ্রহণ করেছেন ও বেড়ে উঠেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন বসরায়। রচিত গ্রন্থ : *আল-জামিউল কাবির*, *আল-জামিউস সগির*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ১০৪।

২৩২. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১০, পৃ. ১৯৮।

ও শিক্ষকদের দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও এসব দৃষ্টান্ত সন্দেহাতীতভাবে জানিয়ে দেয় যে, ইসলামি সভ্যতা বিদ্যার্থীদেরকে সমাজের উচ্চস্তরে আসন দিয়েছে। এ ব্যাপারটি আমরা বিশ্বের অন্য কোনো জাতির কাছে পাই না। কারণ তারা সম্পদ, ক্ষমতা, রাজত্ব, শক্তি, কর্তৃত্ব, প্রতাপ ও কুসংস্কার ইত্যাদি বস্তুবাদী বিষয়কেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে।

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞান অন্বেষণে সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতে মায়েরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা অজ্ঞাত নয়। অনেক মা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় সেই শাশ্বত যুগে নারীরা কতটা সচেতন ছিলেন। এসব মহান মায়েদের একজন হলেন উম্মে রবিআতুর রাই[২৩৩] (রবিআতুর রাইয়ের মা)। রবিআতুর রাই ইমাম মালিকের শাইখ ছিলেন। উম্মে রবিআর স্বামী ফাররুখ উমাইয়া শাসনামলে খোরাসানে অভিযানে বেরিয়েছিলেন এবং রবিআকে তার গর্ভে রেখে গিয়েছিলেন। তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন ত্রিশ হাজার দিনার। যাতে রবিআর মা তার লালনপালন, তরবিয়ত ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। ফাররুখ সাতাশ বছর পর ফিরে আসেন। মজসিদে নববিতে প্রবেশ করে তিনি বড় একটি মজলিস দেখতে পান। তিনি মজলিসটির কাছে আসেন এবং দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মালিক, হাসান বসরি ও মদিনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। তিনি মজলিসটির পরিচালক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেন এটি রবিআ ইবনে আবু আবদুর রহমানের (অর্থাৎ তার পুত্রের) মজলিস!

ফাররুখ ঘরে ফিরে এসে তার স্ত্রী ও সন্তানের মাকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে যে অবস্থায় দেখলাম কোনো আলেম বা ফকিহকে তেমন দেখিনি। তার স্ত্রী বললেন, তাহলে কোনটি আপনার কাছে প্রিয়, ত্রিশ হাজার দিনার নাকি আপনার ছেলে যে অবস্থায় আছে তা? ফাররুখ বললেন, ত্রিশ হাজার দিনার নয়—আল্লাহর কসম—এটাই আমার কাছে

---

২৩৩. রবিআতুর রাই : রবিআ ইবনে আবু আবদুর রহমান আত-তাইমি, রবিআতুর রাই নামে পরিচিত। ইবনে হাজার আসকালানি তার সম্পর্কে বলেছেন, বিশ্বস্ত রাবি ও বিখ্যাত ফকিহ। বিশুদ্ধ মতে তিনি ১৩৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, *তাকরিবুত তাহযিব*, পৃ. ২০৭; *তারিখে বাগদাদ*, খ. ৮, পৃ. ৪২০; আল-বাজি, *আত-তা'দিল ওয়াত-তাজরিহ*, খ. ২, পৃ. ৫৭৩।

প্রিয়। তার স্ত্রী বললেন, আমি সমস্ত টাকাই তার জন্য খরচ করেছি। ফাররুখ বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি তা বিনষ্ট করোনি![২৩৪]

সুফয়ান সাওরি ছিলেন আরবদের ফকিহ (ফকিহুল আরব) ও তাদের মুহাদ্দিস, হাদিসের ক্ষেত্রে আমিরুল মুমিনিন। যায়িদা[২৩৫] তার সম্পর্কে বলেছেন, আস-সাওরি হলেন মুসলিমদের নেতা।[২৩৬] আওযায়ি[২৩৭] তার সম্পর্কে বলেছেন, এই উম্মাহর সবাই যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছে তাদের মধ্য থেকে সুফয়ান সাওরি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।[২৩৮] এই সুফয়ান সাওরির পেছনে রয়েছে তার আত্মত্যাগী পুণ্যবতী মায়ের অবদান। তিনি তার লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা ও যাবতীয় খরচের দায়িত্ব বহন করেছেন। সুফয়ান সাওরি তারই ফল। আমরা এই নারীর আত্মত্যাগের ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই।

সুফয়ান সাওরি নিজেই তার ব্যাপারে বলেছেন, যখন আমি জ্ঞান অন্বেষণে বেরুতে চাইলাম, বললাম, হে আমার প্রতিপালক, আমার রুজি-রোজগার আবশ্যক। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, জ্ঞান হ্রাস পাচ্ছে ও বিলুপ্তি ঘটছে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, জ্ঞান অন্বেষণেই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখব। আল্লাহর কাছে আমার প্রয়োজনীয় রুটিরুজির আরজি জানালাম। অর্থাৎ, আল্লাহ যেন যথেষ্ট রিজিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা তার মাকে প্রস্তুত করে দিলেন। তিনি তাকে বলেন, হে প্রিয়পুত্র, তুমি জ্ঞান অর্জন করো, আমি আমার তকলি (সুতা কাটার মাকু) দিয়ে তোমার যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করব।[২৩৯]

---

২৩৪. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৮৯-২৯০।

২৩৫. যায়িদা ইবনে কুদামা আস-সাকাফি : তিনি হলেন আবুস সাল্‌ত আল-কুফি, বিখ্যাত তাবে তাবেয়িন। যাহাবি তার সম্পর্কে বলেছেন, বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য রাবি। রোমে ১৬১ হিজরিতে গাজি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *আল-কাশিফ ফি মারিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল-কুতুবিস সিত্তাতি*, খ. ১, পৃ. ৪০০; ইবনে হাজার আসকালানি, *তাকরিবুত তাহযিব*, ২১৩।

২৩৬. ইবনে আবি হাতিম, *আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

২৩৭. আবু আমর আল-আওযায়ি : আবদুর রহমান ইবনে আমর (৮৮-১৫৭ হি.), হাদিস ও ফিকহের ক্ষেত্রে সমকালে শামের (সিরিয়ার) ইমাম। বৈরুতে বসবাস করেছেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন। দেখুন, ইবনে সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৪৮৮; আল-মিযযি, *তাহযিবুল কামাল ফি আসমায়ির রিজাল*, খ. ১৭, পৃ. ৩০৮।

২৩৮. যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ২০৪।

২৩৯. আবু নুআইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৭০।

সুফয়ান সাওরির মা তকলিতে সুতা কেটে রোজগার করতেন এবং তার ছেলের জন্য কিতাবাদি ও পড়াশোনার খরচ দিতেন। এভাবে ছেলেকে নিশ্চিন্ত হয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেন। এর চেয়েও বড় ব্যাপার এই যে, তিনি ছেলেকে ইলম অর্জনে লেগে থাকার ও ইলম অনুযায়ী আমল করার উপদেশ দিয়ে যেতেন। একবার তিনি ছেলেকে বললেন, হে প্রিয়পুত্র, যখন তুমি দশটি অক্ষরও লিখবে, চিন্তা করে দেখবে যে তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না, যদি তা না দেখতে পাও তাহলে বুঝবে যে সেইসব অক্ষর তোমার ক্ষতিই করছে, কোনো উপকার করছে না।[২৪০]

এমনই ছিলেন সুফয়ান সাওরির মা, তাই তিনিও ছিলেন এমন! জ্ঞানের নেতৃত্ব ও দ্বীনের ইমামতের আসন লাভ করেছিলেন!

এখানে আমরা প্রখ্যাত ইমামদের জীবনে তাদের মায়েদের যে ভূমিকা ছিল তা উল্লেখ না করে পারব না। ইমাম বুখারি ছিলেন মুহাদ্দিসদের আমির। তিনি শিশুকালেই পিতাকে হারান। তার মায়ের কাছে লালিতপালিত হন। তার মা তাকে যথার্থরূপে বড় করে তোলেন, যথাযথ যত্ন নেন এবং দোয়া করেন। জ্ঞান ও সততা অর্জনের প্রতি তাকে উৎসাহিত করেন। তার সামনে কল্যাণের দ্বারসমূহ শোভনীয় হয়ে ওঠে। ইমাম বুখারির বয়স যখন ষোলো বছর তখন তার মা তাকে নিয়ে মক্কায় হজ করতে যান। তিনি ছেলেকে সেখানে রেখে দেশে ফিরে আসেন। তার উদ্দেশ্য, ছেলে সেখানে অবস্থান করে আরবিভাষীদের থেকে ইলম অর্জন করবে এবং 'ইমাম বুখারি' হয়ে ফিরে আসবে। মুসলিম মায়েদের, বিশেষ করে বিধবাদের শেখাতে, কীভাবে সন্তানদের লালনপালন করতে হয়, তাদের মানুষ করতে হয় এবং উম্মাহর জাগরণ ও উন্নতিতে মায়েদের ভূমিকা কী!

ইমাম শাফিয়ির বয়স দুই বছর হলে তার মা তাকে নিয়ে গাজা (শাফিয়ির জন্মস্থান) থেকে মক্কায় সফর করেন। যেখানে রয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যার চারপাশে মরুভূমি, যেখানে তার ছেলের ভাষা বিশুদ্ধ হবে।[২৪১] এই মহীয়সী নারীর প্রচেষ্টার ফলই হলেন ইমাম শাফিয়ি রহ.।

২৪০. ইবনুল জাওযি, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, খ. ৩, পৃ. ১৮৯।

২৪১. মুস্তাফা আশ-শাকআহ, *আল-আয়িম্মাতুল আরবাআ* (ইমাম শাফিয়ির মায়ের প্রসঙ্গ), পৃ. ১০-১১।

জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ ছিল একটি প্রিয় কাজ, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চাইতেন। এ কারণে বিশিষ্ট তাবিয়ি মাকহুল আদ-দিমাশকি গর্ব করে বলেছেন, আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি।[২৪২] এ কারণেই মাকহুল রহ. মুসলিমদের বড় আলেম ও মনীষী হতে পেরেছেন। তিনি এত বিশাল মাপের আলেম ছিলেন যে, তার সম্পর্কে আল-ইমামুল কাবির মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আয-যুহরি বলেছেন, আলেম হলেন চারজন। হেজাযে সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, বসরায় হাসান আল-বসরি, কুফায় শা'বি এবং শামে (সিরিয়ায়) মাকহুল।[২৪৩]

এ সকল আলেম তাদের জ্ঞান অন্বেষণমূলক ভ্রমণে অপরিসীম শ্রম ব্যয় করেছেন, কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ইবনে আবি হাতিম তার *'আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল'* গ্রন্থের ভূমিকায় তার পিতা আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আল-রাযি[২৪৪] জ্ঞান অন্বেষণে যে ক্লেশ ভোগ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি তার পিতা থেকে এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তার পিতা বলেছেন, প্রথম বছর হাদিস অন্বেষণে বের হয়ে আমি সাত বছর কাটাই। পায়ে হেঁটে আমি কতটা পথ অতিক্রম করেছি তার হিসাব রেখেছি। তা এক হাজার ফারসাখের চেয়েও অনেক বেশি। হিসাব রাখছিলাম, এক হাজার ফারসাখ[২৪৫] হয়ে যাওয়ার পর হিসাব রাখা বাদ দিয়েছি। এই সময়ে আমি যেসব এলাকা ভ্রমণ করেছি তা নিম্নরূপ : কুফা থেকে বাগদাদে যে কতবার গিয়েছি তার হিসাব নেই, মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছি অনেকবার, বাহরাইনের সাল্লা শহরের কাছাকাছি এলাকা থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে মিশরে গিয়েছি, মিশর থেকে গিয়েছি রামাল্লায়, রামাল্লা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে, রামাল্লা থেকেই গিয়েছি আসকালানে, সেখান থেকে গিয়েছি তাবারিয়ায়, তাবারিয়া থেকে গিয়েছি দামেশকে, দামেশক থেকে

---

২৪২. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৯, পৃ. ৩৩৪।

২৪৩. প্রাগুক্ত।

২৪৪. আবু হাতিম আল-রাযি : মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস ইবনে মুনযির ইবনে দাউদ ইবনে মিহরান (১৯৫-২৭৭ হি./৮১০-৮৯০ খ্রি.) রায়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন বাগদাদে। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *তাবাকাতুত তাবিয়িন*, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম* ও *আ'লামুন নুবুওয়া*। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৭।

২৪৫. ১ ফারসাখ = ৪.৮ কিলোমিটার।

গিয়েছি হিমসে, হিমস থেকে গিয়েছি আন্তাকিয়ায়, আন্তাকিয়া থেকে তারতুসে, তারপর তারতুস থেকে ফিরে এসেছি হিমসে, সেখানে আবুল ইয়ামেনের কাছে কিছু হাদিস শোনা বাকি ছিল, সেগুলো শুনেছি। হিমস থেকে বেরিয়ে পড়েছি বাইসানের উদ্দেশে, বাইসান থেকে গিয়েছি রাক্কায় (রাকায়), রাক্কা থেকে বেরিয়ে ফুরাত নদী পেরিয়ে গিয়েছি বাগদাদে। শামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ার আগে ওয়াসিত থেকে গিয়েছি নীলে, নীল থেকে গিয়েছি কুফায়। এসব ভ্রমণ আমি পায়ে হেঁটেই করেছি। এগুলো আমার প্রথমবার সফরের ঘটনা, তখন আমার বয়স বিশ বছর। সফরে বেরিয়ে সাত বছর ভ্রমণ করেছি। পারস্যের রায় (আমার জন্মস্থান) থেকে বেরিয়েছি ২১৩ হিজরিতে এবং ফিরে এসেছি ২২১ হিজরিতে। দ্বিতীয়বার সফরে বেরিয়েছি ২৪২ হিজরিতে এবং ফিরে এসেছি ২৪৫ হিজরিতে–তিন বছর ভ্রমণ করেছি।[২৪৬]

আন্দালুসীয় মুসলিমদের কাছে ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা ছাড়া আলেমগণের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণও ছিল এটি। আল-মাক্কারি আবু আমর আদ-দানি[২৪৭] সম্পর্কে বলেছেন, যারা আন্দালুস থেকে প্রাচ্যে ভ্রমণ করেছেন তিনি তাদের একজন। তাকে সবার চেয়ে এগিয়ে রাখা উচিত। তিনি এর উপযুক্ত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকলের কাছে পরিচিত। হাফিজ, কারি, ইমাম, আল্লাহওয়ালা। ৩৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইলম অর্জন করতে শুরু করেন ৩৮৭ হিজরিতে। ৩৯৭ হিজরিতে প্রাচ্যের উদ্দেশে ভ্রমণ করেন। কায়রাওয়ানে চার মাস অবস্থান করেন। ওই বছরেরই শাওয়াল মাসে মিশরে প্রবেশ করেন। মিশরে থাকেন এক বছর। তারপর হজ করেন। ৩৯৯ হিজরির জিলকদ মাসে আন্দালুসে ফিরে আসেন।[২৪৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানলাম যে এই সভ্যতা তার সন্তানদের অন্তরে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বদ্ধমূল করে

---

২৪৬. ইবনে আবি হাতিম, *আল-জারহু ওয়াত-তা'দিল*, খ. ১, পৃ. ৩৪০, ৩৫৯।

২৪৭. আবু আমর আদ-দানি : উসমান ইবনে সাইদ ইবনে উসমান, ডাকনাম ইবনুস সাইরাফি (৩৭১-৪৪৪ হি./৯৮১-১০৫৩ খ্রি.)। বনি উমাইয়ার আজাদকৃত দাস। হাদিসের হাফিয। ইলমুল কুরআন, রেওয়ায়েত ও তাফসিরের ইমামদের একজন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২০, পৃ. ২০; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২০৬।

২৪৮. আবুল আব্বাস মাক্কারি, *নাফহুত তিব্ব*, খ. ২, পৃ. ১৩৫।

দিয়েছে। সেই জ্ঞানের উৎস যেখানেই থাকুক। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, এই সভ্যতার হাজার হাজার সন্তান মৌমাছির মতো উদ্যম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বা নির্দিষ্ট শাইখের কাছে বন্দি থাকেনি। এ ব্যাপারটি আমরা অন্যান্য সভ্যতার সন্তানদের মধ্যে পাই না। কারণ মুসলিমদের কাছে জ্ঞান একটি সর্বজনীন বিষয়। এই বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে দীর্ঘ বহু শতাব্দীব্যাপী অনন্য করে রেখেছে।

Asif Rahman

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামি সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থান

জ্ঞানী-সমাজের বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবারের ভূমিকার চেয়ে কম নয়। বরং রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় পরিবারের চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্থান ও বিস্তৃতি, প্রগতি ও স্বাধীনতার পথে যাত্রা এবং অধীনতার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির জন্য আবশ্যক ছিল আলেম-উলামা ও জ্ঞানীদের দায়িত্ব গ্রহণ ও তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তাদের ভরণপোষণ ও সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর রাখা।

সত্য এই যে, ইসলামি সাম্রাজ্য এই ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব একদিনের জন্যও বিস্মৃত হয়নি, বরং অধিকাংশ সময় এটাই ছিল তার প্রধান দায়িত্ব। বরং আপনি দেখবেন যে, ইসলামি বিশ্বের দূরদূরান্তের শহরগুলোও মাদরাসায়, উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে, গণগ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। এই ক্ষেত্রে যে অসংখ্য মুসলিম খলিফা ও আমিরের বিরাট অবদান রয়েছে এবং তারা যে আলেম-উলামা এবং বিদ্যার্থীদের দেখাশোনা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেছেন তা ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময় ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ রেখেছে।

এ সকল খলিফার মধ্যে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছেন আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদ। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক[২৪৯] তার সম্পর্কে বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ এবং খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবিদের যুগের পরে খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে সবচেয়ে বেশি আলেম দেখেছি, সবচেয়ে বেশি কুরআনের কারি দেখেছি এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতাকারী ও হালাল-হারাম মান্যকারী দেখেছি। আট বছরের বালকও কুরআন (কুরআনের ব্যাখ্যা) সংকলন করেছে।

---

২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক : আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আল-কুরাশি বিল-ওয়ালা (মৃ. ২৫৪ হি./৮৬৮ খ্রি.)। ইরাকের হালওয়ান শহরের বিচারক। হাফেযে হাদিস এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। দেখুন, ইবনে মাকুলা, *আল-ইকমাল*, খ. ৭, পৃ. ২৩৯; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২২২।

এগারো বছরের বালকও ফিকহ ও ইলমে গভীরতা অর্জন করেছে, হাদিস বর্ণনা করেছে, বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ সংকলন করেছে, শিক্ষকদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করেছে।[২৫০] এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যে, খলিফা হারুনুর রশিদ জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনকারীদের পেছনে অঢেল খরচ করেছেন, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানীদের প্রতি মনোযোগী থেকেছেন এবং তালিবুল ইলমদের শৈশব থেকেই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন!

ইসলামি সভ্যতা ও জাগরণের যুগে বিভিন্ন পর্যায়ের কী পরিমাণ মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কী পরিমাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে আপনি জানতে পারবেন আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণীদের শৈশব থেকেই রাষ্ট্র তাদের প্রতি কী ভূমিকা পালন করেছে। কুরআনুল কারিমের পাঠদান ও তাফসির শেখার জন্য বহু মাদরাসা ছিল, হাদিস শেখার জন্যও ছিল বহু মাদরাসা, ফিকহ শেখার জন্য যেমন বহু মাদরাসা ছিল, তেমনই চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যও ছিল বহু প্রতিষ্ঠান। এতিমদের জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

শৈশবকাল পেরোনোর পর রাষ্ট্র তার জ্ঞানী-গুণী সন্তানদের জন্য উপযোগী ও যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, ভালো ভালো পদে নিযুক্ত করেছে। যা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এগুলো ছাড়া তাদের বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য ভাতাও দেওয়া হতো। এখানে শাইখ নাজমুদ্দিন আল-খাবুশানির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাকে সুলতান সালাহুদ্দিন মাদরাসাতুস সালাহিয়্যায় শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। শিক্ষকতার জন্য তিনি মাসিক চল্লিশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেতেন এবং মাদরাসার ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য পেতেন দশ দিনার। তা ছাড়া দৈনিক রুটি পেতেন ষাট মিশরীয় রিত্‌ল[২৫১] এবং নীলনদের পানি পেতেন দুই বাহন।[২৫২]

---

২৫০. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি, *আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাতু গ্রন্থটি তারিখুল খুলাফা* নামে পরিচিত, খ. ২, পৃ. ১৫৭।

২৫১. এক মিশরীয় রিত্‌ল = ৪৪৯.২৮ গ্রাম।

২৫২. সুয়ুতি, *হুসনুল মুহাদারাহ*, খ. ২, পৃ. ৫৭।

আল-আযহারের শাইখগণ মাসিক বেতন পেতেন। তার মধ্যে তাদের বাহন ঘোড়া-খচ্চরের খরচও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ আল-আযহারের ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে একটি বিশেষ অংশ ছিল শাইখদের বাহনের খরচাদি বহনের জন্য।[২৫৩]

আলেম-উলামা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের যাতে কোনো ধরনের বৈষয়িক চিন্তা করতে না হয় সেজন্যই এমন ব্যবস্থা ছিল। যাতে তারা গবেষণা, লেখালেখি ও নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হতে পারেন, মানুষদের জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন, পার্থিব জীবন ও আখিরাত উভয় দিক থেকে জনগণের উপকার করতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামি সভ্যতার সেই সূচনার যুগে শিক্ষকদের একটি সমিতি ছিল। শিক্ষকেরাই এই সমিতির সভাপতি মনোনীত করতেন। সুলতান শিক্ষক সমিতিতে কোনোভাবেই নাক গলাতেন না, তবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি তা মীমাংসা করে দিতেন।

এ প্রসঙ্গে আবু শামা আল-মাকদিসি[২৫৪] আর-রাওদাতাইন গ্রন্থে মুকাল্লিদ আদ-দাওলায়ি থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, হাফেয মুরাদি যখন মারা যান তখন আমরা, মানে ফকিহের দল দুইভাগে বিভক্ত ছিলাম। এক দল হলো আরব, আরেক দল হলো কুর্দি। আমাদের মধ্যে কারও কারও মাযহাবের প্রতি ঝোঁক ছিল, তারা শাইখ শারফুদ্দিন ইবনে আবু আসরুনকে[২৫৫] ডেকে আনতে চাইল। তিনি মসুলে থাকতেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। তারা কুতবুদ্দিন আন-নিশাপুরিকে ডেকে আনতে চাইল। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। তারপর অনারবদের দেশে আসেন। এ কারণে আমাদের মধ্যে কথা

---

২৫৩. মুস্তাফা আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, পৃ. ১০২।

২৫৪. আবু শামা : আবদুর রহমান ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম (৫৯৯-৬৬৫ হি./১২০২-১২৬৬ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, মূলনীতি-বিশেষজ্ঞ ও কারি। দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বড় হয়েছেন। দারুল হাদিস আল-আশরাফিয়্যার প্রধান শাইখ ছিলেন। দেখুন, ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৬৬, পৃ. ৩; শাতিবি, *ইবরাযুল মাআনি মিন হিরযিল আমানি*, খ. ১, পৃ. ১।

২৫৫. ইবনে আবু আসরুন : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হিবাতুল্লাহ আত-তামিমি (৪৯২-৫৮৫ হি./১০৯৯-১১৮৯ খ্রি.)। শাফিয়ি ফকিহ। মসুলে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর বাগদাদে চলে যান। দামেশকে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৫৭৩ হিজরিতে দামেশকের বিচারক নিযুক্ত হন। দামেশকের আল-আসরুনিয়্যা মাদরাসাটির নামকরণ তার নামেই হয়েছে।

কাটাকাটি শুরু হয়। ফকিহদের মধ্যে একটা ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা সুলতান নুরুদ্দিন জিনকির কানে যায়। তিনি আলেপ্পোর দুর্গে ফকিহদের ডেকে পাঠান। তার প্রতিনিধি হিসেবে মাজদুদ্দিন ইবনে দাব্বা তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো, বিদআতের মূলোৎপাটন করা, দ্বীনের বিজয় নিশ্চিত করা। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যা শুরু হয়েছে তা শোভনীয় নয় এবং আপনাদের সঙ্গে তা যায় না। নুরুদ্দিন বললেন, আমরা উভয় দলকে খুশি করে দেবো। দুই দলের দুই শাইখকে ডেকে পাঠাব। তিনি শাইখ দুজনকে ডেকে পাঠান। শাইখ শারফুদ্দিনকে তার নামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটির দায়িত্ব দেন এবং শাইখ কুতবুদ্দিনকে দেন মাদরাসাতুন নাফারির দায়িত্ব।[২৫৬]

যে-সকল জ্ঞানী-বিজ্ঞানী উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রতিও রাষ্ট্র পর্যাপ্ত আনুকূল্য দেখিয়েছে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। তৃতীয় মুওয়াহহিদি খলিফা আল-মানসুর ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মুমিন মেধাবী বিদ্যার্থীদের জন্য 'বাইতুত তালাবা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই এটির তত্ত্বাবধান করেন। এমনকি তার কিছু সহচর এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। কারণ তারা খলিফার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার ঘনিষ্ঠ ছিল। খলিফা তাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হতেন এবং কথা বলতেন। সহচরদের হিংসার বিষয়টি তার কানে গেল। তিনি আশঙ্কা বোধ করলেন এবং তাদের উদ্দেশে বললেন, হে মুওয়াহহিদি গোষ্ঠী, তোমাদের নিজ নিজ গোত্র রয়েছে। তোমরা কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হলে তোমাদের গোত্রের কাছে আশ্রয় নাও। কিন্তু এই বিদ্যার্থীদের কোনো গোত্র নেই, আমি ছাড়া তাদের কেউ নেই। তারা কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হলে আমিই তাদের আশ্রয়স্থল। তারা আমার কাছেই তাদের ভয় ও আশঙ্কার কথা প্রকাশ করতে পারে। তারা আমার ওপরই নির্ভর করে...।[২৫৭] এইভাবেই মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিস্তৃত হয় এবং নেতৃত্ব দেয়।

---

২৫৬. আবু শামা আল-মাকদিসি, *আর-রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ১৭।
২৫৭. আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকেশি, *আল-মু'জিব ফি তালখিছি আখবারিল মাগরিব*, পৃ. ৮১।

আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের[২৫৮] সঙ্গে আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালামের[২৫৯] একটি চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল। আমির-উমারা শ্রেণি জ্ঞানীদের মেধার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা রাখতেন এবং কর্মতৎপর মেধাবীদের কতটা সম্মান করতেন তা এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম তার *'গারিবুল হাদিস'* গ্রন্থটি রচনা করার পর আবদুল্লাহ ইবনে তাহিরের কাছে পেশ করেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, যে মেধা তার বাহককে এই গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার জীবিকা উপার্জনের মুখাপেক্ষী না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এই কথা বলে তিনি আবু উবাইদ আল-কাসিমের জন্য মাসিক দশ হাজার দিরহাম ভাতা জারি করেন।[২৬০]

বড় বড় উপঢৌকন ও মূল্যবান উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল খুব প্রসিদ্ধ। খলিফা, গভর্নর ও প্রশাসকরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের এসব উপঢৌকন ও উপহার দিতেন এবং তাদেরকে আরও বেশি জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করতেন। অকল্পনীয় মূল্যবান ছিল এসব উপঢৌকন। এসব উপঢৌকনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অন্য ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদের জন্য অনুবাদককে অনূদিত বইয়ের সমওজনের স্বর্ণ প্রদান![২৬১]

এ কারণে অনুবাদ-তৎপরতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং এর ফলে মুসলিমরা বিপুল জ্ঞানরাশিতে সমৃদ্ধ হয়েছে।

উসমানি খিলাফত এই ক্ষেত্রে চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারা সব শহর ও এলাকা থেকে সেরা মেধাবীদের সমবেত করতে সফল হয়েছিল এবং তাদের পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল। ফলে তাদের প্রত্যেক সেরা

---

২৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে তাহির : আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে তাহির ইবনুল হুসাইন আল-খুযায়ি *আল-খুরাসানি* (১৮২-২৩০ হি./৭৯৮-৮৪৪ খ্রি.)। আব্বাসি যুগের বিখ্যাত গভর্নরদের একজন। শাম (সিরিয়া), খুরাসান, মিশর, তাবারিস্তান, কিরমান ও রায়ের গভর্নর ছিলেন। নিশাপুরে মৃত্যুবরণ করেন। মারভে মৃত্যুবরণ করেছেন বলেও বর্ণনা রয়েছে।

২৫৯. আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম : আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সালাম আল-হারাবি (১৫৭-২২৪ হি./৭৭৪-৮৩৮ খ্রি.)। হাদিস, আদব ও ফিকহের অন্যতম বড় আলেম। হিরাতে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই জ্ঞান অর্জন করেন। বাগদাদ ও মিশর ভ্রমণ করেছেন। মক্কা মুকাররমায় মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪৯০-৪৯২।

২৬০. খতিব বাগদাদি, *তারিখে বাগদাদ*, খ. ১২, পৃ. ৪০৬; ইবনে আসাকির, *তারিখে দিমাশক*, খ. ৪৯, পৃ. ৭৪; ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৮, পৃ. ২৮৪।

২৬১. ইবনে সায়িদ আল-আন্দালুসি, *তাবাকাতুল উমাম*, পৃ. ৪৮-৪৯।

মেধাবীই তার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি উসমানি সাম্রাজ্যকে সামরিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল এবং তা বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামি সাম্রাজ্য কেবল নিজ দেশের জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধান করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং শাসকেরা অন্যান্য দেশ ও শহরের জ্ঞানী-গুণীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছেন। তারা ভিনদেশি জ্ঞানীদের এভাবে সম্মানিত করতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। আল-মুয়িয ইবনে বাদিস ছিলেন ইসলামি মরক্কোর সানহাজি রাজ্যের একজন আমির।[২৬২] তিনি যখনই কোনো শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীর নাম শুনতেন, তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন। শুধু তাই নয়, তাকে তার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন, তার মতামতের ওপর নির্ভর করতেন এবং তার জন্য উচ্চ ভাতা নির্ধারণ করে দিতেন।[২৬৩]

সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ যখনই শুনেছেন যে, কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি সংকটে বা অভাবে পড়েছেন, তিনি তাকে সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছেন এবং পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকাপয়সা ব্যয় করেছেন।[২৬৪]

মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ মৃত্যুশয্যায় তার পুত্রকে যে ওসিয়ত বা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তা থেকে এ চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওসিয়তে তিনি বলেছিলেন, ...আলেম-উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটি রাজ্যের সুদৃঢ় শক্তি। তুমি তাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে এবং তাদের উৎসাহ দেবে। যখনই তুমি শুনবে অন্য দেশে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন, তাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে আসবে। ধনসম্পদ দিয়ে তাকে সম্মানিত করবে।[২৬৫]

---

২৬২. বনু যিরির আমির। যিরি রাজবংশ (Zirid dynasty) সানহাজি রাজবংশের একটি শাখা।

২৬৩. ইবনে ইযারি, *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতেছারি আখবারি মুলুকিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ১২৯।

২৬৪. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া-আসবাবুস সুকুত*, পৃ. ১৪০।

২৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের আচরণের ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপারটি লক্ষ করি তা এই যে, মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য ধর্ম, মতাদর্শ ও জাতি-গোষ্ঠীর জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বৈষম্য করেনি। বুখতিশু নাসতুরি পরিবার[২৬৬] এই ক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ। এই পরিবারের সন্তানেরা প্রায় সত্তর বছর আব্বাসি খলিফাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর থেকে খলিফা আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ পর্যন্ত বুখতিশু পরিবারই ছিল তাদের চিকিৎসক। রাজদরবারে তাদের মর্যাদা ছিল বেশ, বিশেষ খাতির-যত্নও ছিল।[২৬৭] এই পরিবারের একজন চিকিৎসক হলেন জিবরিল ইবনে বুখতিশু ইবনে জর্জিস (মৃ. ২১৩ হি.)। তিনি খলিফা হারুনুর রশিদের চিকিৎসক ছিলেন এবং তার সহচর ও বন্ধু ছিলেন। এমনকি এ কথাও রটে গিয়েছিল যে, খলিফার কাছে তার অবস্থান দিন দিন দৃঢ়ই হচ্ছে। এমনকি হারুনুর রশিদ তার সঙ্গীসাথির উদ্দেশে একবার ঘোষণাও দিলেন, আমার কাছে তোমাদের কারও কোনো প্রয়োজন থাকলে তা জিবরিলকে বলো।[২৬৮]

একইভাবে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির কাছে ইহুদি ইবনে মাইমুন আল-আন্দালুসি বিশেষ গুরুত্ব ও খাতির-যত্ন পেতেন। তিনি সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন।[২৬৯]

শাসকেরা ও আমির-উমারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে টানতে না পারলে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। তা এই যে, তাদের কোনো গ্রন্থ রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কিনে নিতেন।

উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আন্দালুসের উমাইয়া খলিফা আল-হাকাম আরবি সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ '*আল-আগানি*' রচনার কথা শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রন্থটির রচয়িতা আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানির কাছে গ্রন্থটির একটি কপির মূল্য বাবদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন। যেন তিনি একটি কপি

---

২৬৬. নাসতুরি খ্রিষ্টান (Nestorian Christian) গোত্রের পরিবার। বনি বুখতিশু বা বনি আবদুল মাসিহ নামেও পরিচিত। বুখত শব্দের অর্থ বান্দা বা দাস এবং ইয়াশু শব্দের অর্থ ইসা মাসিহ আ.।

২৬৭. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ৪৪-৪৫।

২৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১১।

২৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩২৯।

আন্দালুসে খলিফা আল-হাকামের কাছে পাঠিয়ে দেন। খলিফা যা চাইলেন তা-ই হলো। আবুল ফারাজ *আল-আগানি*র একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। লেখকের জন্মভূমি ইরাকে গ্রন্থটি পঠিত হওয়ার পূর্বে তা পঠিত হলো আন্দালুসে!!

ইসলামি সভ্যতায় খলিফাবৃন্দ, আমির-উমারা, ধনাঢ্য ও অভিজাত শ্রেণি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা লাঘব করেছেন, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের জন্য তারা যেন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করেছেন। এসব বিষয় প্রমাণ করে যে, এই সভ্যতা জ্ঞানী-গুণীদের কতটা আগলে রেখেছে, কতটা যত্ন নিয়েছে। এটা—কোনো সন্দেহ নেই যে—ইউরোপে আমরা যা দেখেছি তার বিপরীত। সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের রচনাবলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্বকারী সংস্থাগুলো জাতিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রসহ গির্জার কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইজাযত

ইজাযত বলতে বোঝায় ফাতওয়া বা শিক্ষকতার অনুমতি দান।[২৭০] মুহাদ্দিসগণ ও অন্যদের কাছে ইজাযতের সংজ্ঞা হলো, হাদিস বা কিতাব বর্ণনার অনুমতি প্রদান।[২৭১]

আলেমগণ বেশ কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন। এসব মানদণ্ড অতিক্রম করেই একজন তালিবুল ইলম বা শিক্ষার্থী শিক্ষার এই স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারত। এই স্তরে এসে সে পাঠদান বা ফাতওয়া প্রদানের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যেত। এ কারণে 'ইজাযত' ছিল প্রধান ও চূড়ান্ত মানদণ্ড, যেখানে শিক্ষক তার শিষ্যকে এই স্বীকৃতি দিতেন যে সে ভিন্ন মজলিসে বসে পাঠদানে সক্ষম হয়েছে এবং সে বিভিন্ন জ্ঞানের নির্দিষ্ট শাখায় পারদর্শী হয়েছে।

ইজাযতের বিষয়টি অন্যদের কাছে জ্ঞান (কিতাব, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি) পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হতো। শাইখ তার পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বা কিছু অংশ তার ছাত্রকে বা কোনো আলেমকে দিতেন এই মর্মে যে এই পাণ্ডুলিপি তিনি নিজ হাতেই লিখেছেন। তা ছাড়া তিনি যে শাইখ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করেছেন তার নামও তাদের জানিয়ে দিতেন। তারপর তাদেরকে তা অন্যদের প্রদান করার অনুমতি দিতেন। এভাবেই ইজাযতদানের বিষয়টি সম্পন্ন হতো।[২৭২]

ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই ইজাযতদানের বিষয়টি সুপরিচিত। শুরুর দিকে ইজাযতদানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহের মধ্যে যাতে মিশ্রণ না ঘটে এবং তা

---

২৭০. *হাশিয়া ইবনে আবিদিন*, খ. ১, পৃ. ১৪।

২৭১. মিশরীয় ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, *আল-মাউসুআতুল ইসলামিয়্যাতুল আম্মাহ*, পৃ. ৪৩।

২৭২. কারাম হিলমি ফারহাত, *আত-তুরাসুল ইলমি লিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিশ শাম ওয়াল ইরাক খিলালাল কারনির রাবিয়িল হিজরি*, পৃ. ৬৯।

থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাই হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ ইজাযতদানের পদ্ধতি স্থির করেন। এটা ছিল শিক্ষক ও শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা নিরূপণের একটি প্রকার।

বাস্তবিক পক্ষে 'ইজাযত' হাজার বছরের মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি সংযোজন। বস্তুত এটি ছিল বর্তমান সময়ে ছাত্ররা যে সত্যায়িত সনদ লাভ করে তারই নামান্তর।

এ কারণেই আমরা দেখি যে ইসলামের প্রত্যেক যুগে রাষ্ট্রের দৃশ্যমান পদে কোনো আলেমের নিযুক্তির জন্য 'ইজাযত' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

আহলে সুন্নাহর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার পুত্র আবদুল্লাহকে ইজাযত দিয়েছেন, এই মর্মে যে, তিনি তার থেকে মুসনাদের ত্রিশ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাস্বরূপ এক লাখ বিশ হাজার হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭৩] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব আয-যুহরি রহ. ইমাম ইবনে জুরাইজকে[২৭৪] ইজাযত দিয়েছেন।[২৭৫]

ইসলামি সভ্যতার নারীদের অন্যতম অধিকার ছিল জ্ঞান অর্জন করা এবং শিক্ষাদান করা। এই ক্ষেত্রে তারা ছিল পুরুষের মতোই, সমান সমান। কোনো নারী আলেমদের থেকে ইজাযত হাসিল করা ছাড়া শিক্ষাদান বা পাঠদানের জন্য বসতে পারতেন না। এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যে, ইমাম যাহাবির[২৭৬] দুধমা ও ফুফু সিত্তুল আহলি বিনতে উসমান ইবনে কাইমায যাদের থেকে ইজাযত গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন ইবনে আবুল ইয়ুস্‌র, জামালুদ্দিন ইবনে মালিক, যুহাইর ইবনে উমর আয-যারয়ি

---

২৭৩. ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ, ১১, পৃ. ১০৯।

২৭৪. ইবনে জুরাইজ : আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযিয ইবনে জুরাইজ আর-রুমি (৭০-১৫০ হি.)। বনি উমাইয়ার আযাদকৃত দাস। ছিলেন অন্যতম জ্ঞানভান্ডার। হাদিসশাস্ত্রে তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৬০; সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১১৯-১২০।

২৭৫. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৩২।

২৭৬. যাহাবি : আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান ইবনে কাইমায (৬৭৩-৭৪৮ হি./১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, ঐতিহাসিক, আল্লামা, টীকা-ভাষ্যকার। তুর্কমান বংশোদ্ভূত। দামেশকে জন্ম ও মৃত্যু। তার রচনাবলি বিশাল ও ব্যাপক, প্রায় একশ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৬০।

এবং আরও অনেক। তিনি উমর ইবনুল কাওয়াস প্রমুখ থেকে হাদিস শুনেছেন। ইমাম যাহাবি তার এই ফুফু থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২৭৭]

ইজাযতের ব্যাপারটি কেবল কুরআন ও হাদিস এবং শরয়ি জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনঘনিষ্ঠ সকল জ্ঞানই এর আওতাধীন ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের পঠনপাঠনের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হতো। হিজরি চতুর্থ শতকে প্রধান চিকিৎসাবিদ সিনান ইবনে সাবিত[২৭৮] যারা চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের ইজাযত প্রদান করেন। তবে তাদের প্রত্যেককে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, যে ব্যক্তি যে শাখায় কাজ করতে চায় সে ওই শাখায় বিশেষজ্ঞ কি না তা যাচাই করা হয়।[২৭৯] একইভাবে দামেশকে আল-মাদরাসাতুল দাখওয়ারিয়্যাহর প্রতিষ্ঠাতা মুহাযযিবুদ্দিন আদ-দাখওয়ার ইজাযত দেন আল্লামা আলাউদ্দিন ইবনে নাফিসকে। তিনি এই ইজাযত লাভের পর তার যুগের সবচেয়ে বড় হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পান। এটি হলো দামেশকের আন-নুরি হাসপাতাল।[২৮০] চিকিৎসাবিদ আল-রাযি তার *'আল-হাবি'* গ্রন্থে বলেছেন, চিকিৎসার জন্য অনুমোদনপ্রার্থীর প্রথম পরীক্ষা হবে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা (anatomy) বিষয়ে। সে যদি এটা না জানে বা অনুত্তীর্ণ হয় তাহলে তার বিদ্যা রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।[২৮১]

বড় আলেমদের থেকে ইজাযত ছিল ছাত্রদের জন্য গর্বের বিষয়। তারা তা জীবনভর মানুষের কাছে উল্লেখ করতেন। আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম সিরাজুদ্দিন ইবনে মুলকিন থেকে ফিকহে শাফেয়ির ইজাযত নিয়েছিলেন। তিনি তার কোষমূলক গ্রন্থ صبح الأعشى في كتابة الإنشا *(সুবহুল আ'শা ফি কিতাবাতিল ইনশা)*-য় সেই 'ইজাযতবাণী' উল্লেখ করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি এই ইজাযত

---

২৭৭. যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, সম্পাদনার ভূমিকা, খ. ১, পৃ. ১৭।

২৭৮. সিনান ইবনে সাবিত : আবু সাইদ সিনান ইবনে সাবিত ইবনে কুররাহ আল-হাররানি (মৃ. ৩৩১ হি./৯৪৩ খ্রি.)। চিকিৎসাবিদ, বিজ্ঞানী। আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদিরের কাছে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। তিনি তাকে চিকিৎসকদের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৫, পৃ. ১৫২।

২৭৯. ইবনে আবি উসাইবিআ, *তাবাকাতুল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২০৪।

২৮০. যাহাবি, *তারিখুল ইসলাম*, খ. ৫১, পৃ. ৩১২।

২৮১. আল-রাযি, *আল-হাবি ফিত-তিব্বি*, খ. ৭, পৃ. ৪২৬।

কতটা ভালোবাসেন, কতটা গর্ববোধ করেন এটা নিয়ে। তার ইজাযতবাণীর উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ :

আল্লাহ তাআলা আমাদের সাইয়িদ, আমাদের শাইখ, আমাদের বরকত, আল্লাহর মুখাপেক্ষী বান্দা, আশ-শাইখ আল-ইমাম আল-আল্লামা, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ, যুগশ্রেষ্ঠ ও অনন্য, জ্ঞানীদের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ, ফকিহদের ও সৎ ব্যক্তিদের অবলম্বন সিরাজুদ্দিন মুফতিউল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন আবু হাফস উমরকে কল্যাণ করুন। তিনি অমুককে (যার নাম আল-কালকাশান্দি)—আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত রাখুন—অনুমতি দিয়েছেন ও অনুমোদন করেছেন এই মর্মে যে, তিনি আল-ইমাম আল-মুজতাহিদ আল-আলিমুর রাব্বানি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আল-মাতলাবি আশ-শাফিয়ির মাযহাবের পাঠদান করতে পারবেন—আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে তার প্রত্যাবর্তনস্থল ও চিরস্থায়ী আবাস বানিয়ে দিন—এবং শাফিয়ি মাযহাব বিষয়ে লিখিত সব গ্রন্থ পাঠ করতে পারবেন এবং তার ছাত্রদের পড়াতে পারবেন; তিনি যতটা চান, যেখানে গমন করেন ও অবস্থান করেন সেখানেই, তার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই এবং যখন যেখানে খুশি সেখানেই তা করতে পারবেন; কেউ তার কাছে ফাতওয়া চাইলে তিনি লিখিতভাবে ও মৌখিকভাবে ফাতওয়া দিতে পারবেন, তার পবিত্র মাযহাবের দাবি অনুযায়ী তার জ্ঞান ও দ্বীনদারি, আমানতদারি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, উপযুক্ততা ও পর্যাপ্ত চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে তিনি তা করবেন...।[২৮২]

উপরিউক্ত ঘটনাবলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে গোটা মানবসভ্যতার অভিযাত্রায় 'ইজাযত' এক অনন্য ও অগ্রগামী ইসলামি সংযোজন। ইউরোপের বড় বড় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়েরও দশ শতাব্দী পূর্বে ইজাযতের বিষয়টি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নতুন বিষয় সংযোজনের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতা কতটা অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ তা সহজেই প্রমাণিত হয়। এই ইজাযত পদ্ধতি আজ গোটা বিশ্বের সব জাতিই অনুসরণ করছে।

২৮২. কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ১৪, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান

বিজ্ঞানের এ সকল শাখার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি নাম ব্যবহৃত হয়। যেমন মহাজাগতিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইত্যাদি। আমি এগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে 'জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞান' নামটাকে প্রাধান্য দিয়েছি। অর্থাৎ, এগুলো শরয়ি জ্ঞান নয়। কারণ, আমি মনে করি যে এসব জ্ঞান বা বিজ্ঞানের ফলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে। আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, এগুলো হলো সেসব উপকারী জ্ঞান যা মানুষ তাদের চিন্তা, বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছে। এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে, পৃথিবীতে সম্ভব সবকিছুকে আয়ত্ত করেছে, প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের বহু কিছু আবিষ্কার করেছে। এসব জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৌশলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি। পৃথিবীতে যত প্রাণী ও বস্তু ছড়িয়ে আছে তাদের সবকিছু নিয়ে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা রয়েছে। মানবজীবনকে সুন্দর ও সুষম করতে মানুষের এসব জ্ঞানের প্রয়োজন।

ইসলামের ছায়াতলে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এবং তা উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমনকি মুসলিমরাই এসব বিজ্ঞানে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছেন। মুসলিমরা যেমন পৃথিবীর নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন, তেমনই জ্ঞানবিজ্ঞানের নেতৃত্বও অর্জন করেছিলেন। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের জন্য সবসময়ই উন্মুক্ত ছিল, তারা এসব

জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের দেশ ছেড়ে প্রাচ্যে এসেছে। ইউরোপের রাজাবাদশা ও আমির-উমারা বরাবরই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য মুসলিম দেশগুলোতে এসেছেন। ফরাসি প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোঁ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিমরা যদি ফ্রান্সের ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করত তাহলে প্যারিসও মুসলিম স্পেনের কর্ডোভার মতো সমৃদ্ধিশালী হতো![২৮৩]

ইসলামের জ্ঞান-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, সভ্যতায় ইউরোপ মূলত আরব মুসলিমদের একটি শহর।[২৮৪]

এই অধ্যায়ে জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাদের অবদানগুলোর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আমরা তুলে ধরব। আমরা দেখাব যে তারা যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তা মানবসভ্যতার অভিযাত্রায় এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই অধ্যায় নিম্নবর্ণিত দুটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

---

২৮৩. গুস্তাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon), *The World of Islamic Civilization* (1974), আরবি অনুবাদ, আদিল যুআইতার, *হাদারাতুল আরব*, পৃ. ১৩, ৩১৭।

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখাগুলোর বিকাশ

সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের পূর্বে বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানের এসব শাখায় পূর্বতন সভ্যতাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি রয়েছে। তাদের কীর্তির ওপরই নির্ভর করে মুসলিমরা এগিয়েছেন। তারা গর্বের সঙ্গেই এ কথা স্বীকার করেন ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাদের জাগরণের সূচনা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ববর্তী সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে তারা পূর্ববর্তী মানুষদের থেকে কেবল আহরণ করে ক্ষান্ত থাকেননি, তারা এসব জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে অসংখ্য নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন। এটাই তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মৌলিক নীতি। বিজ্ঞানের প্রচলিত শাখায় মুসলিমগণ যেসব কীর্তি সাধন করেছেন তা স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল ইতিহাস হয়ে রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা এসব ব্যাপারে আলোকপাত করতে যাচ্ছি।

প্রথম অনুচ্ছেদ : চিকিৎসাবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : পদার্থবিজ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আলোকবিজ্ঞান

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জ্যামিতি

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ভূগোলবিদ্যা

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রথম অনুচ্ছেদ

১. চিকিৎসাবিজ্ঞান

মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের যে শাখাটিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞান। এটিকে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিস্তৃত শাখা বিবেচনা করা হয় যেখানে মুসলিমরা তাদের সভ্যতার দীর্ঘ কালপর্বে শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের অবদানগুলো সব দিক থেকেই ছিল অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারণ ও নবদিগন্তের পরিচায়ক। যে-কেউ মুসলিমদের এসব অবদান জানবেন তার মনে হবে মুসলিম সভ্যতার পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্বই ছিল না!

রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাতেই তাদের গবেষণা ও উদ্ভাবন সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা এটিকে একটি মৌলিক পরীক্ষামূলক ভিত্তি দান করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষেধমূলক ও নিরাময়মূলক যত চর্চা আছে তার সব ক্ষেত্রে মুসলিমদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল অবদান রয়েছে। তারা ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন, চিকিৎসায় মানবিকতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামি অবদানের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব উজ্জ্বল হয়ে আছে এখানে যে, তা একদল বিস্ময়কর চিকিৎসা-প্রতিভাকে বের করে আনতে পেরেছিল। চিকিৎসাবিদ্যার গতিপথকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে মহান আল্লাহর পরে এ সকল প্রতিভা সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত চিকিৎসক প্রজন্মরা এই পথ ধরে সামনে এগিয়ে চলেছে।

পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব প্রকাশমান হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসাশিল্পের সূচনা ঘটেছে। মানুষ–তাদের প্রতিপালকের বাণী অনুসারে–তাদের বুদ্ধি, মেধা ও মানবিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিকিৎসার নানা পথ ও প্রকার আবিষ্কার করেছে। চিকিৎসার এসব প্রকার 'আদিম চিকিৎসা-পদ্ধতি' (Primitive Medicine) নামে পরিচিত।

মানবসভ্যতার স্তর বা পর্যায়ের সঙ্গে এই পদ্ধতি ছিল গতিশীল। এ কারণে আমরা দেখি যে ইবনে খালদুন উল্লেখ করেছেন, ...যাযাবরদের যে চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ভিত্তি ছিল স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতা। গোত্রের প্রবীণ লোকদের থেকে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির চর্চা করত। কখনো চিকিৎসার কিছু বিষয় সঠিকও ছিল, তবে তা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ছিল না।[২৮৫]

জাহিলি যুগে আরবদেরও এ ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল। পরপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলেন। উসামা ইবনে শারিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ الْهَرَمُ»

> তোমরা রোগ-ব্যাধিতে ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো; কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন, কেবল বার্ধক্য ব্যতীত।[২৮৬] (জরা বা বার্ধক্য দূর করার কোনো ওষুধ নেই।)

জানা গেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধু, খেজুর, ঘাস-লতা-পাতা ও প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের চিকিৎসা তিব্বে নববি বা নববি চিকিৎসা-পদ্ধতি নামে পরিচিত।

তবে মুসলিমরা নববি চিকিৎসা-পদ্ধতির সীমারেখায় আবদ্ধ থাকেননি। বরং শুরুতেই তারা অনুধাবন করেছেন যে জাগতিক জ্ঞানসমূহ—চিকিৎসাবিদ্যাও তার একটি—নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। অন্যান্য জাতির কাছে এসব জ্ঞানের কী রয়েছে সেটা জানা

---

২৮৫. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৬৫০।

২৮৬. *সুনানে আবু দাউদ*, কিতাব : চিকিৎসা, বাব : পুরুষের চিকিৎসা গ্রহণ, হাদিস নং ৩৮৫৫; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২০৩৮; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস। *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৩৪৩৬; *আহমাদ*, হাদিস নং ১৮৪৭৭। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত এবং তাদের থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জরুরি। কারণ ইসলাম সবসময় যা-কিছু কল্যাণকর ও উপকারী তা সমৃদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং জ্ঞান যেখানেই থাকুক তা অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমরা দেখি যে, মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নতুন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুলুক সন্ধান করেছেন। মুসলিম খলিফাগণও রোমান চিকিৎসকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের থেকে মুসলিম চিকিৎসকেরা জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেকোনো গ্রন্থ তাদের হাতে পড়েছে, তারা তা অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটাকে উমাইয়া খিলাফতকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একটি দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তা এই যে, তারাই প্রথম চিকিৎসাবিদ্যায় বা চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন চক্ষু-চিকিৎসক (ophthalmologist), শল্যচিকিৎসক (surgeon), রক্তমোক্ষণ-চিকিৎসক (phlebotomist), স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ (gynecologist) ইত্যাদি। ওই যুগের মহাচিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন আবু বকর আল-রাযি, তাকে অবশ্য ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীও গণ্য করা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার এত বেশি অবদান রয়েছে যে এই গ্রন্থ তা বর্ণনা করতে অক্ষম!

আব্বাসি খিলাফতকাল থাকতে থাকতেই মুসলিমরা চিকিৎসাবিদ্যার প্রতিটি শাখায় সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। পূর্ববর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক ভুলত্রুটি সংশোধন করেন। তারা কেবল নকল ও অনুবাদে আবদ্ধ থাকেননি, বরং গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা অব্যাহত রাখেন এবং পূর্ববর্তীদের ভ্রান্তিসমূহের সংশোধন করেন।

চক্ষুবিজ্ঞান মুসলিমদের হাতে বিকাশ ও উন্নতি লাভ করে। এই ক্ষেত্রে কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাদের পূর্ববর্তী গ্রিকরা নয়, তাদের সামসময়িক লাতিনরা নয়, তাদের কয়েক শতাব্দী পরে যারা এসেছে তারাও নয়, কেউই তাদের স্থানে পৌছতে পারেনি। কয়েক শতাব্দীব্যাপী চক্ষুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের রচিত গ্রন্থাবলিই ছিল একমাত্র দলিল। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক লেখকই চক্ষু-চিকিৎসাকে আরবীয় চিকিৎসা বলে গণ্য করেছেন। আলি ইবনে ঈসা

আল-কাহহাল[২৮৭] গোটা মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক ছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তার রচিত *'তাযকিরাতুল কাহহালিন'* (تذكرة الكحالين) চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।[২৮৮]

আমরা যখন আল-রাযি ও ইবনে ঈসার সমৃদ্ধ রচনাবলি দেখি, আমরা নিজেদেরকে আরও একজন মহাচিকিৎসাবিজ্ঞানীর সামনে আবিষ্কার করি। তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসকদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি হলেন আবুল কাসিম আয-যাহরাবি (মৃ. ৪০৩ হি.)। তিনি শল্যচিকিৎসার প্রাথমিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সক্ষম হন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কালপেল (scalpel)[২৮৯] ও শল্যকাঁচি (Surgical scissors)। তা ছাড়া তিনি অস্ত্রোপচারের মূলনীতি ও কায়দা-কৌশল প্রস্তুত করেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো রক্তক্ষরণ বন্ধে শিরা বেঁধে রাখা। তিনি অস্ত্রোপচারের সুতাও আবিষ্কার করেন। রক্তের ঘনীভবন ঘটিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কারেও তিনি সক্ষম হন।

আবুল কাসিম আয-যাহরাবিই প্রথম শরীরের অভ্যন্তরদর্শন-বিজ্ঞানের (surgical endoscope) প্রবর্তন করেন। তিনি সিরিঞ্জ আবিষ্কার করেন এবং মূত্রধানী (surgical urinals) ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম সত্যিকার অর্থে পিত্তথলীর পাথর চূর্ণ করতে সক্ষম হন। কাজটি তিনি এমন এক যন্ত্রের সাহায্যে করেন যা বর্তমান যুগের দর্পণযন্ত্রের (speculum) সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। তিনিই প্রথম যোনিপথের অভ্যন্তরদর্শনযন্ত্র (vaginal speculum/vaginoscope) আবিষ্কার করেন এবং তা সফলভাবে ব্যবহার করেন। তার রচিত গ্রন্থ التصريف لمن عجز عن التأليف ইউরোপে যারা শল্যচিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন তাদের কাছে একটি পরিপূর্ণ চিকিৎসাবিশ্বকোষ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটা তারা নিজেরাই স্বীকার

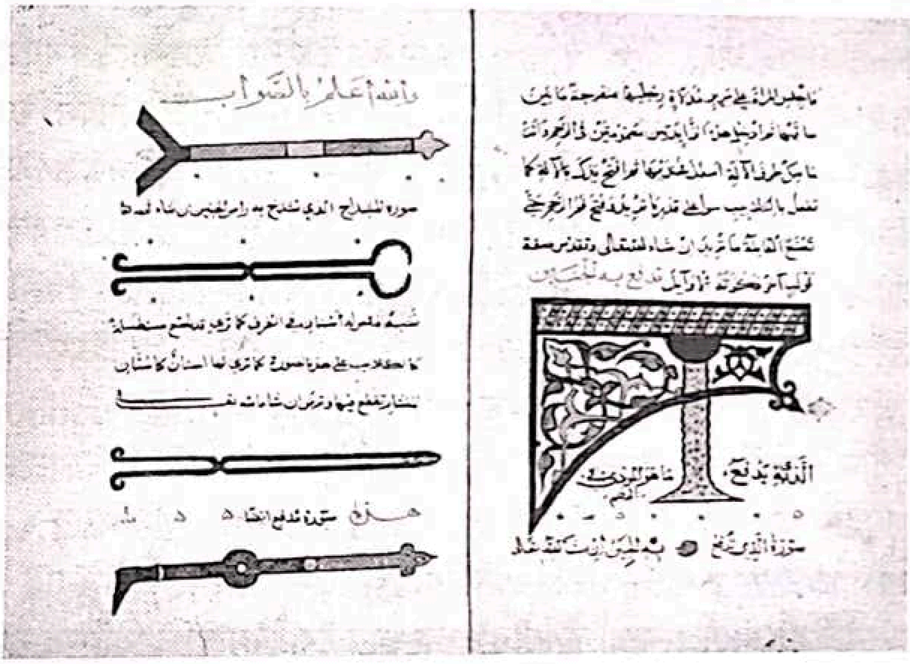
---

২৮৭. আলি ইবনে ঈসা আল-কাহহাল : আলি ইবনে ঈসা ইবনে আলি আল-কাহহাল (৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.) ছিলেন চক্ষুরোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা চক্ষুচিকিৎসাকে 'সানাআতুল কাহল' নামে আখ্যায়িত করতেন। *'তাযকিরাতুল কাহহালিন'* গ্রন্থটি তাকে সমধিক খ্যাতি এনে দেয়। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল-আনবা*, খ. ২, পৃ. ২৬৩; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ৩১৮।

২৮৮. ইবনে আবি উসাইবিআ, *তাবাকাতুল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২৬৩।

২৮৯. শল্যচিকিৎসকের ছুরিবিশেষ।

করেছেন। ইতালীয় মনীষী Gerard of Cremona[২৯০] আয-যাহরাবির এই গ্রন্থ *ALTASRIF* নামে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছেন।



চিত্র নং-৭
'আত-তাসরিফ' গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

আয-যাহরাবি এই গ্রন্থের যে অংশে শল্যচিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কথা বলেছেন তা মূলত পূর্ববর্তীদের রচনাবলির প্রতিনিধিত্ব করে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত শল্যচিকিৎসাবিদ্যায় এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ দলিল। অর্থাৎ, গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পর থেকে পাঁচ শতাব্দীব্যাপী তার প্রভাব বজায় রেখেছিল। এই গ্রন্থে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির সচিত্র ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। দুইশরও বেশি যন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা রয়েছে! আয-যাহরাবির উত্তরসূরি পশ্চিমা শল্যচিকিৎসকেরা এসব বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ষোড়শ শতকে ইউরোপে যারা শল্যচিকিৎসাবিদ্যার সংশোধন করেছিলেন তাদের কাছে অস্ত্রোপচারের এসব যন্ত্রপাতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিখ্যাত জার্মান শারীরবিজ্ঞানী আলব্রেখট ভন হেলার (Albrecht von Haller) যা বলেছেন তা

---

২৯০. Gerard of Cremona (১১১৪-১১৮৭ খ্রি.) ছিলেন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। তিনি উত্তর ইতালির ক্রেমোনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আন্দালুসের তালিতালায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তিনি আরবি থেকে লাতিন ভাষায় মোট ৮৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

প্রণিধানযোগ্য, চতুর্দশ শতাব্দীর পর ইউরোপে যত শল্যচিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সবাই আয-যাহরাবির এই আলোচনা থেকে আহরণ করেছেন এবং পরিতৃপ্ত হয়েছেন।[২৯১]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ময়দানে আরও অনেক উজ্জ্বল ইসলামি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন ইবনে সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.)। তিনি যা-কিছু আবিষ্কার করেছেন তাতেই মানবতার জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বড় বড় আবিষ্কারের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি এমন কিছু রোগ-ব্যাধির সন্ধান পেয়েছিলেন আজও যেগুলোর সংক্রমণ ঘটছে। তিনি প্রথমবারের মতো বড়শি-কৃমির (Ancylostoma duodenale) সন্ধান পান এবং এটির নাম দেন গোলাকার পোকা। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী অ্যাঞ্জেলো দুবিনি (Angelo Dubini) থেকে নয়শ বছর এগিয়ে আছেন। ইবনে সিনাই প্রথম মেনিনজাইটিস রোগের কথা জানান এবং এর বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিত করেন। তিনিই প্রথম মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্ট পক্ষাঘাত এবং বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট পক্ষাঘাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। অতিরিক্ত রক্তচাপের ফলে সৃষ্ট স্ট্রোকের লক্ষণও তিনি বর্ণনা করেন। এই ক্ষেত্রে গ্রিক চিকিৎসা-মহারথীরা যা স্থির করে নিয়েছিলেন, ইবনে সিনার বক্তব্য তার বিপরীত। শুধু তাই নয়, ইবনে সিনাই প্রথম পাকস্থলীর প্রদাহ (gastric or intestinal pain) ও কিডনির প্রদাহের (Renal colic) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন।[২৯২]

ইবনে সিনাই প্রথম ব্যক্তি যিনি কতিপয় সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ কীভাবে ঘটে তা আবিষ্কার করেন। যেমন গুটিবসন্ত (Smallpox) ও হাম (measles)। তিনি উল্লেখ করেন যে, এসব ব্যাধি পানি ও বাতাসে বিদ্যমান অতি ক্ষুদ্র জীবের (জীবাণুর) দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, পানিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীব রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যায় না, সেগুলো কিছু ব্যাধি সৃষ্টি করে থাকে।[২৯৩] অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর অষ্টাদশ

---

[২৯১]. গুস্তাভ লি বোঁ, *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৫৯১।

[২৯২]. আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

[২৯৩]. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রুউওয়াদু ইলমিত তিব্ব ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৯৮।

শতাব্দীতে ভন লিউয়েন হুক ও পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ইবনে সিনার বক্তব্যকেই সমর্থন ও শক্তিশালী করেন।

এ কারণেই ইবনে সিনা পরজীবী-বিজ্ঞানের (Parasitology) ভিত্তি নির্মাণকারী হিসেবে বিবেচিত হন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে পরজীবী-বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইবনে সিনা প্রাথমিক মেনিনজাইটিসকে[২৯৪] দ্বিতীয় স্তরের মেনিনজাইটিস থেকে আলাদা করে লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেন। তিনি এরূপ অন্যান্য ব্যাধিরও লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। টনসিল অপসারণের (Tonsillectomy) পদ্ধতিও তিনি বর্ণনা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি আরও যেসব বিষয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে রয়েছে লিভার ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারসহ কয়েক প্রকারের ক্যান্সার, লিম্ফনোডের[২৯৫] টিউমার ইত্যাদি।[২৯৬]

ইবনে সিনা ছিলেন অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক। তিনি নানা ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। যেমন প্রাথমিক স্তরের ক্যান্সার-আক্রান্ত টিউমার অপসারণ, গলা ও শ্বাসনালী চেরা, ফুসফুসের ক্রিস্টাল মেমব্রেন (স্ফটিক ঝিল্লি) থেকে ফোড়া অপসারণ ইত্যাদি।[২৯৭] তা ছাড়া তিনি বন্ধন-পদ্ধতি অবলম্বন করে অর্শ্বরোগের চিকিৎসা করেছেন। একইভাবে তিনি মূত্রতন্ত্রের ফিস্টুলার (urinary fistula) অবস্থাবলির সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। পায়ুপথের ফিস্টুলার (anal fistula) চিকিৎসাপদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেন। এই চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইবনে সিনা কিডনি-পাথরেরও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, তা অপসারণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন এবং কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা

---

২৯৪. মেনিনজাইটিস (Meningitis) বা মস্তিষ্কপর্দার প্রদাহ মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের আবরণকারী পর্দা বা মেনিনজেসের প্রদাহজনিত একটি রোগ। মেনিনজাইটিস সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা অন্য পরজীবীর সংক্রমণে হয়ে থাকে।-অনুবাদক

২৯৫. লিম্ফনোড একটি ডিম্বাশয় বা কিডনি আকৃতির অঙ্গ। এটি লসিকাতন্ত্রের এবং অভিযোজিত রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার একটি অঙ্গ। লিম্ফনোডগুলো শরীরজুড়ে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত থাকে এবং লসিকানালীর মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে সংবহনতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে। এটি বি এবং টি লিম্ফোসাইটে বেশি থাকে এবং অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকায়ও থাকে। লিম্ফনোডগুলো বাইরের কণা এবং ক্যান্সারের কোষগুলোর জন্য ফিল্টার হিসাবে কাজ করে এবং তা উইকিনিয়া রোগপ্রতিরোধক ব্যবস্থাটির সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

২৯৬. আমের আন-নাজ্জার, *তারিখুত তিব ফিদ-দাওলাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৩৩; ফাওযি তাওকান, *আল-উলুম ইনদাল আরাব*, পৃ. ১৭।

২৯৭. মুহাম্মাদ আল-হাজ কাসিম, *আত-তিব্বু ইনদাল আরব ওয়াল মুসলিমিন*, পৃ. ১৪৮।

জরুরি তাও বলে দেন। একইভাবে তিনি মূত্রনিষ্কাশনযন্ত্রের ব্যবহারপদ্ধতি ও কী কী অবস্থায় এটির ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[২৯৮]

ইবনে সিনা যৌনরোগবিদ্যার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। কতিপয় স্ত্রীরোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন যোনিপথের প্রতিবন্ধকতা (vaginal obstruction), গর্ভপাত, জরায়ুর ফাইব্রয়েড বা টিউমার (uterine fibroids) ইত্যাদি। নারীদের আক্রান্ত করতে পারে এমন কিছু রোগের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। যেমন রক্তস্রাব, জরায়ুতে রক্তধারণ (Hematometra)[২৯৯] এবং এটির কার্যকারণ হিসেবে তিনি টিউমার ও তীব্র জ্বরের[৩০০] কথা উল্লেখ করেন। তা ছাড়া তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, রোধক প্রসব[৩০১] অথবা ভ্রূণের মৃত্যুর কারণে জরায়ুর বীজদূষণ (uterus sepsis) ঘটতে পারে। ইবনে সিনার আগে এ বিষয়ে

---

২৯৮. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ৩, পৃ. ১৬৫।

২৯৯. Blood retention in the uterus.

৩০০. Acute fevers.

৩০১. রোধক প্রসব (Obstructed labour/labour dystocia) : রোধক প্রসব বলতে সেই পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় যখন নবজাতক জরায়ুর স্বাভাবিক সংকোচন সত্ত্বেও যোনিপথের রুদ্ধতার কারণে ভূমিষ্ঠ হতে পারে না। ফলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পাওয়ায় শিশু মারাও যেতে পারে। এর ফলে প্রসূতি বা প্রজায়িনী মায়ের সংক্রমণ, জরায়ু বিদারণ অথবা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। প্রসবজনিত ফিস্টুলার মতো দীর্ঘস্থায়ী জটিলতাও দেখা দিতে পারে। প্রসবকালীন সক্রিয় পর্যায়ের সময়সীমা ১২ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে, বিলম্বিত প্রসবের কারণে রোধক প্রসবজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রোধক প্রসবের জন্য বেশ কিছু কারণ দায়ী। অস্বাভাবিক বড় আকারের বাচ্চা অথবা বাচ্চার অস্বাভাবিক অবস্থান, ছোট শ্রোণিচক্র এবং যোনিপথে বিভিন্ন সমস্যা রোধক প্রসবের অন্যতম কারণ। প্রজায়িনী মায়ের প্রসবকালীন উন্নয়ন বা কোনো সমস্যা আছে কি না তা নির্ধারণে প্যাট্রোগ্রাফ ব্যবহার করা হয়। শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা গর্ভবতী মায়ের রোধক প্রসব হবে কি না তা নির্ধারণ করতে পারে। মাতৃগর্ভে সন্তান অস্বাভাবিকভাবে থাকলে প্রসবকালে তাকে প্রসূতি মায়ের পিউবিক হাড়ের নিচ দিয়ে সহজে বের করা যায় না। এ ধরনের পরিস্থিতিকে কাঁধ ডাইস্টোসিয়া (Shoulder dystocia) বলে। অপুষ্টি ও ভিটামিন ডি-এর অভাব ছোট শ্রোণিচক্রের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব কৈশোরেই সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়, যদি বাড়ন্ত বয়সে শ্রোণিচক্রের প্রকৃত বৃদ্ধি না ঘটে। যোনিদ্বারে সমস্যার জন্যও রোধক প্রসবের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যদি যৌন অঙ্গহানি বা টিউমারের জন্য নারীর যোনি ও পেরিনিয়াম সংকীর্ণ হয়ে যায়। ২০১৫ সালে প্রায় ৬৫ লক্ষের মতো রোধক প্রসব বা জরায়ু বিদারণের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে ২৩ হাজার নারীর মাতৃমৃত্যু ঘটেছে। ১৯৯০ সালে ২৯০০০ মাতৃমৃত্যু ঘটেছে (যার আট শতাংশ গর্ভধারণজনিত কারণে ঘটেছে)। মৃত সন্তান প্রসবের জন্য অন্যতম কারণ রোধক প্রসব। উন্নয়নশীল বিশ্বে এ ধরনের পরিস্থিতি সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

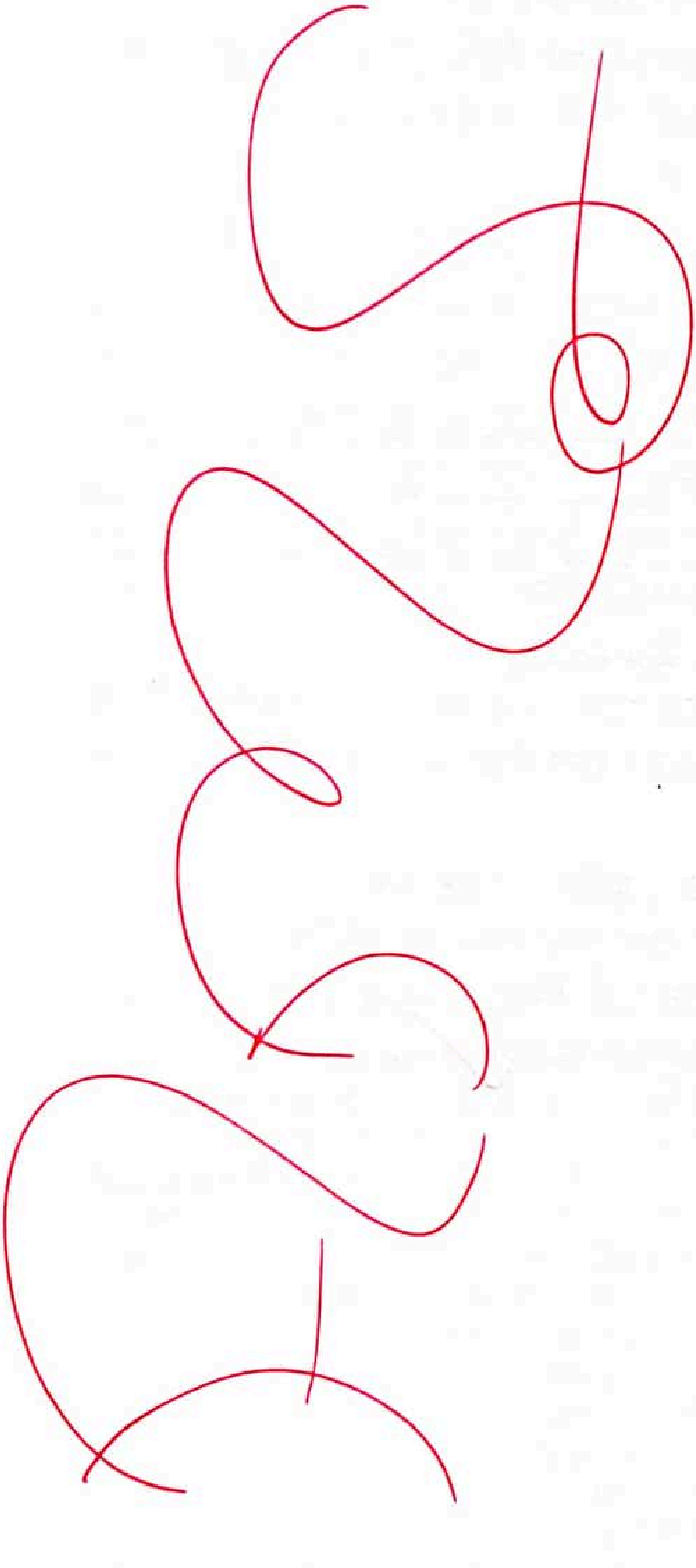
কেউ কিছু জানাতে পারেননি। ভ্রূণ অবস্থাতেই স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ধারিত হয় বলে তিনি আলোকপাত করেন এবং তিনি পুরুষকেই এর জন্য (সন্তান মেয়ে হবে নাকি ছেলে) দায়ী করেন। আধুনিক বিজ্ঞান এ বিষয়টিকেই জোরালোভাবে সাব্যস্ত করেছে।[৩০২]

উপরে যা-কিছু উল্লেখ করা হলো তা তো বটেই, এ ছাড়াও ইবনে সিনা ছিলেন দন্তচিকিৎসা বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। তিনি দন্তক্ষয়ের (dental caries) চিকিৎসার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, দাঁতের ক্ষয়রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্য হলো ক্ষয়রোধ করা এবং যাতে তা আর না বাড়ে সেই ব্যবস্থা নেওয়া। দাঁতের নষ্ট অংশটুকু ফেলে দিয়ে তা করতে হবে এবং পরিপূরক বস্তু দিয়ে জায়গাটি ভরাট করে দিতে হবে। দাঁতের চিকিৎসার মৌলিক নীতি হলো দাঁতের সুরক্ষা এবং তা করতে হলে দাঁতের ক্ষয়যুক্ত অংশটুকু উঠিয়ে ফেলে দিয়ে তা উপযুক্ত বস্তু দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। এতে দাঁতের যে অংশটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে দাঁত নতুনভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।[৩০৩]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিভাদের এগুলো কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়, বরং এমন শত শত মনীষীর দ্বারা ইসলামি সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে, শত শত পথিকৃতের কাছে গোটা মানবতা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী শিষ্যত্ব বরণ করেছে।

---

৩০২. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ২, পৃ. ৫৮৬।
৩০৩. ইবনে সিনা, *আল-কানুন*, খ. ১, পৃ. ১৯২।



দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

পদার্থবিজ্ঞান

বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখার উন্নতি ও বিকাশ ঘটে, তেমনই মুসলিমদের পদার্থবিজ্ঞানচর্চাও শুরুর দিকে গ্রিক রচনারাশির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এসব রচনায় গ্রিক বিজ্ঞানীরা কেবল দর্শনের ওপর নির্ভরশীল থেকেছেন, দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় পরীক্ষানিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা ছিল না। মুসলিম বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে এই মৌলিক বিষয়টির বিকাশ ঘটিয়েছেন। তারা পদার্থবিজ্ঞানের ময়দানে অভূতপূর্ব যোগ্যতা ও মেধা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেন তারা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। কারণ মুসলিম বিজ্ঞানীরাই পদার্থবিজ্ঞানের ভিত পরীক্ষানিরীক্ষা ও এক্সপেরিমেন্টের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা শুধু দর্শন ও চিন্তাভাবনার ওপর নির্ভরশীল হননি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা নতুন থিউরি ও সূত্র প্রদান করেছেন এবং উদ্ভাবনমূলক গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন। যেমন গতিসূত্র (laws of motion), জলসূত্র (water resources law), মহাকর্ষ নিয়ম (law of universal gravitation)। তা ছাড়া তারা খনিজ পদার্থ ও তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর (specific weight) নিয়ে গবেষণা করেছেন। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। এটিকে বর্তমান যুগে বাস্তবধর্মী আধুনিক উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কঠিন কাজ মনে করা হয়!

মুসলিম বিজ্ঞানীরা শুরুতে পূর্বসূরিদের গ্রন্থাবলির ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন : ১. অ্যারিস্টটল কর্তৃক রচিত كتاب الطبيعة[৩০৪], এই গ্রন্থে তিনি গতিসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২. আর্কিমিডিসের রচনাবলি, এসব রচনায় পানিতে ভাসমান বস্তু, কতিপয় পদার্থের নির্দিষ্ট ভর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। ৩. তিসিবিওসের গ্রন্থাবলি, এসব গ্রন্থে পাম্প ও

---

৩০৪. মূল গ্রিক থেকে আরবিতে অনুবাদ করেছেন ইসহাক ইবনে হুনাইন ।

জলঘড়ির সূত্রাবলি রয়েছে। ৪. হেরন অব আলেকজান্দ্রিয়ার[৩০৫] গ্রন্থাবলি, যেখানে উত্তোলনযন্ত্র, চাকা ও কাজের সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩০৬]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা অব্যাহতভাবে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের পদার্থবৈজ্ঞানিক থিউরি ও সূত্রাবলির উন্নতি সাধন করেন, তারা এগুলোকে চিন্তাধারার পর্যায় থেকে প্রায়োগিক পরীক্ষানিরীক্ষার স্তরে নিয়ে আসেন। মূলত পরীক্ষানিরীক্ষাই পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা শব্দবিজ্ঞান, শব্দের সৃষ্টি ও স্থানান্তর নিয়ে গবেষণা করেন। তারাই প্রথম জানতে পারেন যে শব্দ-সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পন থেকে শব্দের (শব্দতরঙ্গের) সৃষ্টি হয় এবং গোলকাকৃতিতে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গরূপে বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তারাই প্রথম শব্দকে কয়েক প্রকারে ভাগ করেন। বিভিন্ন প্রাণীর স্বর বা আওয়াজ কেন ভিন্ন হয় তারও কারণ বের করেন। গলার দীর্ঘতা, কণ্ঠনালির প্রশস্ততা ও স্বরযন্ত্রের গঠন ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে স্বর বা আওয়াজেরও ভিন্নতা ঘটে। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথম প্রতিধ্বনির কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন, তরঙ্গিত বায়ু (শব্দতরঙ্গ) উঁচু কোনো প্রতিবন্ধকের, যেমন পাহাড় বা দেয়ালের সঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উলটে গেলে (ফিরে এলে) প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। (প্রতিবন্ধক বস্তুর) নৈকট্যের কারণে প্রতিধ্বনির শ্রুতি-অনুভূতি নাও হতে পারে, শব্দের ও তার উলটে যাওয়ার সময়ের ব্যবধানের কারণেও প্রতিধ্বনির শ্রুতি-অনুভূতি হয় না।[৩০৭]

তরল পদার্থ-সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণামূলক রচনাবলি লিখেছেন। তারা খনিজ পদার্থ উত্তোলনের বেশ কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, কিছু উপাদানের ঘনত্ব নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। তাদের হিসাব ও পরিমাপ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং বর্তমান সময়ে যে পরিমাপ রয়েছে তার অনুরূপ অথবা কিছুটা ভিন্ন।[৩০৮]

---

৩০৫. হেরন আলেকজান্দ্রিয়া : একজন গ্রিক মিশরীয় গণিতবিদ, প্রকৌশলী।

৩০৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ১১৫।

৩০৭. রিহাব খিদির আকাবি, *মাওসুআতুল আবাকিরাতুল ইসলাম*, খ. ৪, পৃ. ৫৭।

৩০৮. *আল-মওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যা*, http://www.alargam.com/general/arabsince/7.htm

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা পদার্থবিজ্ঞানে সুনাম কুড়িয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন আবু রাইহান আল-বিরুনি। তিনি আঠারো প্রকারের বহুমূল্য পাথরের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) নিরূপণ করেন। তিনি এই সূত্র প্রদান করেন যে, বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব, তা যতটুকু পানি সরিয়ে দেয় তার আয়তনের সঙ্গে সমানুপাতিক।[৩০৯] আল-বিরুনি সংযোগযুক্ত পাত্রের (Communicating vessels) সূত্র থেকে প্রাকৃতিক ঝরনা এবং আর্তেজীয় কূপ (Artesian aquifer) থেকে পানি-প্রবাহের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন।[৩১০]

আল-খাযিনি[৩১১] পদার্থবিজ্ঞানের ময়দানে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বিশেষ করে গতিবিদ্যা (Dynamics) ও জলস্থিতিবিদ্যায় (hydrostatics/তরল পদার্থের স্থিতিবিজ্ঞান) বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। যা তার পরবর্তী গবেষকদের হতবাক করে দিয়েছে। গতিবিদ্যার ময়দানে বর্তমান সময়েও তার থিউরিগুলো বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এসব থিউরির মধ্যে অন্যতম হলো স্লোপ (Slope/gradient)[৩১২] থিউরি ও ইমপাল্স (Impulse/physics) থিউরি। এই দুটি থিউরি গতিবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অনেক ঐতিহাসিক আল-খাযিনিকে সকল যুগের পদার্থবিজ্ঞানের গুরু বলে গণ্য করেছেন। আল-খাযিনি তার অধিকাংশ সময় স্থির তরল পদার্থ

---

৩০৯. আপেক্ষিক গুরুত্ব : আপেক্ষিক গুরুত্ব কোনো বস্তুর ঘনত্ব এবং অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ঘনত্বের অনুপাত অথবা কোনো বস্তুর ভর এবং একই আয়তনের অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ভরের অনুপাতকে বোঝায়। আপাত আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে কোনো বস্তুর ওজন এবং সমান আয়তনের অন্য একটি প্রসঙ্গ-বস্তুর ওজনের অনুপাত। তরল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রায় সবসময় প্রসঙ্গ-বস্তু হিসেবে সবচেয়ে ভারী অবস্থার পানি (৪° সে. অথবা ৩৯.২° ফা.) এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কক্ষ তাপমাত্রার বাতাস নেওয়া হয় (২০° সে. অথবা ৬৮° ফা.)। দুটি উপাদানের জন্যই তাপমাত্রা ও চাপ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।

৩১০. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৬; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৩।

৩১১. আল-খাযিনি : আবুল ফাত্‌হ আবদুর রহমান আল-খাযিন অথবা আল-খাযিনি। জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী। সেলজুক সুলতান আহমাদ সানজার (১০৮৫-১১৫৭ খ্রি.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে জ্যোতিষ্কসারণি (Ephemeris) তৈরি করেছিলেন তা গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যায় এক মহান কীর্তি। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ الزيج السنجري، رسالة الفعلات، ميزان الحكمة। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩০৫।

৩১২. স্লোপ : ভূপৃষ্ঠ বা অন্য কোনো সমতলপৃষ্ঠ বরাবর ৯০° ডিগ্রি অপেক্ষা কম কৌণিক অবস্থান বা দিক; ঢাল।-অনুবাদক।

বিষয়ে গবেষণা করে কাটিয়েছেন। তিনি তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর জানার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। কোনো কঠিন বস্তুকে তরল পদার্থে নিমজ্জিত করা হলে তা তার নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কতটুকু তরলকে সরিয়ে দেবে তা নিয়ে তিনি তার গবেষণায় আলোচনা করেছেন। আল-খাযিনির মহান শিক্ষক আবু রাইহান আল-বিরুনি কতিপয় কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, তিনিও ওই একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আল-খাযিনি আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপে নির্ভুলতার বা যথার্থতার একটি বড় পর্যায়ে পৌঁছেছেন, যা তার সামসময়িক বিজ্ঞানীদের ও তাদের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[৩১৩]

আমেরিকান পদার্থবিদ রবার্ট এন. হল বিজ্ঞানী চরিতাভিধানে আল-খাযিনি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে কঠিন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কারে আল-খাযিনির পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যে বাতাসে ও পানিতে বস্তুর ভর নিরূপণের স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটির পাঁচটি পাল্লা ছিল, যার একটি পর্যায়ক্রমিক বাহুর ওপর চলমান থাকত। হামিদ মুরানি ও আবদুল হালিম মুনতাসির উভয়ে তাদের রচিত গ্রন্থ قراءات في تاريخ العلوم عند العرب-এ বলেছেন, ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ টরিসেলি (Evangelista Torricelli)-এর বহু পূর্বেই আল-খাযিনি বায়ুর উপাদান ও ওজন নির্দেশ করেছেন। তিনি নির্দেশ করেছিলেন যে, বায়ুরও তরল পদার্থের মতো ওজন ও ঊর্ধ্বমুখী চাপ রয়েছে। বায়ুপূর্ণ স্থানে বস্তুর ভর তার প্রকৃত ভরের চেয়ে কম, প্রকৃত ভরের চেয়ে কতটুকু কম তা নির্ভর করে বায়ুর ঘনত্বের ওপর। আল-খাযিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, আর্কিমিডিসের সূত্র কেবল তরল পদার্থের ক্ষেত্রে নয়, বরং তা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধরনের গবেষণাই ব্যারোমিটার[৩১৪], শোষকল (air vacuums)[৩১৫] ও পাম্প আবিষ্কারের পথ সহজ করে দিয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞানে এসব অবদান

---

৩১৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।

৩১৪. আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আবহমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রবিশেষ; আবহমানযন্ত্র।

৩১৫. যে যন্ত্র ধূলি-ময়লা ইত্যাদি শুষে নেয়।

রাখার কারণেই আল-খাযিনি টরিসেলি, ব্লেইজ প্যাসকেল, রবার্ট বয়েল[৩১৬] ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর অগ্রগামী মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় গতিসূত্রাবলিও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব সূত্র আবিষ্কারে মুসলিম বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করছি।

গতিসূত্র

গতিসূত্রসমূহ এতটাই গুরুত্ব রাখে যে তা আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমান যুগের প্রতিটি চলমান যন্ত্র—গাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে স্পেস মিসাইল, ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল, বরং সব গতিশীল যন্ত্রের কার্যপ্রণালি গতিসূত্রের ওপর নির্ভরশীল। গতিসূত্রসমূহের ওপর ভিত্তি করেই মানুষ মহাশূন্যে অভিযান পরিচালনা করেছে এবং চাঁদের পৃষ্ঠে নামতে পেরেছে। তা ছাড়া গতিসূত্রাবলি গতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল পদার্থবিজ্ঞানের সব শাখার মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। আলোকবিজ্ঞান মানে আলোর সঞ্চরমান তরঙ্গ, স্বর বা আওয়াজ মানে প্রবহমান শব্দতরঙ্গ, বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটি হলো ইলেকট্রনের তরঙ্গ ইত্যাদি।

পশ্চিমে ও প্রাচ্যে সকল মানুষের কাছে এটাই কিংবদন্তি যে, গতিসূত্রসমূহের আবিষ্কারক হলেন ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন। তার ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা (লাতিন ভাষায় *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, ইংরেজি ভাষায় *Mathematical Principles of Natural Philosophy*) গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই এই কিংবদন্তির সূচনা হয়।

এটিই গোটা বিশ্বে সুবিদিত সত্যে পরিণত হয়। বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলিতেও এ তথ্য ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ও বাদ যায় না। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত এই কিংবদন্তিই চালু ছিল। এই সময় সামসময়িক কতিপয় মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানী বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন

---

৩১৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩৩১।

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মুস্তাফা নাজিফ, যন্ত্র-প্রকৌশলের অধ্যাপক ড. জালাল শাওকি, গণিতের অধ্যাপক ড. আলি আবদুল্লাহ দাফফা প্রমুখ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামি পাণ্ডুলিপিসমূহে যা-কিছু ছিল তা তারা পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করেন। তারা আবিষ্কার করেন যে গতিসূত্রাবলি আবিষ্কারের প্রকৃত কৃতিত্ব মুসলিম বিজ্ঞানীদেরই। এই ক্ষেত্রে নিউটনের ভূমিকা ও কৃতিত্ব এই যে, তিনি এসব নিয়মের উপাদান সংগ্রহ করেন, সেগুলোকে সূত্রাবদ্ধ করেন এবং গাণিতিক কাঠামোতে সংজ্ঞায়িত করেন।

আবেগ ও তাত্ত্বিক বক্তৃতা বাদ দিয়ে বলা যায়, গতিসূত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। তাদের পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য ও অকাট্য বক্তব্য রয়েছে যা এই সত্যকে প্রতিভাত করে। এসব পাণ্ডুলিপি তারা রচনা করেছেন নিউটনের আবির্ভাবের সাতশ বছর আগে। ওইসব অকাট্য বক্তব্যের আলোকেই আমরা উপর্যুক্ত সত্যের মীমাংসা করব।

প্রথম গতিসূত্র

পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম গতিসূত্রটি বোঝায় যে, কোনো (স্থির) বস্তুর ওপর আঘাতকারী বলের (শক্তির) গোটা পরিমাণ যদি শূন্য হয় তাহলে ওই বস্তু স্থিরই থাকবে। অর্থাৎ, কোনো ধরনের আঘাতকারী বল না থাকা অবস্থায় গতিশীল বস্তু সমবেগে (সরলরেখায়) গতিশীলই থাকবে। যেমন ঘর্ষণশক্তি (friction forces)। নিউটন গাণিতিক কাঠামোতে নিয়মটি সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকবে।[৩১৭]

এখন প্রথম গতিসূত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীদের ভূমিকা কী সেই প্রসঙ্গে আসি। মহান মনীষী ইবনে সিনা তার *আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত* গ্রন্থে বলেছেন, তোমরা অবশ্য জানো যে, বস্তুকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিলে, তার ওপর বাইরে থেকে কোনো বল (শক্তি) প্রয়োগ করা না হলে, তা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট অবস্থাতেই থাকবে। কারণ, বস্তুর প্রকৃতির মধ্যেই গতি বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ধর্ম বিদ্যমান। বস্তুর সংরোধ

৩১৭. First law : In an inertial frame of reference, an object either remains at rest or continues to move at a constant velocity, unless acted upon by a force.

(Impedance) এ কারণে নয় যে তা বস্তু, বরং এই অর্থে যে তা তার নিজের অবস্থায় অপরিবর্তনশীল থাকতে চায়।[৩১৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, প্রথম গতিসূত্র সম্পর্কে ইবনে সিনা যা বলেছেন তা আইজ্যাক নিউটন যা বলেছেন তার থেকে অনন্য, যদিও নিউটন ইবনে সিনার ছয়শ বছর পরে এসেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বস্তু স্থির অবস্থায় থাকবে অথবা সুষম গতিতে সরলরেখায় চলমান থাকবে, যতক্ষণ বাহ্যিক কোনো বল (শক্তি) এই অবস্থার পরিবর্তনে বস্তুকে বাধ্য না করবে। অর্থাৎ, ইবনে সিনাই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম গতিসূত্র আবিষ্কার করেছেন!

দ্বিতীয় গতিসূত্র

এই নিয়ম বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল ও বস্তুর গতির ওপর প্রযুক্ত বলের প্রভাবকে বোঝায়। যখনই কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা হবে তা ওই বস্তুর গতির পরিবর্তন ঘটাবে। হয় গতি বাড়াবে, না হয় কমাবে, অন্তত গতি দিক পরিবর্তন করবে। এটি ত্বরণ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় নিয়মটিকে এভাবে লেখা যেতে পারে, বল = ভর × ত্বরণ। কোনো বস্তুর ত্বরণ সেই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক ও বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর বেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে।

নিউটন গাণিতিক আকারে উপর্যুক্ত নিয়মটিকে সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, বস্তুর গতির পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্ত বল ওই বস্তুর ভর ও ত্বরণের সঙ্গে সমানুপাতিক। তাই ওই বলকে পরিমাপ করা হয় এভাবে, বল = ভরের সঙ্গে ত্বরণের গুণফল। অর্থাৎ, বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ (ক্রিয়া বা ঝোঁক) যেদিকে ঘটে ওই বস্তুর ত্বরণ বা গতিবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কী বলেছেন সে কথায় আসি। উদাহরণত, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি (৪৮০-৫৬০ হি./১০৮৭-১১৬৪ খ্রি.) কী বলেছেন তা লক্ষ করুন। তিনি তার *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* কিতাবে বলেছেন, বস্তুর গতিবেগের প্রতিটি পরিবর্তন ঘটে অবশ্যই একটি সময়খণ্ডে, তীব্রতর বল বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটায় তীব্রভাবে এবং সংকুচিত সময়ে। বল যত তীব্র হবে বস্তুর গতিও (ত্বরণও) তত তীব্র হবে

---

৩১৮. দেখুন, *আল-ইশারাত ওয়াত তানবিহাত*, সম্পাদনা, সুলাইমান দিনা, *দারুল মাআরিফ*, মিশর, পৃ. ২৮৩-২৮৪।-অনুবাদক।

এবং সময় হবে সংকুচিত। বলের তীব্রতা না কমলে ত্বরণের তীব্রতাও কমবে না (ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে)। তখন বস্তুর গতিবেগের পরিবর্তন ঘটবে তীব্র সময়হীনতায়। কারণ গতির পরিবর্তন বা ত্বরণের ক্ষেত্রে সময়ের সংকোচন যারপরনাই হতে পারে। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকার গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম 'শূন্যস্থান'। এই অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, বলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বরণও বৃদ্ধি পায়। তাই বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল যত বাড়বে গতিশীল বস্তুর ত্বরণও তত বাড়বে এবং সুনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমণের ফলে সময় সংকুচিত হয়ে পড়বে। আইজ্যাক নিউটন এই বক্তব্যকেই তার গাণিতিক কাঠামোতে সাজিয়েছেন এবং তার নাম দিয়েছেন গতির দ্বিতীয় সূত্র!

তৃতীয় গতিসূত্র

এই সূত্র বোঝায় যে, যদি দুটি কণা (বস্তু) মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া করে, তাহলে প্রথম কণাটি দ্বিতীয় কণার ওপর যে বলের দ্বারা ক্রিয়া করবে তাকে ক্রিয়া (Action Force) বলে এবং তা পরম মানের (absolute value) সমান এবং বিপরীত দিকে দ্বিতীয় কণা প্রথম কণার ওপর যে বলের দ্বারা ক্রিয়া করবে তাকে প্রতিক্রিয়া (Reaction Force) বলে। নিউটন এই নিয়মকে তার গাণিতিক কাঠামোতে সূত্রাবদ্ধ করেছেন এভাবে, সকল ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

নিউটনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা তার *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* গ্রন্থে যা বলেছেন, একটি গোলাকার রিং ধরে দুইজন প্রতিযোগী দুইপাশ থেকে টানছে, অর্থাৎ, দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে টানাটানিযুক্ত রিং রয়েছে। এখানে প্রত্যেক প্রতিযোগীর রিং টানার ক্ষেত্রে অপর প্রতিযোগীর শক্তির প্রতিরোধমূলক শক্তি রয়েছে। টানাটানিতে একজন প্রতিযোগী বিজয়ী হলে এবং রিংটিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারলে তার অর্থ এটা দাঁড়ায় না যে, রিংটি অপর প্রতিযোগীর টানশক্তি থেকে মুক্ত। বরং ওই শক্তি পরাজিতরূপে বিদ্যমান। ওই শক্তি যদি না-ই থাকত তাহলে বিজয়ী প্রতিযোগীর রিং টানার প্রয়োজনই পড়ত না।

ইমাম ফখরুদ্দিন আল-রাযির রচনাবলিতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার *আল-মাবাহিসুল মাশরিকিয়্যা ফি ইলমিল ইলাহিয়্যাতি ওয়াত তাবিইয়্যাত* গ্রন্থে বলেছেন, যে রিংটিকে দুইজন সমান শক্তিশালী

প্রতিযোগী নিজের দিকে টানে তা মধ্যবর্তী স্থানে স্থির থাকে। কোনো সন্দেহ নেই যে, রিংয়ের ওপর প্রত্যেক প্রতিযোগী অপর প্রতিযোগীর বিপরীতমুখী বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তাকে অকেজো করে দিচ্ছে।

বরং হাসান ইবনুল হাইসামেরও এই ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। তিনি তার *'আল-মানাযির'* গ্রন্থের চতুর্থ মাকালার (প্রবন্ধের) তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন, যদি গতিশীল বস্তু বাহ্যিক প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাধাগ্রস্ত হওয়ার সময়ে তার চালক-বল (Driving Force) তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা যেখান থেকে গতিশীল হয়েছিল সেদিকেই ফিরে আসবে। ফিরে আসার ক্ষেত্রে বস্তুটির ভরবেগ (Momentum) তার প্রথমবারের চালক-বল ও প্রতিবন্ধক বল অনুসারে কাজ করবে।

সুতরাং, কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা এসব উদ্ধৃতিতে যা বলেছেন তা-ই তৃতীয় গতিসূত্রের মূল ভিত্তি। নিউটন সূত্রটির এসব উপাদান আয়ত্ত করে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মহাকর্ষ সূত্র

পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব (থিউরি) অর্থাৎ গতিসূত্রসমূহ আবিষ্কারে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ও অর্জনের কথা উল্লেখ করা হলো। এগুলোর পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আরও সব চমৎকার আবিষ্কার রয়েছে, যেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব আবিষ্কার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরবর্তীকালের অন্য বিজ্ঞানীদের নামে চালু রয়েছে...। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মহাকর্ষ সূত্র। মহাকর্ষ সূত্রের গুরুত্ব এখানে নিহিত যে, এটি মহাজাগতিক বস্তুরাশি (তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ)-কে একটি বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে এবং মহাকর্ষ বলের ফলেই সেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে সংগতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলমান রয়েছে। মহাকর্ষ আবিষ্কারের ফলেই বিজ্ঞানীরা বস্তু কেন জমিনের দিকে পতিত হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ যে সূর্যের চারপাশে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান রয়েছে তাও যথার্থভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ, ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণই সূর্যকেন্দ্রিক ঘূর্ণনের কারণ।

প্রাচ্যে ও পশ্চিমে সাধারণ মানুষের কাছে এ কথা প্রচলিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এটা পড়েও থাকে যে, মহাকর্ষ

সূত্রের আবিষ্কারক হলেন আইজ্যাক নিউটন। তিনি একদিন একটি আপেল গাছের নিচে বসে ছিলেন। তখন একটি আপেল তার গায়ের ওপর পড়ল। তখনই তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন আপেলটি কেন জমিনের দিকে পড়ল, কেন অন্যদিকে পড়ল না। এভাবে তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন এবং তার ফর্মুলা প্রস্তুত করেন। (মহাকর্ষের একটি বিশেষ উদাহরণ হলো মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ।) এই সূত্রের মূলকথা এই যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং বস্তুর ভর ও দূরত্ব অনুযায়ী আকর্ষণ-বলে তারতম্য হয়ে থাকে।

কিন্তু এটাই কি সত্য? এটাই কি বাস্তবিক? বরং বিজ্ঞানের ক্রমসমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে দৃঢ়ভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নিউটনের পক্ষে তার বিখ্যাত মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না—যেমনটা গতিসূত্র তিনটির ক্ষেত্রে হয়েছে—যদি না তিনি পূর্ববর্তী মহান বিজ্ঞানীদের কাঁধে ভর করতেন এবং দীর্ঘ সময়যাত্রা তাকে সহায়তা না করত। কারণ, এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না যে, পূর্ববর্তী মানুষেরা যেমন বস্তুর উপর থেকে নিচ দিকে পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনই নিউটনও গাছ থেকে আপেলের পতন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারপর তিনি বিদ্যমান তত্ত্বগুলো কাজে লাগিয়ে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা তার *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি* গ্রন্থে এ বিষয়ে যে আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বস্তুর বাধাহীন পতনের ব্যাখ্যায় তাত্ত্বিক প্রসার চালিয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা এদিকে ইঙ্গিত করার পর বলেছেন, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের সত্যধর্মের পথপ্রদর্শনের কল্যাণে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে বিশুদ্ধ জ্ঞানগত পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাই তারা যেসব তত্ত্বের সত্যাসত্য বা শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করা যায় সেগুলোর দার্শনিক প্রমাণাদি একেবারেই গ্রহণ করেননি। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মহাজাগতিক বস্তুরাশির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কতটা যথার্থ তা নিরূপিত হবে এসব বস্তুর আচরণের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের উন্মোচন কতটা ঘটেছে তার ওপর ভিত্তি করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথমবারের মতো

অভিকর্ষের প্রভাবে বস্তুর অবাধ পতনের ব্যাখ্যার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন।[৩১৯]

আল-হামদানি তার الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء গ্রন্থে একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন। তিনি ভূমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যে জলরাশি ও বায়ু রয়েছে তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, যারা পৃথিবীর নিচে (পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে) রয়েছে তারাও পৃথিবীর উপরে (এ পৃষ্ঠে) যারা রয়েছে তাদের মতো স্থির (ছিটকে যাচ্ছে না)। পৃথিবীর নিচের পৃষ্ঠে তাদের পতন ও স্থিরতা তাদের পৃথিবীর এ পৃষ্ঠে পতন এবং স্থিরতার মতোই, পৃথিবী যেন একটি ম্যাগনেটিক পাথর, তার শক্তি যেমন তার চারপাশের লোহাকে নিজ দিকে টানছে তেমনই পৃথিবীও তার চারপাশের সবকিছুকে নিজ দিকে টানছে...।[৩২০]

এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আল-হামদানি প্রথমবারের মতো পদার্থবিজ্ঞানে মহাকর্ষসূত্রের আংশিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটা বিভব শক্তি বা পটেনশিয়াল এনার্জি (طاقة الموضع أو طاقة الكمون) নামে পরিচিত। যেমনটা ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা বলেছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর উচ্চতার ফলে বিভব শক্তির সৃষ্টি হয়।[৩২১] যদিও তিনি তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেননি

---

৩১৯. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯০।

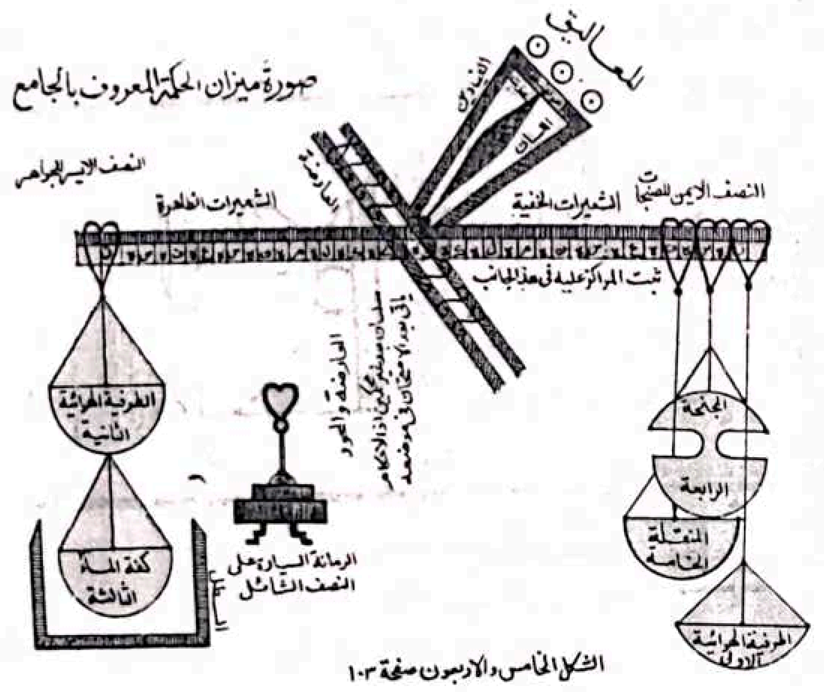
৩২০. হাসান ইবনে আহমাদ আল-হামদানি, الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা। উদ্ধৃতি, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯০।-অনুবাদক

৩২১. বিভব শক্তির পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ থেকে বস্তুর উচ্চতার ওপর নির্ভর করে। উচ্চতা যত বেশি, বিভব শক্তি তত বেশি। একইভাবে বস্তুর ভরের ওপরও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ২ কেজি ভরের বস্তুকে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে যদি ভূমি থেকে ৫ মিটার উচ্চতায় তোলা হয় তবে বস্তুটিকে ওই উচ্চতায় ওঠানোর ফলে ৯৮ জুল পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হবে। যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

সম্পাদিত কাজ=বল×সরণ=ভর×ত্বরণ×সরণ; অভিকর্ষজ ত্বরণ=৯.৮ মিটার/বর্গসেকেন্ড; ভর=২ কেজি; সরণ=৫ মিটার; সুতরাং, সম্পাদিত কাজ =২×৫×৯.৮=৯৮ জুল।

অর্থাৎ, বস্তুটিতে ৯৮ জুল পরিমাণ বিভব শক্তি জমা হবে। এখন বস্তুটিকে অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হলে এর বিভব শক্তি ভূমিস্পর্শের আগেই অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে। বিভব শক্তি গতিশক্তি, আলো, তাপ, শব্দ, তড়িৎ ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরযোগ্য। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে পানির বিভব শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। গতিশক্তির সাহায্যে টারবাইনে ঘূর্ণন গতিশক্তির সৃষ্টি করা হয় এবং তা থেকে ডায়নামোর সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

যে, বস্তুরাশি পরস্পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তারপরও আল-হামদানির বক্তব্যই নিউটনের মহাকর্ষসূত্রের সামগ্রিক মৌল ভিত্তি।



চিত্র নং-৮
'মিযানুল হিকমা'

আল-হামদানির পর এলেন আবু রাইহান আল-বিরুনি (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.) এবং তিনি আল-হামদানির বক্তব্যকেই জোরালোভাবে সমর্থন করলেন যে, পৃথিবী তার উপরে যা-কিছু রয়েছে তার সবকিছুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। আবু রাইহান আল-বিরুনি তার القانون المسعودي গ্রন্থে এসব কথা বলেছেন। আল-খাযিনি তার *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বস্তু তার নিজের শক্তিবলে অনবরত পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। একইভাবে আল-রাযিও বিশ্বনিখিলে উপস্থিত সকল বস্তুর আকর্ষণবলের বিষয়টি কাঠামোগতভাবেই চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

তারপর আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি অ্যারিস্টটল যে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিলেন তা সংশোধন করতে সক্ষম হলেন। অ্যারিস্টটল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, ভারী বস্তু হালকা বস্তুর চেয়ে দ্রুত পতিত হয়। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। যদিও পরবর্তীকালে গ্যালিলিও এই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করেছিলেন

যে, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাববলয়ে অবাধ[৩২২] পতনশীল বস্তুর ত্বরণ তার ভরের তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল নয়।[৩২৩] অর্থাৎ, যখন বস্তুর পতন যেকোনো বাহ্যিক বাধা থেকে মুক্ত থাকবে। (বাধামুক্ত অবস্থায় সব বস্তুই মাধ্যাকর্ষণের ফলে একইসঙ্গে ভূমিতে পতিত হবে।) হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা *আল-মুতাবার ফিল-হিকমা* গ্রন্থে তার নিজের ভাষায় এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে উন্মোচিত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি শূন্যস্থানে (বায়ুহীন স্থানে) বস্তুর পতন ঘটে তাহলে ভারী ও হালকা বস্তুর পতন, বড় ও ছোট বস্তুর পতন, মোচাকৃতি বস্তুর চৌকো মাথায় পতন ও প্রশস্ত মাথায় পতন একইভাবে (একই সময়ে) ঘটবে। (এগুলোর ত্বরণে কোনো পার্থক্য ঘটবে না।) (বায়ুর বা জলের) বাধাযুক্ত স্থানে এসব বস্তুর পতনে তারতম্য ঘটে, কারণ বিদ্যমান প্রতিবন্ধকের বাধা পেরিয়ে এগুলোর পতন ঘটে। যেমন পানি, বায়ু বা অন্যকিছু বাধা তৈরি করে।[৩২৪] (ভারী বস্তু যত দ্রুত বাধা পেরোতে পারে, হালকা বস্তু তা পারে না।)

অন্যদিকে, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি নিক্ষিপ্ত বস্তুর পতন নিয়ে গবেষণা করে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ, (উপর দিকে নিক্ষিপ্ত) বস্তুরাশির উর্ধ্বগমন মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত কাজ করে অথবা যে বলের দ্বারা বস্তুকে উপর দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে বিপরীতমুখী ক্রিয়া করেছে। তিনি বলছেন, ...নিক্ষিপ্ত পাথরের মধ্যে যে আকর্ষণ রয়েছে তা নিক্ষেপকারী আকর্ষণের বিপরীত আকর্ষণ, তবে তা নিক্ষেপকারীর (প্রযুক্ত) বলের দ্বারা পরাভূত। বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল দুর্বল হয়ে পড়ে বস্তুর (ভূমির প্রতি) আকর্ষণ ও পারিপার্শ্বিক বাধার কারণে...। তাই প্রযুক্ত বল শুরুতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আর্কষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী থাকে, কিন্তু তা একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ে, স্থির হয়ে যায় এবং অবশেষে তা প্রাকৃতিক আকর্ষণের বিপরীতে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক আকর্ষণ প্রযুক্ত বলের

---

৩২২. বায়ুর বাধাহীন বা বায়ুশূন্য স্থানে।

৩২৩. বস্তুর ভর বেশি হলে তা দ্রুত পড়বে এবং ভর কম হলে হালকাভাবে পড়বে এমন নয়।

৩২৪. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯১।

বিপরীতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং বস্তু এ আকর্ষণের দিকেই ফিরে আসে।[৩২৫]

ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা টীকায় বলেছেন, এখানে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করা সংগত যে, হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি 'আল-মাইল' (الميل) বা আকর্ষণ/ঝোঁকের বিষয়টিকে একটি সুপ্ত শক্তি বা নবজাতকের মায়ের কোলের দিকে ধাবিত হওয়ার অপত্যশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি। যেমনটি অ্যারিস্টটল বলেছেন। বরং এর দ্বারা তিনি বস্তুগত শক্তি বুঝিয়েছেন, যা নিক্ষিপ্ত বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ-বিরুদ্ধ উর্ধ্বগামী ত্বরণের মধ্যে ও ভূমির দিকে নিম্নগামী ত্বরণের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। হিবাতুল্লাহ ইবনে মালকা আল-বাগদাদি এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছেন তা হলো, নিক্ষিপ্ত পাথর কি তার উর্ধ্বগামী ত্বরণের সর্বোচ্চ বিন্দুতে স্থির হয়ে পড়ে, যখন সে ভূপৃষ্ঠের দিকে পড়তে শুরু করে? এই প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়, কেউ যদি মনে করে যে প্রযুক্ত বলের কারণে ঘটিত পাথরের উর্ধ্বগামী ত্বরণ এবং (স্বাভাবিক) নিম্নগামী ত্বরণের মধ্যে (মধ্যবর্তী মুহূর্তে) সামান্যতম স্থিরতা রয়েছে তাহলে সে ভুল করবে। কারণ, পাথরের ওপর প্রযুক্ত বল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পাথরের ভর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন উর্ধ্বগামী ত্বরণ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং বিপরীতমুখী (নিম্নগামী) তরণ শুরু হয়। ফলে মনে হয় যে পাথরটি স্থির ছিল।

ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা ধারাবাহিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আল-খাযিন ভূমির ওপর পতনশীল বস্তুর ত্বরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার *'মিযানুল হিকমা'* গ্রন্থে এ ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে। এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-খাযিন ভূপৃষ্ঠের ওপর পতনশীল বস্তুর দ্রুতি এবং ওই বস্তু (কোনো একক সময়ে) যে দূরত্ব অতিক্রম করছে ও দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় নিচ্ছে তার মধ্যে সঠিক সম্পর্ক কী তা জানতেন। এই সম্পর্ককে গাণিতিক কাঠামোতে ব্যক্ত করতেই সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দে গ্যালিলিওর সঙ্গে সম্পৃক্ত সমীকরণটি প্রকাশিত হয়।

এভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীরা প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে এসে মহাকর্ষ বিষয়ে মানবিক উপলব্ধির পূর্ণতার

৩২৫. আকাশের দিকে একটি ঢিল ছুড়ে এ বিষয়টি পরীক্ষা করা যায়।

পথে অংশত সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার রীতি-পদ্ধতি যে জ্ঞানের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে তা তারা প্রমাণ করেছিলেন। সত্যে উপনীত হতে তারা এ বিষয়টির ওপরও নির্ভরশীল ছিলেন। তারা চিন্তাপদ্ধতি ও বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণারীতির ক্ষেত্রে যে মহাবিপ্লব সাধন করেছিলেন তা না হলে আমাদের সময় পর্যন্তও প্রাচীন কালের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রতিষ্ঠিত থাকত। আইজ্যাক নিউটন তার সামনে এমন মহান বিজ্ঞানীদের পেয়েছিলেন যাদের কাঁধের ওপর ভর করে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং এভাবে খ্যাতি ও সম্মান কুড়িয়ে নিয়েছিলেন।[৩২৬]

শেষে কিছু যদি বলতেই হয় তবে তা এই যে, গতিসূত্রের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে এবং মহাকর্ষসূত্রের ইতিহাসও জানতে হবে। প্রাপ্য অধিকার তাদের প্রাপকদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

---

৩২৬. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৯২।

ব্যক্তি-পরিচিতি[৩২৭]

তিসিবিওস : (Ctesibius or Ktesibios or Tesibius) ২৮৫ থেকে ২২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় গ্রিক পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন। তিনি প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রকৌশল-যুগের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিসিবিওস ছিলেন একজন নাপিতের সন্তান। ধারণা করা হয় তিনিই প্রথম বাতাসের স্থিতিস্থাপকতা আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া তিনি ঘনীভূত বাতাস ব্যবহার করে বেশ কিছু যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ঘনীভূত বাতাসের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরের বিদ্যাকে Pneumatics বা বায়ুবিদ্যা বলা হয়। এজন্য অনেকে তাকে বায়ুবিদ্যার জনক বলেন। বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি ফোর্স পাম্প এবং এক ধরনের গুলতি বানিয়েছিলেন। তিসিবিওসের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ জলঘড়ির উন্নতি সাধন। জলঘড়ি তার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সবচেয়ে সাধারণ জলঘড়ি দুটি পাত্রের মাধ্যমে কাজ করে। একটি পানিপূর্ণ পাত্র আরেকটি শূন্য পাত্রের একটু উপরে রাখা হয়, পানিপূর্ণ পাত্রের নিচের দিকে একটি ছিদ্র থাকে যা দিয়ে নিচের পাত্রে পানি পড়ে। নিচের পাত্রে পানির স্তর কতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মাধ্যমে সময় গণনা করা হয়। কিন্তু এটি কোনো ধ্রুব সময় গণক ছিল না। কারণ উপরের পাত্রে পানি বেশি থাকলে চাপ বেশি হবে এবং সে কারণে পানির বেগও বেশি হবে। কিন্তু উপরের পাত্রের পানির স্তর যত কমতে থাকবে পানির বেগও তত কমতে থাকবে। এ কারণে জলঘড়ির পানিকে সময়ের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করলে বলতে হবে, সময় শুরুর দিকে বেশি দ্রুত চলে। এখান থেকেই বোধহয় 'সময় গড়িয়ে যাচ্ছে' বা 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে' বাগধারার উদ্ভব। পানির মাধ্যমে ধ্রুব সময় পরিমাপের জন্য তিসিবিওস উপরের পাত্রে পানির স্তর সর্বদা সমান রাখার কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর জলঘড়ি নির্মাণ করেন। নিচের পাত্রের গায়ে পানির স্তর

---

৩২৭. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত (উইকিপিডিয়া)।

নির্দেশক কাঁটা জুড়ে দিয়ে তিনি সময় (ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর) প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করেন।

হেরন অফ আলেকজান্দ্রিয়া : (হিরো অফ আলেকজান্দ্রিয়া, ১০-৭০ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ। প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন এবং এখানেই তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছিলেন। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া গ্রিক প্রভাবিত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানকার বিজ্ঞান কেন্দ্রটি উৎসর্গ করা হয়েছিল সংগীতের দেবীদের নামে। এই কেন্দ্রে ছিল বিরাট পাঠাগার, জাদুঘর ও সভাগৃহ। হেরন এই কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়। হেরনের প্রধান খ্যাতি বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নির্মাতা হিসেবে যা তখন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়নি এবং তার প্রায় ১৮০০ বছর পর এই ধরনের টারবাইনের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তিনি চারটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রেখে গেছেন, যার মধ্যে *মেট্রিকা*, *মেকানিক্স* ও *নিউম্যাটিক্স* সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এসব গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন সংখ্যা এবং ত্রিভুজ তল শঙ্কু ও ধরাকৃতি প্রসঙ্গে, বেগসামান্তরিক ভারকেন্দ্র, বায়ুর ঘনত্ব ও সংনমন এবং লিভার ও গিয়ার সম্পর্কে। আলোচনা করেছেন পাম্প সাইফন টারবাইন ও বিবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিষয়েও। তার এসব গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

ব্লেইজ প্যাসকেল : (Blaise Pascal 1623-1662) একজন ফরাসি গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, উদ্ভাবক ও দার্শনিক। প্রথাগত কোনো বিজ্ঞানশিক্ষা না পেলেও গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় তার অত্যন্ত মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি বায়ুর ওজন ও চাপের এবং শূন্যস্থানের অস্তিত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন। তরল পদার্থের সুস্থিতি নিয়ে অনুশীলন করে তিনি এই সূত্র রচনা করেন যে, স্থির কোনো তরলের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের চাপ প্রতিটি অভিমুখেই সমান হয়ে থাকে, যা প্যাসকেলের সূত্র নামে পরিচিত। যন্ত্রগণকসহ নানা প্রকারের যন্ত্রও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। দর্শনের আলোচনায় তিনি ব্যক্তি-প্রবণতাকে গাণিতিক ও স্বজ্ঞাত এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং একই ব্যক্তি বা আধারে এই দুইয়ের সহাবস্থান নিতান্ত বিরল বলে মত দেন।

১৬৪৬ সালে ব্লেইজ প্যাসকেল এবং তার বোন জ্যাকুইলিন ক্যাথলিক ধর্মীয় আন্দোলনে যুক্ত হন এবং সেন্ট অগাস্টিনের কথিত শিক্ষাকে ভিত্তি

করে জেসুইট-বিরোধী এক ধর্মীয় শাখা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। ১৬৫১ সালে তার পিতা মারা যান। ১৬৫৪ সালের শেষের দিকে তিনি রহস্যময় কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। তার বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে শুরু করেন জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, নিজেকে নিয়োজিত করেন দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে। এই সময় তিনি পাটিগাণিতিক ত্রিভুজের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ লেখেন। ১৬৫৮ ও ১৬৫৯ সালের মধ্যে তিনি বৃত্ত নিয়ে লেখেন এবং বিভিন্ন কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ে তার প্রয়োগ আলোচনা করেন।

প্যাসকেলের জন্ম হয়েছিল এক অত্যন্ত অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে। শৈশব থেকেই তার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল এবং তার বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল। তার কোনো কোনো গবেষণার ফল প্রায় দেড়শ বছর পরও ব্যবহারিক প্রয়োগ পেয়েছে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার অসমাপ্ত সাহিত্যকর্ম *Pensées* ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তরলের চাপের আন্তর্জাতিক একককে তার নামানুসারে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

আল-হামদানি : আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে ইয়াকুব আল-হামদানি (২৮০-৩৩৪ হি./৮৯৩-৯৪৫ খ্রি.) ছিলেন পশ্চিম আমরান/ইয়ামেনের বনু হামদান গোত্রের মানুষ। তিনি একাধারে ভূগোলবিদ, কবি, রসায়নবিদ, ব্যাকরণবিদ, ঐতিহাসিক, ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন আব্বাসি খিলাফতের শেষ সময়কার ইসলামি সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তার যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও আল-হামদানির জীবনকাহিনি সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। তিনি ব্যাকরণবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন বেশি, তা ছাড়া তিনি অনেক কবিতা লিখে গেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার ছক প্রণয়ন করেছেন এবং তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আরবের প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে জানতে অতিবাহিত করেছেন। তার জন্মের পূর্বে তার পরিবার আল-মারশিতে বসবাস করত। সেখান থেকে তারা সানআয় চলে আসে, এখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন পরিব্রাজক এবং তিনি কুফা, বাগদাদ, বসরা, ওমান ও মিশর ভ্রমণ করেন। সাত বছর বয়স থেকেই আল-হামদানি ভ্রমণের কথা বলতেন। পরে প্রথমে তিনি মক্কায় ভ্রমণ করেন এবং সেখানে ছয় বছর পড়াশোনা করে কাটান। তারপর মক্কা ত্যাগ করে সাদাহর উদ্দেশে যাত্রা করেন। এখানে তিনি

খাওলান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে আল-হামদানি সানআয় ফিরে আসেন এবং হিময়ার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ সময় তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাকে দুই বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। কারামুক্তির পর তার গোত্রের প্রতিরক্ষার জন্য তিনি রাইদাতে যান। এখানেই তিনি তার বেশিরভাগ গ্রন্থ সংকলন করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন।

তার সম্পাদিত *আরব উপদ্বীপের ভূগোল* (*সিফাতু জাযিরাতিল আরব*) হচ্ছে এই বিষয়ের ওপর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি।

অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ আলয়েস স্প্রেঙ্গার তার গবেষণাগ্রন্থ *Post-und Reiserouten des Orients* (লাইপ্‌ৎসিশ, ১৮৬৪)-এ এবং *Alte Geographie Arabiens* (বের্ন, ১৮৭৫) নামে আরেকটি গ্রন্থে আল-হামদানির পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছেন।

আল-হামদানির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে রয়েছে *'ইকলিল'* (মুকুট)। এটি হিময়ারিদের বংশবৃত্তান্ত ও তাদের রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে দশ খণ্ডে রচিত। গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ড দক্ষিণ আরবের নগরদুর্গ ও প্রাসাদসমূহের ওপর লিখিত। এটি ডি. এইচ. মুলার কর্তৃক জার্মান ভাষায় *Die Burgen und Schlösser Sudarabiens* (ভিয়েনা, ১৮৮১) নামে অনূদিত ও সম্পাদিত। আল-হামদানির রচিত অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা গুস্তাভ লেবারেশ্‌ট ফ্লুগেলের *Die grammatischen Schulen der Araber* (লাইপ্‌ৎসিশ, ১৮৬২) পৃ. ২২০-২২১-এ পাওয়া যাবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আলোকবিজ্ঞান

ইসলামি সভ্যতার পূর্বেই আলোকবিজ্ঞানের সূচনা ঘটেছিল। গ্রিক ও অন্যান্য প্রাচীন জাতি আলোকবিজ্ঞানের প্রতি বেশ গুরুত্ব প্রদান করেছিল। এই বিজ্ঞানশাখায় তাদের ভালো ভালো কীর্তি ও অবদান রয়েছে। মুসলিমরা আলোকবিজ্ঞানের চর্চার শুরুতে ওইসব অবদান ও কীর্তির ওপর নির্ভর করেছেন। আলোর প্রতিসরণ, প্রজ্জ্বলক আয়না (বার্নিং মিরর) ও অন্যান্য বিষয়ে তারা গ্রিক বিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তারা কেবল গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এই বিজ্ঞানশাখার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, নতুন নতুন অবিস্মরণীয় আবিষ্কারে একে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা আলোকবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রিক সভ্যতায় আলোকবিজ্ঞান

গ্রিক আলোকবিজ্ঞান দুটি বিপরীতধর্মী তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১. প্রবেশন তত্ত্ব (Intromission theory), অর্থাৎ (দুই চোখে) এমন কিছুর প্রবেশ যা দুই চোখে বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে বা দর্শনানুভূতির সৃষ্টি করে। ২. নিঃসরণ তত্ত্ব (Emission theory or extramission theory), অর্থাৎ দর্শনের ঘটনাটি ঘটে তখনই যখন চোখ থেকে আলো নিঃসৃত হয়ে দৃশ্যমান বস্তুর পৃষ্ঠদেশে প্রতিফলিত হয়।[৩২৮] গ্রিক সভ্যতা এই দুটি সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অ্যারিস্টটলের প্রচেষ্টাগুলো অনিবার্যভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ইউক্লিডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও তার প্রচেষ্টা অনেকটা বাস্তবিক। তবে তার তত্ত্বসমূহ ও তাত্ত্বিক বক্তব্য 'দর্শন'-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপনে ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ তাতে 'দৃষ্টিসংক্রান্ত ঘটনা' (Optical phenomena)-এর শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো গুরুত্ব

৩২৮. গণিতবিদ ইউক্লিড ও টলেমি ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা।-অনুবাদক।

পায়নি। তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, চোখ তার ও দর্শনযোগ্য বস্তুর মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যমে রশ্মি ফেলে, এই রশ্মি চোখের অভ্যন্তর থেকেই নিঃসৃত হয়। যেসব বস্তুর ওপর এই রশ্মি পড়ে তা দৃষ্টিগোচর হয় এবং যেসব বস্তুর ওপর পড়ে না তা দৃষ্টিগোচর হয় না। যেসব বস্তু বৃহৎ কোণ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোকে বড় দেখায় এবং যেসব বস্তু ক্ষুদ্র কোণ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোকে ছোট দেখায়।

অন্যদিকে টলেমি জ্যামিতিক নীতি ও ভৌতিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেন। আলোকবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষামূলক পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেন। এটি ছিল মূল্যবান নতুন ধারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ এটির ব্যবহার এমনসব সিদ্ধান্তের সমর্থনে সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলোতে বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে উপনীত হয়েছিলেন। কখনো কখনো পরীক্ষামূলক ফলাফল এসব সিদ্ধান্তকে সুরক্ষাদানের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩২৯]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান

আলোকবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা অতীতকালের এই ধারাতেই চলতে থাকে, কোনো অগ্রগতি বা উন্নতি দেখা যায় না। ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল পর্যন্ত তার অবস্থা থাকে এমনই। মুসলিম বিজ্ঞানীরা আলোকবিজ্ঞানে যে অবদান রাখেন তাতে এক বিকশিত ও অনন্য ধারার সৃষ্টি হয়। তার কারণ তারা আলোকবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকটি বিজ্ঞানশাখায় অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রপ্রকৌশল ইত্যাদি। কারণ তাদের আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে এসব বিজ্ঞানশাখার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

৩২৯. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

আবু ইউসুফ আল-কিন্দি[৩৩০]

দার্শনিক আবু ইউসুফ আল-কিন্দির আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাথমিক পর্যায়ের যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানের ময়দানে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন আল-কিন্দি তাদের অন্যতম। তিনি তার বিখ্যাত কিতাব '*ইল্মুল মানাযির*'-এ আলো-সম্পর্কিত ঘটনাবলির ওপর আলোকপাত করেছেন এবং সেগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। তিনি 'গ্রিক নির্গমন তত্ত্ব' গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি চোখের রশ্মির বিচ্ছুরণ সম্পর্কে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নতুন 'বিম্বিতকরণ পদ্ধতি' (ইমেজিং সিস্টেম)-এর মূলনীতি সূত্রবদ্ধ করেন। যা শেষ বিচারে নির্গমন-তত্ত্বেরই নামান্তর। কিন্তু তার '*ইল্মুল মানাযির*' গ্রন্থটি মধ্যযুগে আরবের বিজ্ঞানজগতে তো বটেই, ইউরোপেও বেশ সাড়া ফেলেছিল।[৩৩১]

হাসান ইবনুল হাইসাম : আলোকবিজ্ঞানের পথিকৃৎ

আবু ইউসুফ আল-কিন্দির পর এলেন হাসান ইবনুল হাইসাম। আলোকবিজ্ঞান ও 'দর্শন'-এর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের জগতে ইবনুল হাইসামের অবদান ও কীর্তি এক নতুন বিজয় ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। তার কাজগুলোই ছিল মূল ভিত্তি, যার ওপর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তাদের আলোকবিজ্ঞান-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে-সকল ভিনদেশি বিজ্ঞানী ইবনুল হাইসামের তত্ত্ব ও মতবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তাদের পুরোভাগে রয়েছেন রজার বেকন ও ভিটেলো (Vitello)[৩৩২] এবং অন্য বিজ্ঞানীরা। শুধু তাই নয়, তারা তার তত্ত্ব চুরিও করেছেন এবং নিজেদের নামে চালিয়েও দিয়েছেন।

---

৩৩০. আল-কিন্দি : আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে আস-সাবাহ আল-কিন্দি (১৮৫-২৫৬ হি./৮০৫-৮৭৩ খ্রি.)। তার যুগের শ্রেষ্ঠ আরব ও ইসলামি দার্শনিক। কিন্দাহর রাজপুত্র। বসরায় বেড়ে ওঠেন, তারপর বাগদাদে চলে যান। চিকিৎসা, দর্শন, সংগীত, প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং এসব বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। দেখুন, ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা*, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৭; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩১৫।

৩৩১. ডোনাল্ড আর. হিল, প্রাগুক্ত; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৮।

৩৩২. আলোকবিজ্ঞানের ওপর ভিটেলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, *Perspectiva*। গ্রন্থটির রচনাকাল ১২৭০-১২৭৮ খ্রি.। এটি রচনা করতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে হাসান ইবনুল হাইসামের ওপর নির্ভর করেছেন।

বিশেষ করে অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ), দূরবীক্ষণযন্ত্র (টেলিস্কোপ) ও আতশি কাচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) নিয়ে তারা যেসব গবেষণা করেছেন তাতে এই ব্যাপারটি বেশি ঘটেছে।[৩৩৩]

ইবনুল হাইসাম প্রথমে আলোকবিজ্ঞান ও 'দর্শন'-এর ক্ষেত্রে ইউক্লিড ও টলেমির তত্ত্বগুলোর পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন এবং দেখান যে এসব তত্ত্বের কিছু দিক সম্পূর্ণ গলদ। এই সময়ের মধ্যেই তিনি চোখ, লেন্স ও দুই চোখের দ্বারা দর্শন বিষয়ে সূক্ষ্ম ও যথার্থ বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বাহ্যিক বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়লেই দেখতে পাই। আলোকরশ্মি যখন সাধারণভাবে ভূগোলকে পরিব্যাপ্ত বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার প্রতিসরণের পর্যায়ক্রম কীভাবে ঘটে তার বিবরণ প্রদান করেন। বিশেষ করে যখন তা স্বচ্ছ মাধ্যম যেমন বায়ু, পানি, বায়ুমণ্ডলের কণারাশি ভেদ করে (অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে) প্রবেশ করে। তখন আলোকরশ্মি সোজা না গিয়ে দিক পরিবর্তন করে। এই দিক পরিবর্তনের ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ। ইবনুল হাইসাম আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিফলিত রশ্মি যে কোণ (প্রতিফলন-কোণ) উৎপন্ন করে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি আরও জানান যে, মহাজাগতিক বস্তুরাশি সূর্যোদয়ের সময় দিগন্তে প্রকাশ পায় মূলত তা সেখানে পৌছার আগেই এবং সূর্যাস্তের সময় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে, তখন তা দিগন্তে দৃশ্যমান থাকে দিগন্ত-রেখার নিচে মিলিয়ে যাওয়ার পরও। তিনিই প্রথম ডার্করুমের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন, যা আলোকচিত্রের (ফটোগ্রাফির) মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত।[৩৩৪]

যে গ্রন্থ ইবনুল হাইসাম নামটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমর করে রেখেছে তা হলো *'কিতাবুল মানাযির' (Book of Optics)*। এই গ্রন্থ 'দর্শন'-এর প্রাথমিক তত্ত্ব হিসেবে আলোকবিজ্ঞানের ধারণা বিশ্লেষণ করে। ইউক্লিড থেকে শুরু করে, এমনকি আল-কিন্দি পর্যন্ত গাণিতিক ঐতিহ্য যে অনুমিত দৃশ্যমান (চোখ থেকে নির্গত) রশ্মির তত্ত্বকে আঁকড়ে রেখেছিল, ইবনুল হাইসামের উপর্যুক্ত তত্ত্ব ছিল তার থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। শুধু তাই নয়, ইবনুল হাইসাম 'দর্শন-প্রক্রিয়া'-র এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন

---

৩৩৩. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৩৮।
৩৩৪. প্রাগুক্ত।

মেথোডলজি (নিয়মবিষয়ক বিজ্ঞান)-এরও প্রবর্তন করেন। তার এই কাজের ফলে চোখ থেকে নির্গত রশ্মির তত্ত্ব (নিঃসরণ তত্ত্ব) অনুসারে যেসব বিষয় অবোধগম্য ছিল সেগুলোর স্পষ্টীকরণ সম্ভব হয়। যে-সকল দার্শনিকের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল 'অবলোকন'-এর সারবস্তুটা কী সেটাই ব্যাখ্যা করা এবং যারা 'অবলোকন'-এর ঘটনা কীভাবে ঘটে তা বিশ্লেষণ করতে ততটা মনোযোগ দেননি তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় অবহেলিত থেকে গিয়েছিল। ইবনুল হাইসামের নতুন মেথোডলজি প্রবর্তনের ফলে সেগুলোরও ব্যাখ্যাদান সম্ভব হয়।[৩৩৫]

ইবনুল হাইসাম কেবল আলোকবিজ্ঞান নিয়েই প্রায় চব্বিশটি বিষয় লিখেছেন। গ্রন্থাকারে, পুস্তিকাকারে ও প্রবন্ধ-আকারে এসব রচনা লিখেছেন তিনি। আমাদের জ্ঞানভান্ডার থেকে যা-কিছু হারিয়ে গেছে তার সঙ্গে ইবনুল হাইসামের এসব রচনার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। যেগুলো বেঁচে গেছে সেগুলো ইস্তাম্বুল গ্রন্থাগার, লন্ডন গ্রন্থাগার ও অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তার মহাগ্রন্থ '*আল-মানাযির*' ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার এই গ্রন্থে আলোকবিজ্ঞানের নব-উদ্ভাবিত তত্ত্বগুলো রয়েছে। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর থেকে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আলোকবিজ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে বিরাজমান ছিল।[৩৩৬]

'*আল-মানাযির*' গ্রন্থটি আলোকবিজ্ঞানের জগতে এক মহৈশ্বর্য। ইবনুল হাইসাম এই গ্রন্থে টলেমির তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা, সেগুলোর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি টলেমির আলোকবিজ্ঞান-সম্পর্কিত কতিপয় তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তিনি নতুন নতুন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তার এসব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের অস্থিমজ্জারূপে এখনো বিদ্যমান।

টলেমি দাবি করতেন যে—আমরা ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি—চোখ থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি দর্শনযোগ্য বস্তুর ওপর পতিত হওয়ার মাধ্যমে

---

৩৩৫. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০২।

৩৩৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *আল-উলুমুল বাহতাতি ফিল-হাদারাতিল আরাবিয়্যা ওয়াল-ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৫, ইবনুল হাইসামের রচনাবলি প্রসঙ্গে।

দর্শন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তার পরবর্তী বিজ্ঞানীরাও এই তত্ত্বই গ্রহণ করেছেন। ইবনুল হাইসাম এসে এই তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, দর্শন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি চোখে এসে পড়ার ফলে। বহু পরীক্ষানিরীক্ষা ও এক্সপেরিমেন্টের পর ইবনুল হাইসাম দেখান যে, আলোকরশ্মি সমজাতীয় বা সমপ্রকৃতির মাধ্যমে সরল রেখায় প্রসারিত হয়। তিনি *'আল-মানাযির'* গ্রন্থে তা প্রমাণ করে দেখান।[৩৩৭]

একটি বস্তুকে দুটি দেখার দ্বারা জোড়-দর্শন (ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন) ঘটা ব্যতিরেকেই দুই চোখের মাধ্যমে একইসঙ্গে একইসময়ে বস্তুরাশি দেখার পদ্ধতিটি কীরূপ তা গাণিতিক ও জ্যামিতিকভাবে প্রতিপাদন করেন ইবনুল হাইসাম।[৩৩৮] তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, দৃষ্টিগোচর বস্তুর দুটি প্রতিকৃতি চোখের রেটিনায় অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ইবনুল হাইসাম উপর্যুক্ত প্রতিপাদন ও এই ব্যাখ্যার দ্বারা বর্তমানে যে জিনিসটা স্টেরিওস্কোপ[৩৩৯] নামে পরিচিত তার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইবনুল হাইসামই প্রথম ব্যক্তি যিনি চোখের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তিনি চক্ষু-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে চোখের অংশগুলোর পরিচয় প্রদান করেন, সেগুলোর ব্যাখ্যা দেন এবং চিত্র অঙ্কন করে দেখান। তিনিই প্রথম চোখের বিভিন্ন অংশের নামকরণ করেন। পাশ্চাত্যজগৎ সরাসরি এসব নামই গ্রহণ করেছে অথবা তাদের ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ করে নিয়েছে। এসব নামের মধ্যে রয়েছে কর্নিয়া, রেটিনা, ভিট্রিয়াস হিউমার, অ্যাকুয়াস হিউমার ইত্যাদি।[৩৪০]

---

৩৩৭. ইবনুল হাইসাম, *কিতাবুল মানাযির*, পৃ. ১৩৩।

৩৩৮. চোখ কীভাবে কাজ করে তা জানার জন্য দেখুন,

১. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, Eye (চোখ) ভুক্তি, পৃ. ১৫৫-১৫৮।

২. 'আমাদের চোখ যেভাবে দেখে', https://bit.ly/3mx5Yr5।

৩. 'মানুষের চোখ কিভাবে কাজ করে', https://www.deho.tv/ -অনুবাদক।

৩৩৯. স্টেরিওস্কোপ (Stereoscope) : যে যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য ব্যবধানের দুটি ভিন্ন চিত্রকে একক এবং ঘন বলে মনে হয়।-অনুবাদক।

৩৪০. হেনরি ক্রু, *The Rise of Modern Physics; a Popular Sketch*, পৃ. ৫৯; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৫ থেকে উদ্ধৃত। আরও দেখুন, ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়া*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১০৪ ও তার পরবর্তী।

আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল হাইসামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান

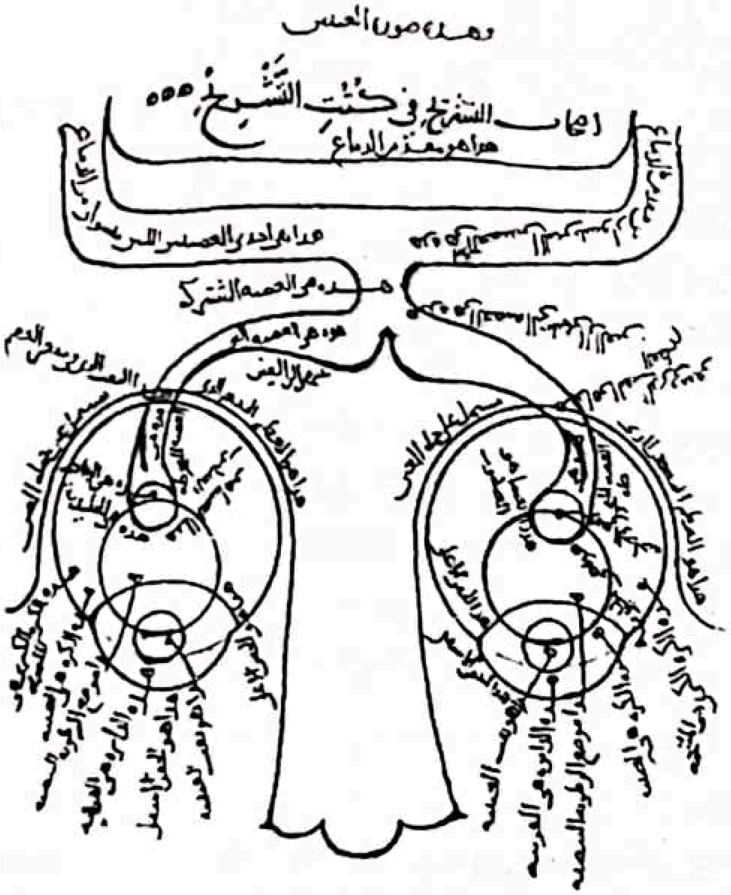
তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি পিন-হোল বা ডার্করুম বা ডার্ককেবিনেট ব্যবহার করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। এসব পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে, ডার্করুমের বা ডার্ককেবিনেটের অভ্যন্তরে বস্তুর ছবি উলটোভাবে প্রকাশ পায়। এভাবে তিনি ক্যামেরা আবিষ্কারের পথ সুগম করে তোলেন। এমন চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার কারণে ইবনুল হাইসাম দুজন ইতালীয় বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি[৩৪১] ও গিয়ামবাতিস্তা ডেলা পোর্টা[৩৪২] থেকে পাঁচশ বছর এগিয়ে রয়েছেন।[৩৪৩]

---

৩৪১. লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রি.) : ইতালীয় শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। ইতালীয় রেনেসাঁসের কালজয়ী চিত্রশিল্পী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অন্যান্য পরিচয়ও সুবিদিত—ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ, সমরযন্ত্রশিল্পী এবং বিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্য জনক। তার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে মোনালিসা, দা লাস্ট সাপার অন্যতম। তার শৈল্পিক মেধার বিকাশ ঘটে অল্প বয়স থেকেই। আনুমানিক ১৪৬৯ সালে রেনেসাঁসের অপর বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর আন্দ্রেয়া ভেরোচ্চিয়োর কাছে ছবি আঁকায় ভিঞ্চির শিক্ষানবিশ জীবনের সূচনা। এই শিক্ষাগুরুর কাছেই তিনি ১৪৭৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ১৪৭২ সালে তিনি চিত্রশিল্পীদের গিল্ডে ভর্তি হন এবং এই সময় থেকেই তার চিত্রকর জীবনের সূচনা হয়। গির্জা ও রাজপ্রাসাদের দেয়ালে চিত্রাঙ্কন এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের ভাস্কর্য নির্মাণের পাশাপাশি বেসামরিক এবং সামরিক প্রকৌশলী হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রয়োগ, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত ও পদার্থবিদ্যার মতো বিচিত্র সব বিষয়ে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন করেন এবং মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। আনুমানিক ১৪৮২ সালে তিনি মিলান গমন করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে তার বিখ্যাত দেয়ালচিত্র দা লাস্ট সাপার অঙ্কন করেন। ১৫০০ সালের দিকে তিনি ফ্লোরেন্স ফিরে আসেন এবং সামরিক বিভাগে প্রকৌশলী পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই সময়েই তিনি তার বিশ্বখ্যাত চিত্রকর্ম মোনালিসা অঙ্কন করেন। জীবনের শেষকাল তিনি ফ্রান্সে কাটান।-অনুবাদক (উইকিপিডিয়া থেকে)

৩৪২. গিয়ামবাতিস্তা ডেলা পোর্টা (১৫৩৫-১৬১৫ খ্রি.) : ইতালীয় পণ্ডিত ও বহুবিদ্যাজ্ঞ। তার রচিত গ্রন্থাবলির বিষয়বস্তু হলো ঐন্দ্রজালিক দর্শন, জ্যোতিষতত্ত্ব, রসায়ন, গণিত, আবহবিদ্যা ও প্রাকৃতিক দর্শন।-অনুবাদক।

৩৪৩. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৪।



চিত্র নং-৯
ইবনে হাইসাম রচিত 'তাশরিহুল আইন'

ইবনুল হাইসামই প্রথমবারের মতো আলোকবিজ্ঞানের ময়দানে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মাবলি প্রণয়ন করেন। আলোর গতিপথে আলোর প্রতিসরণ কীভাবে ঘটে তা তিনি কার্যকারণসহ ব্যাখ্যা করে বোঝান। অর্থাৎ বিভিন্ন মাধ্যম যেমন পানি, কাচ ও বায়ু ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গমনকালে আলোর প্রতিসরণ ঘটে। ইবনুল হাইসাম তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন থেকে এগিয়ে রয়েছেন।[৩৪৪]

---

৩৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

উপর্যুক্ত গ্রন্থে ইবনুল হাইসামের অন্যতম অর্জন হলো ডার্কবক্সের পরীক্ষানিরীক্ষা। এটিকে ক্যামেরা আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ বিবেচনা করা হয়। সাইন্টিফিক এনসাইক্লোপিডিয়ায় যেমন বলা হয়েছে, ইবনুল হাইসাম প্রথম ক্যামেরা-আবিষ্কারক হিসেবে বিবেচিত হন। এটি কার্যত ক্যামেরা অবস্কিউরা নামে পরিচিত। ক্যামেরা অবস্কিউরা ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার অগ্রদূত।[৩৪৫]

যে-কেউ *'কিতাবুল মানাযির'* ও আলো-সম্পর্কিত বিষয়গুলো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করবেন, তিনি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, ইবনুল হাইসাম একটি নতুন ধারা ও স্বভাব নিয়ে আলোকবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেছেন, যা তার পূর্বে কেউই করেননি। ৪১১ হিজরি/১০২১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি *'কিতাবুল মানাযির'* রচনা করেন। এতে তিনি তার গাণিতিক প্রতিভা, চিকিৎসা-অভিজ্ঞতা ও তার যাবতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলে তিনি এমন পরিণতিতে পৌঁছেছেন যা তাকে বিজ্ঞানজগতে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি এমনসব বিজ্ঞানশাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিয়েছে।[৩৪৬]

আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল হাইসামের অসামান্য অবদান এবং নতুন ধারার উদ্ভাবনী গবেষণা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনালোচিত, অনেক মানুষের কাছেই অপরিচিত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করে দেন যিনি তার যাবতীয় কর্মের সুলুক সন্ধান করেন, তার কীর্তি ও অবদানের ওপর আলো ফেলেন, সেগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এই ব্যক্তি হলেন মিশরীয় বিজ্ঞানী মুস্তাফা নাজিফ। তিনি ইবনুল হাইসাম ও তার কর্মের ওপর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশ করে। তিনি ইবনুল হাইসামের বিদ্যমান সব পাণ্ডুলিপি এবং অন্য শত শত উৎসগ্রন্থ পাঠে বিপুল প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করেন। এভাবে তিনি এক বাস্তবিক সত্যে

---

[৩৪৫]. জর্জ সার্টন, *Introduction to the History of Science*, খ. ১, পৃ. ৭২১।

[৩৪৬]. জর্জ সার্টন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৪ ও তার পরবর্তী।

উপনীত হন। তা এই যে, ইবনুল হাইসাম এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর সূচনাকালে আলোকবিজ্ঞানের পথিকৃৎ।[৩৪৭]

আমরা যা-কিছু উল্লেখ করলাম তা আলোকবিজ্ঞানে মুসলিমদের বিপুল অবদানের নামমাত্র অংশ ছাড়া কিছু নয়। তাহলে আরও কী পরিমাণ বিস্ময়কর অবদান রয়েছে!

[৩৪৭]. ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর কায়রোতে অনুষ্ঠিত হাসান ইবনুল হাইসামের স্মরণে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত মুস্তাফা নাজিফের ভাষণ। আল-জামইয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ লিল উলুম আর-রিয়াদিয়্যাহ ওয়াত-তবিয়িয়্যাহ (ইজিপশিয়ান এসোসিয়েশন ফর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল সাইন্স) কর্তৃক ইবনুল হাইসামের ৯০০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ছিল এটি। ইবনুল হাইসাম ১০৪০ সালে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

জ্যামিতি

প্রাচীন মানুষ তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনেই জ্যামিতিবিদ্যা রপ্ত করেছিল। বিভিন্ন আয়তন ও ক্ষেত্রফলের পরিমাপ ও বাড়িঘর নির্মাণের জন্য জ্যামিতি আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়েছিল। বরং অনেকে এটাও বলে থাকেন যে, জ্যামিতি হলো সহজাত বিজ্ঞান। কারণ প্রাণীরাও জানে যে দুটি বিন্দুর মধ্যে হ্রস্বতম পথ হলো সরলরেখা।[৩৪৮]

প্রাচীন মিশরীয়দের দিয়ে আমরা জ্যামিতি বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। তারা যেসব জ্যামিতিক সূত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন সেগুলো পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের সূত্র নামে প্রতিষ্ঠা পায়। তাদের কীর্তিগুলোই তাদের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। মিশরীয় রাজা আহমাসের (Ahmose I) যুগের অর্থাৎ ৪০০০ বছর আগেকার যেসব দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেছে তাতে পরিমাপ ও বিভিন্ন বস্তুর আকার ও আয়তন সম্পর্কে জ্যামিতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ব্যাবিলনের অধিবাসীরা প্রকৌশলবিদ্যায় নতুন অনেককিছু সংযোজন করে। গ্রিকরা ব্যাবিলনবাসী থেকে এই বিদ্যা আহরণ করে। জ্যামিতিবিজ্ঞানে গ্রিকরা প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করে। প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইউক্লিড। তিনি জ্যামিতির মূলনীতি বিষয়ে *Elements* (*Euclid's Elements*) গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। গ্রন্থটি প্রথমে আরবিতে অনূদিত হয়, তারপর তা ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।[৩৪৯]

জ্যামিতিবিদ্যা আরবে আসে গ্রিক রচনাবলির আরবি অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে *Euclid's Elements* গ্রন্থটির অনুবাদ এই ক্ষেত্রে বড়

---

৩৪৮. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৬৭।

৩৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৯।

ভূমিকা পালন করে। ডোনাল্ড আর. হিল[৩৫০] ইসলামি সভ্যতায় জ্যামিতিবিদ্যার বিকাশের ধারাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অনুবাদের ধারা শেষ হওয়ার পরপরই নতুন চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনের ধারা শুরু হয়। ইউক্লিড, পেরগার অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius of Perga) ও আর্কিমিডিসের মতো মহান মনীষীরা যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও আরবের বিজ্ঞানীরা তাদের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলোর সংশোধন করেছেন। এভাবে আরব বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যার ময়দানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।[৩৫১]

আমাদের বিস্ময়ভাব আরও বেড়ে যায় যখন আমরা জানি যে, তাদের এসব 'অসাধারণ অবদান' ছিল তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যার ময়দানে, যেখানে মুসলিমরা তেমন মনোযোগ ও গুরুত্ব দেননি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যামিতিবিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন : এক. যৌক্তিক বা বৌদ্ধিক জ্যামিতি এবং দুই. অনুভূতিগ্রাহ্য জ্যামিতি। যৌক্তিক জ্যামিতি হলো তাত্ত্বিক জ্যামিতি এবং অনুভূতিগ্রাহ্য জ্যামিতি হলো প্রায়োগিক ও বাস্তবিক জ্যামিতি। বৌদ্ধিক ও তাত্ত্বিক প্রকৌশলবিদ্যায় মুসলিমরা তত বেশি কাজ করেননি, যদিও তারা এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং টীকা ও মন্তব্য সংযোজন করেছেন। তাদের সবচেয়ে বেশি

---

৩৫০. ডোনাল্ড আর. হিল (Donald Routledge Hill 1922-1994) : ব্রিটিশ প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ। মুসলিম প্রকৌশলী বদিউযযামান আল-জাযারির كتاب في معرفة الحيل الهندسية গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য তিনি সমধিক পরিচিত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকৌশলে স্নাতক হন। ১৯৬৪ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি ইতিহাসে এম. লিট (মাস্টার্স অফ লেটার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :

১. *Islamic Technology: An Illustrated History* (আহমাদ ইউসুফ আল-হাসানের সঙ্গে যৌথভাবে);
২. *Islamic Science and Engineering*;
৩. *On The Construction of Water-Clocks–Kitab Arshimidas Fi'amal Al-Binkamat*;
৪. *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fi ma'rifat al-hiyal al-handasiyya* (অনুবাদ);
৫. *The Book of Ingenious Devices* (অনুবাদ)।

৩৫১. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৬।

মনোযোগ ও গুরুত্ব ছিল প্রায়োগিক ও বাস্তবিক জ্যামিতিবিদ্যায়। কারিগরিশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, নগরশিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে তারা তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।[৩৫২] তাদের কর্মকাণ্ড ছিল এতটাই বিশাল ও বিস্তৃত যে, একসময় যেখানে 'জ্যামিতি' শব্দটা মৌলিকভাবে কেবল তাত্ত্বিক জ্যামিতিবিদ্যাকে বোঝাত, সেখানে আধুনিক আরবি ভাষায় শব্দটি এখন স্বাভাবিকভাবে প্রায়োগিক জ্যামিতিকেই বোঝায়।[৩৫৩]

আমরা আল-বিরুনির কতিপয় রচনায় জ্যামিতি-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও দাবি দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর প্রমাণের পদ্ধতিও রয়েছে। এসব প্রমাণ-পদ্ধতি নতুন ধারার ও গভীরতাসম্পন্ন। আল-বিরুনির এসব পদ্ধতি গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদেরা যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে ইবনুল হাইসাম জ্যামিতির দুটি ধারাই—সমতল জ্যামিতি (Plane geometry) ও ঘন জ্যামিতি (Solid geometry) আয়ত্ত করেন। আলো-সম্পর্কিত গবেষণায় এবং গোলক আয়না (Spherical mirror), নলাকার আয়না (Cylindrical mirror), শঙ্কু আয়না (Conical mirror), উত্তল আয়না (Convex mirror) ও অবতল আয়নায় (Concave mirror) বিভিন্ন অবস্থায় আলোর প্রতিফলন-বিন্দু নির্ধারণে তিনি জ্যামিতির প্রয়োগ ঘটান।[৩৫৪] এসবের জন্য সাধারণ সমাধান তৈরি করেন এবং এই ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে পৌঁছেন।[৩৫৫]

মুসলিম গণিতবিদেরা বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করেন এবং সমতল জ্যামিতির ক্ষেত্রে উৎকর্ষের পরিচয় দেন। বিশেষ করে সমান্তরাল জ্যামিতিক রেখা সম্পর্কিত কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ক্ষেত্রে প্রথমত নাসিরুদ্দিন আত-তুসি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি সমান্তরাল রেখার ক্ষেত্রে ইউক্লিডের তত্ত্বকে ত্রুটিপূর্ণ

---

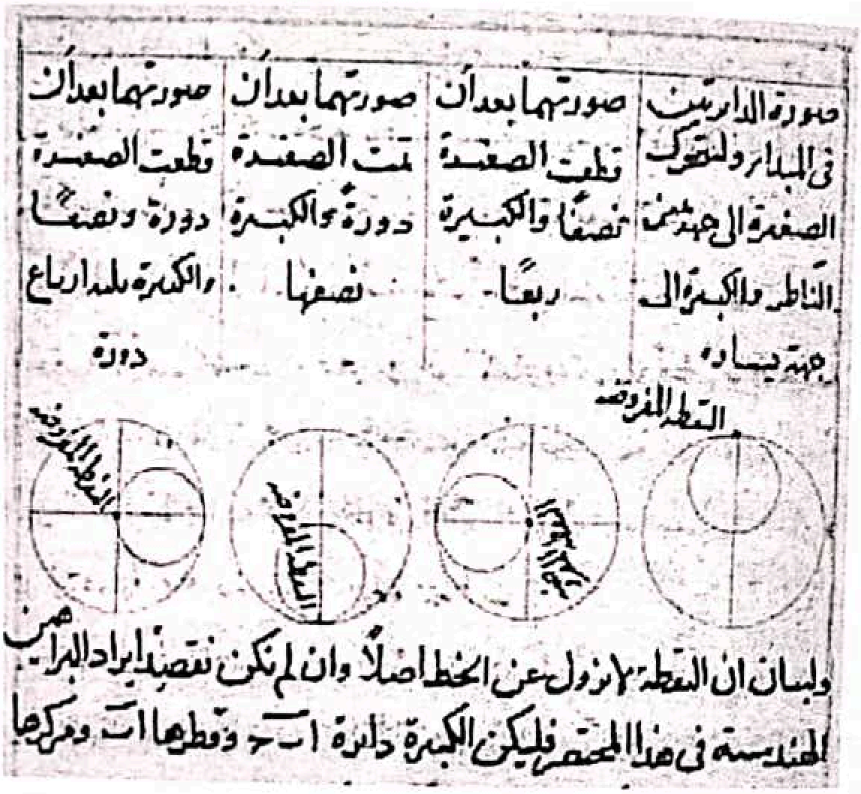
৩৫২. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৭০-৭১।

৩৫৩. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুম ওয়াল-হানদাসা ফিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৭।

৩৫৪. একে দর্পণ আলোকবিজ্ঞান (Mirror optics) বলা হয়। প্রতিবিম্ব সৃষ্টি এবং তা বিশেষ কোনো দিকে চালিত করা অথবা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সমতল অথবা বক্র প্রতিফলক পৃষ্ঠদেশের ব্যবহার-সম্পর্কিত বিদ্যাই দর্পণ আলোকবিজ্ঞান।-অনুবাদক।

৩৫৫. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৮।

আখ্যায়িত করেন এবং তার কিতাবে হাইপোথিসিস-ভিত্তিক দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেন। তার এই কিতাবটির নাম *'আর-রিসালাতুশ শাফিয়া আনিশ শাক্কি ফিল-খুতুতিল মুতাওয়াযিয়াহ'*।



চিত্র নং-১০
নাসিরুদ্দিন তুসির গ্রন্থ

নাসিরুদ্দিন তুসি জ্যোতির্বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ত্রিকোণমিতির ওপর বই লিখেছেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য না নিয়েই গোলাকার ত্রিকোণমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনিই প্রথম গোলাকার ত্রিকোণমিতিতে একটি সমকোণী ত্রিভুজের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নির্ণয় করেন। তার অবদানের ফলে ত্রিকোণমিতি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করে।

মুসলিম গণিতবিদেরা গোলকের সমতলকরণ-সম্পর্কিত বিদ্যার সঙ্গেও সকলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।[৩৫৬] হাজি খলিফা এই বিদ্যার সংজ্ঞা

---

৩৫৬. গোলাকার সমতলকরণ (Flattening) ব্যাসের সঙ্গে একটি বৃত্তের বা গোলকের সংকোচনের পরিমাপ; যথাক্রমে উপবৃত্ত বা উপগোলক গঠন করতে এটি করা হয়।-অনুবাদক

দিয়েছেন এভাবে, এটা এমন জ্ঞান যার দ্বারা গোলককে সমতলে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি জানা যায়, যেখানে রেখাগুলো এবং গোলকের অঙ্কিত বৃত্তগুলো অপরিবর্তিত থাকে এবং ওইসব বৃত্তকে বৃত্তাকৃতি থেকে রেখায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিও জানা যায়।[৩৫৭]

এই জ্ঞানের উপকারিতা কী? এই জ্ঞানের দ্বারা আলোকরশ্মি-সংক্রান্ত যন্ত্রের উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানা যায়। সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি যেমন বলেছেন, এসব যন্ত্র ও তাদের কাজ, কীভাবে এগুলোর চিন্তাগত অবস্থাকে বাস্তবিক অবস্থা অনুযায়ী রূপদান করা যায়, এগুলোর দ্বারা কীভাবে জ্যোতির্বিদ্যার খুঁটিনাটি বিষয় জানা যায় এসব নিয়ে অনুশীলন ও চর্চা করাই এই জ্ঞানের উপকারিতা। জ্যামিতির এই শাখায় মুসলিম মনীষীদের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে, আহমাদ ইবনে কাসির আল-ফারগানি রচিত '*আল-কামিল*', আল-বিরুনি রচিত '*আল-ইসতিআব*' এবং তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি আশ-শামি[৩৫৮] রচিত '*দাসতুরুত-তারজিহ ফি কাওয়ায়িদিত-তাসতিহ*'। আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[৩৫৯] এ বিষয়ে টলেমির একটি গ্রন্থ হলো *Ptolemy's Planisphere*। এটি আরবিতে '*তাসতিহুল কুরাহ*' নামে অনূদিত হয়েছে।

মুসলিমগণ জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন কোণের বণ্টন বা ত্রিখণ্ডন (Angle trisection), সুষম বহুভুজ (Regular polygon) অঙ্কন এবং বীজগণিতীয় সমীকরণের সঙ্গে একে মেলানো ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে যে, সাবিত ইবনে কুররা[৩৬০] কোণকে তিনটি

---

৩৫৭. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, পৃ. ৪০৩।

৩৫৮. তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি : মুহাম্মাদ ইবনে মারুফ আর-রাসিদ আশ-শামি (৯২৭-৯৯৩ হি./১৫২১-১৫৮৫ খ্রি.)। দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, ওষুধবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার নব্বইটিরও বেশি গ্রন্থ রয়েছে।

৩৫৯. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৩৬০. সাবিত ইবনে কুররা : আবুল হাসান সাবিত ইবনে কুররা ইবনে মারওয়ান ইবনে সাবিত (২২১-২৮৮ হি./৮৩৬-৯০১ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও অনুবাদক। আব্বাসি খলিফা মু'তাদিদ বিল্লাহর ঘনিষ্ঠভাজন ছিলেন। টলেমির *Almagest* গ্রন্থের যেসব অনুবাদ আরবি ভাষায় বেরিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তার অনুবাদই সবচেয়ে সম্পূর্ণ। টলেমির '*প্ল্যানেটারি হাইপোথেসিস*' গ্রন্থটির খুব সম্ভবত তিনিই অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদের সময় তিনি মূল লেখকের গণনা ও পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষা করে দেখতেন এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করে

সমান অংশে ভাগ করেন। তিনি এমন পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজটি করেন যা ছিল গ্রিক বিজ্ঞানীদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রফেসর কাদরি তাওকান বলেন, তৃতীয় হিজরির শুরুতেই অতিভুজের বদলে সাইন (Sine) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কে এই কাজটির সূচনা করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, সাবিত ইবনে কুররাই মেনেলাউসের (Menelaus of Alexandria) তত্ত্বকে প্রমাণ করেছিলেন এবং তাকে বর্তমান রূপে উপস্থিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কতিপয় ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানও প্রদান করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন পশ্চিমা বিজ্ঞানী তাদের গাণিতিক গবেষণায় এসব পদ্ধতি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন জিরোলামো কার্ডানো ও অন্যান্য বড় গণিতবিদ।[৩৬১]

প্রফেসর তাওকান আরও বলেন, গাণিতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ স্বীকার করেননি যে, সাবিত ইবনে কুররা তাদের অন্যতম যারা ক্যালকুলাস (Calculus) উদ্ভাবনের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ক্যালকুলাসের ভূমিকা কী তা অজ্ঞাত নয়। যদি গণিতের এই শাখা না থাকত এবং অসংখ্য জটিল ও কঠিন গাণিতিক সমস্যার সমাধানে সাবিত যে সহজীকরণ-পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছেন সেগুলো না হতো তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি থেকে উপকারগ্রহণ অসম্ভব হতো এবং তা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যেত না। সাবিত তাদের অন্যতম যারা বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতিতে মনোযোগ দিয়েছেন এবং সিদ্ধি লাভ করেছেন। বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতিতে তিনি বহু নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন যা তার আগে কেউ করতে পারেননি। তিনি বীজগণিতের ওপর একটি বই লিখেছেন, তাতে জ্যামিতির সঙ্গে

নিতেন। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় তার অন্যতম মৌলিক অবদান হলো অয়নচলনের (precession) পরিমাণের ক্ষেত্রে এক আপাত ব্যত্যয়ের অনুমান, যা trepidation নামে পরিচিত। যা পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সারণিকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার বিভিন্ন রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩৬১. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ৮৪ ও তার পরবর্তী; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৯ থেকে উদ্ধৃত।

বীজগণিতের সম্পর্ক এবং দুটিকে একত্রীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[৩৬২]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ ব্যারন কারা ডি ভো[৩৬৩] ইসলামি সভ্যতার অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আরবরা কার্যত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কীর্তি অর্জন করেছে, তারা আমাদের শূন্য (০)-এর ব্যবহার শিখিয়েছে, যদিও তারা শূন্য (০)-এর উদ্ভাবক ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের গণিতও তারাই শুরু করেছে। তারা বীজগণিতকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাখার রূপ দিয়েছে এবং এতে উৎকর্ষ সাধন করেছে। তারা বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা কোনো ধরনের বিতর্ক ব্যতিরেকেই সমতল ত্রিভুজ ও গোলাকার ত্রিভুজ এই দুটি জ্ঞানশাখার উদ্গাতা এবং এই দুটির আবিষ্কারে গ্রিকদের কোনো অবদান নেই, সূক্ষ্ম বিচার ও ইনসাফ করতে চাইলে আমাদেরকে এ কথা বলতেই হবে।[৩৬৪]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টিকে একটি উল্লম্ফন হিসেবে বিবেচনা করা যায় তা হলো আরবদের ভারতীয় সংখ্যা, বিশেষ করে শূন্য (০)-এর ব্যবহার। কে প্রথম শূন্য (০)-এর সংজ্ঞা বা পরিচয় দিয়েছিলেন তার বিতর্ক চলমান থাকলেও আরবরাই যে শূন্য (০)-এর প্রয়োগ ও ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তারা একে খালি জায়গা বা শূন্যস্থানের 'প্রকাশক' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। শূন্য (০)-এর দ্বারাই দশকীয় সংখ্যাভিত্তিক হিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন একক স্থানীয় সংখ্যা, দশক স্থানীয় সংখ্যা, শতক স্থানীয় সংখ্যা...। এভাবে বড় বড় সংখ্যা লেখা এবং বড় বড় অঙ্ক কষা সম্ভব হয়েছে। যা সেই লাতিন সংখ্যা ব্যবহার করে সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল।[৩৬৫]

---

৩৬২. প্রাগুক্ত।

৩৬৩. ব্যারন বার্নার্ড কারা ডি ভো (Baron Bernard Carra De Vaux) : ফরাসি প্রাচ্যবিদ। ফরাসি ভাষাতেই লিখেছেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল আরবের জ্ঞানভাণ্ডার। মুসলিম বিজ্ঞানীদের কয়েকটি রচনা তিনি পুনর্নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন।

৩৬৪. *The Legacy of Islam*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত, আরবি অনুবাদ, *তুরাসুল ইসলাম* (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন, জার্জিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ৫৬৩-৫৬৪।

৩৬৫. আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দাওরুল উলামা আল-আরাব ফি তাকাদ্দুমিহি*, পৃ. ৬৪।

জার্মান প্রাচ্যবিদ সিগরিড হুংকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এসব সংখ্যার ব্যবহার কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না অথবা আরবদের কোনো হস্তলিপিশৈলীও ছিল না। বরং তারা তাদের অসাধারণ প্রতিভার ফলেই ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্য ও উপঢৌকনের স্তূপ থেকে এই সংখ্যাগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, তারা যে অন্যান্য বিস্ময়কর ব্যাপারে মনোযোগ না দিয়ে এই ছোট ছোট সংখ্যাগুলোর মাহাত্ম্য আবিষ্কার করেছিলেন, তাতেই তারা প্রমাণ করেছিলেন যে তাদের রয়েছে গভীর প্রজ্ঞা ও ব্যাপক অনুধাবনশক্তি। এই সংখ্যাগুলো ছিল মূলত ভারতবর্ষীয় উপঢৌকনের অলংকার। এই সংখ্যাগুলো কি আলেকজান্দ্রিয়ায় ও সিরিয়ার যেসব নগরীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ছিল সেখানে পরিচিত ছিল না? ছিল। কিন্তু সংখ্যাগুলো আরবদের হাতে না আসা পর্যন্ত তাদের উজ্জ্বল আলো ছড়াতে পারেনি।[৩৬৬]

গণিতবিদেরা মনে করেন যে, মানবসভ্যতায় শূন্য (০) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বস্তুত শূন্য (০) ছাড়া ধনাত্মক পরিমাণ ও ঋণাত্মক পরিমাণের অস্তিত্বই (যেমন তড়িৎবিজ্ঞানে) অসম্ভব হতো এবং বীজগণিতে ধনাত্মক রাশি ও ঋণাত্মক রাশি বলে কিছু থাকত না।[৩৬৭]

তারপর আল-খাওয়ারিজমি কর্তৃক *'ইল্মুল জাব্র ওয়াল-মুকাবালা'* প্রণয়নের ঘটনায় জ্যামিতিবিজ্ঞান আরেকটি উল্লম্ফন, আরেকটি বড় ধাপ অতিক্রম করে। বিজ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে, মানববিদ্যায় মুসলিমদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনার সময় বিস্তারিত আলোচনা করব।

বস্তুর আয়তনের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাই মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের কাছ থেকে। জ্যামিতিবিদ্যায় তাদের মহৎ কাজ হলো معرفة مساحة الاشكال البسيطة والكرية (সরল ও গোলাকার বস্তুর আয়তন প্রসঙ্গে) গ্রন্থ প্রণয়ন। এই গ্রন্থে তারা বর্ণনা করেছেন যে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বা বেধ—এই তিনটি পরিমাপ প্রত্যেক ঘনবস্তুর আয়তন ও প্রত্যেক সমতল বস্তুর ক্ষেত্রফলকে সীমাবদ্ধ করে। তাদের (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও

---

৩৬৬. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১৫৭।

৩৬৭. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৫৬।

উচ্চতার) পরিমাণ নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি একটি সমতল বস্তু ও একটি ঘনবস্তুর সঙ্গে এবং একটি সমতল বস্তুর—যার দ্বারা তল বা পৃষ্ঠদেশকে পরিমাপ করা হয়—সঙ্গে তুলনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। প্রতিটি বহুভুজ একটি বৃত্তকে বেষ্টন করে থাকে, তাই ওই বহুভুজের সকল ভুজের (বাহুর) অর্ধেকে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ-পরিমাণ তল বা পৃষ্ঠদেশই তার ক্ষেত্রফল।[৩৬৮]

আর্কিমিডিসের *Measurement of a Circle or Dimension of the Circle* (বৃত্তের আয়তনের পরিমাপ) ও *On the Sphere and Cylinder* (গোলাকার ও বেলনাকার বস্তুর পরিমাপ) বিষয়ে দুটি বই রয়েছে। বানু মুসা ইবনে শাকিরের উপর্যুক্ত গ্রন্থটি আর্কিমিডিসের এই দুটি বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সাধন করেছে। তারা তিন ভাই যে দুটি বিষয়ের সুবিধা কাজে লাগান তা হলো ইউডক্সাসের[৩৬৯] *Method of exhaustion* এবং আর্কিমিডিসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু (infinitesimals) সম্পর্কিত ধারণা। তাদের এই গ্রন্থ ইসলামি প্রাচ্যে ও লাতিনীয় পশ্চিমে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩৭০]

---

৩৬৮. বানু মুসা ইবনে শাকির, *কিতাবু মারিফাতি মাসাহাতিল আশকাল*, সম্পাদনা, নাসিরুদ্দিন আত-তুসি, পৃ. ২; খালিদ আহমাদ হারবি, *উলুমু হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ১৫৪ থেকে উদ্ধৃতি।

৩৬৯. ইউডক্সাস (Eudoxus of Cnidus 390-337 BC) : গ্রিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। দরিদ্র পরিবারের সন্তান ইউডক্সাস একাডেমিতে অধ্যয়ন করেন। প্লেটোর কাছেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে মিশরে যান। তিনি তুর্কিস্তানে ও পরে এথেন্স নগরীতে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। তার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কোনোটিই মূল অবস্থায় পাওয়া যায়নি। হিপ্পারচুস, ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের লেখা থেকে তার বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা জানা যায়। তিনিই হলেন প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানী যার খগোল বা মহাজাগতিক গোলক সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল। তিনি প্রথম গ্রিক বিজ্ঞানী যিনি জানতেন এক বছর ঠিক ৩৬৫ দিন নয়, তার চেয়ে ঘণ্টা ছয়েক বেশি। তিনি পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন এবং মহাকাশকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নক্ষত্ররাজির একটা মানচিত্র অঙ্কনেও হাত দিয়েছিলেন। গণিতে তিনি অনুপাতের তত্ত্বকে মূলদ ও অমূলদ উভয় রাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তোলেন। বক্ররেখার দ্বারা আবদ্ধ কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য এক যথোপযুক্ত গাণিতিক পদ্ধতিও (Method of exhaustion) উদ্ভাবন করেছিলেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি বৃত্তের ক্ষেত্রফল যে তার ব্যাসার্ধের বর্গমূলের আনুপাতিক হয় এবং এর আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘনমূলের আনুপাতিক হয় তা প্রমাণ করেছিলেন।

৩৭০. আবদুল হামিদ সাবরাহ, *বানু মুসা ইবনে শাকির*, The Genius of Arab Civilization Source of Renaissance, সম্পাদক, আর. বি. উইন্ডার, আরবি অনুবাদ, عبقرية الحضارة العربية منبع

ক্ষেত্রফল প্রসঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গণিত-বিষয়ক রচনাবলিতে আলোচনা করেছেন। কারণ ক্ষেত্রফল জ্যামিতিরই একটি শাখা। আমরা দেখি যে, বাহাউদ্দিন আল-আমিলি[৩৭১] তার *আল-খুলাসাতু ফিল-হিসাব* (الخلاصة في الحساب)[৩৭২] গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে কেবল ক্ষেত্রফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের ভূমিকায় তিনি সমতল এবং ঘনবস্তুর আয়তন এবং ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রাথমিক সংজ্ঞার ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি সরল বাহুবদ্ধ তলের (সমতলের) ক্ষেত্রফল সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন : ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বস, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ এবং অন্যান্য সুষম বাহুর বস্তু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন বৃত্ত ও বক্রতল, যেমন সিলিন্ডার, পূর্ণাঙ্গ কোণ, অপূর্ণাঙ্গ কোণ, গোলাকার বস্তু ইত্যাদির ক্ষেত্রফল কীভাবে পাওয়া যায় তার পদ্ধতি নিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ক্ষেত্রফল ও পরিমাপ-সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। জলপথ তৈরির জন্য জরিপ পরিচালনা, বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চতা পরিমাপ এবং নদীর প্রস্থ ও কূপের গভীরতা জানার জন্য এসব বিষয় সংযোজন করেছেন।

মুসলিমরা তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছেন এবং তা তাদের স্থাপত্যশিল্পে প্রয়োগ করেছেন। এটা ছিল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মসজিদ, অট্টালিকা, প্রাসাদ ও শহর নির্মাণে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মনোযোগ ও গুরুত্ব ছিল জ্যামিতিক কারুকার্যের প্রতিও, যা ছিল বিন্যাসে ও সূক্ষ্মতায় অনন্য। যদিও ইসলামি শিল্প

النهضة الأوروبية, অনুবাদক, আবদুল কারিম মাহফুজ, পৃ. ২৫; খালিদ আহমাদ হারবি, *উলুমু হাদারাতিল ইসলাম ওয়া দাওরুহা ফিল-হাদারাতিল ইনসানিয়্যা*, পৃ. ১৫৫ থেকে উদ্ধৃতি।

৩৭১. বাহাউদ্দিন আল-আমিলি : বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আবদুস সামাদ আল-হারিসি, শাইখ বাহায়ি বা বাহাউদ্দিন আল-আমিলি নামে সমধিক পরিচিত (৯৫৩-১০৩১ হি./১৫৪৭-১৬২২ খ্রি.)। ফকিহ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বা'লাবাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ইস্পাহানে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تشريح الأفلاك ـ في علم الهيئة، رسالة في حل إشكالي عطارد والقمر، الصحيفة في الأعمال الاسطرلابية، رسالة في تضاريس الأرض، المخلاة، الكشكول، حديقة السالكين، بداية الهداية، الزبدة في الأصول، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة। দেখুন, *যিরিকলি*, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১০২।

৩৭২. বইটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন G. H. F. Nesselmann, যা ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।-অনুবাদক

(ইসলামিক আর্ট) সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনায় এ বিষয়টি (ইসলামি স্থাপত্যকলা) যথেষ্ট জায়গা দখল করে নিয়েছে, কিন্তু তা তো স্থাপত্যপ্রকৌশলের একটি মৌলিক দিক বলেই বিবেচিত। ইসলামি স্থাপত্যকলার মৌলিকতা ও অনন্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ মার্টিন এস. ব্রিগ্স[৩৭৩]। তিনি বলেছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরুর দিকে স্থাপত্যপ্রকৌশল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি আরবদের অজানা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বটে, তবে ইসলামি স্থাপত্যকলা সম্পর্কে এটা জাজ্বল্যমান সত্য যে, ইসলাম তার পতাকা উড়িয়েছে যত দেশে, যত যুগ অতিবাহিত করেছে সেখানে, তার সব জায়গায় ও সবসময়ই ইসলামি স্থাপত্যকলাই নির্মাণশৈলী হিসেবে আধিপত্য ধরে রেখেছে। অথচ ইসলামি স্থাপত্যকলার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল (অর্থাৎ প্রভাব-বিস্তারক)। এমন কিছু ব্যাপার আছে যা ইসলামি স্থাপত্যশিল্পকে স্থানীয় সব ধরনের স্থাপত্য-ঘরানার কীর্তিকলাপ থেকে পৃথক রেখেছে। যদিও স্থানীয় স্থাপত্য-ঘরানাগুলো নিজেদের জায়গায় ছিল নির্মাণশিল্পের হাতিয়ার।[৩৭৪]

জ্যামিতিবিজ্ঞানে মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামি সভ্যতার একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। তবে কেউ ইচ্ছা করে স্বীকার না করলে ভিন্ন কথা। মুহাম্মাদ কুর্দ আলি লুইস সিডিও (Louis-Amélie Sédillot)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, আরবদের (আরব মুসলিমদের) স্থাপত্যপ্রকৌশলে যে সৃজনশীলতা ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারে যারা জানে সবাই তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাদের কোনো প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আরবরা তাদের নিজস্ব স্টাইলের ভবন উদ্ভাবন করেনি বটে, তবে তাদের স্থাপত্যকলায় কারুকার্য ও কমনীয়তার প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তারা খিলানযুক্ত তোরণ ও কম্পাসীয় নকশা অঙ্কনে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের মসজিদ ও অট্টালিকার জন্য ফুল ও লতাপাতাযুক্ত গম্বুজ, ছাদ ও আসন নির্মাণে তারা যে স্থাপত্য নৈপুণ্যের

---

৩৭৩. মার্টিন এস. ব্রিগ্স (Martin Shaw Briggs 1882-1977) : ব্রিটিশ স্থাপত্য-ইতিহাসবিদ, বারোক পিরিয়ডে বিশেষজ্ঞ এবং রয়াল ইন্সটিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেক্টস-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Muhammadan architecture in Egypt and Palestine* (1974), *Baroque Architecture* (1913), *The architect in History* (1927).-অনুবাদক

৩৭৪. থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম* (১৯৫৮), পৃ. ২৩২।

পরিচয় দিয়েছে তা যুগ যুগ ধরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এসব ব্যাপার নকশা ও কারুকার্যের প্রতি তাদের যে প্রগাঢ় ভালোবাসা তা-ই প্রমাণ করে। তাদের অট্টালিকাসমূহ ও নির্মাণশিল্পগুলো যেন প্রাচ্যের এক থান কাপড়, যার নকশায় ও অলংকরণে তাঁতি চরম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। একজন ফিরিঙ্গি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির স্বীকৃতি এমনই।[৩৭৫]

জ্যামিতিবিজ্ঞানের বিকাশে মুসলিমদের অবদানের কিছুমাত্র অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাদের অবদানের ফলে জ্যামিতির ব্যবহার ও প্রয়োগে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল। অবশ্য তার আগে তারা পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর উত্তরাধিকার নিজেদের আয়ত্ত করেও নিয়েছিলেন।

---

৩৭৫. মুহাম্মাদ কুর্দ আলি, *আল-ইসলাম ওয়াল-হাদারাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৩৮।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ভূগোলবিদ্যা

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের রচনাবলি এখনো পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। এসব রচনায় যেসব তথ্য ও সংবাদ রয়েছে তা আমাদের ঐতিহাসিক ভূগোল-বিষয়ক জ্ঞানকে বৃদ্ধি করেছে। তাদের এসব রচনায় মূলত বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে তা আমাদের ওইসব দেশের ইতিহাস-সম্পর্কিত জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। এই ময়দানে ইসলামের উত্তরাধিকার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[৩৭৬]

এটা আমাদের কথা নয়, বরং তা জার্মান-ইসরাইলি গবেষক মার্টিন প্লেসনারের[৩৭৭] কথা।

ইসলামের আগমনের পূর্বেই ভূগোলবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আরবদের প্রাগ্রসরতা ও তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ফলে ভূগোলবিদ্যায়ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই যে, আরবরা শুরুর দিকে গ্রিকদের বিজ্ঞান গ্রহণ করেছিল, বিশেষ করে টলেমির। ভূগোলবিদ্যায় গ্রিকরাই ছিল তাদের পথপ্রদর্শক। তবে এই ক্ষেত্রেও আরবরা তাদের গুরুদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যেমনটা ছিল তাদের অভ্যাস।[৩৭৮]

এটাও আমাদের বক্তব্য নয়, বরং বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ গুস্তাভ লি বোঁর বক্তব্য।

---

৩৭৬. মার্টিন প্লেসনার, *মাবহাসুল উলুম*, যোসেফ শাখ্ত *(Joseph Franz Schacht)* ও ক্লিফোর্ড এডমন্ড বসওয়র্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত The Legacy of Islam, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام, খ. ২, পৃ. ১৫৪।

৩৭৭. মার্টিন প্লেসনার (*Martin Plessner* 1797-1883) জার্মান অর্থোডক্স ধর্মপ্রচারক এবং পণ্ডিত। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ। বেলারুশে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ধ্রুপদি ঐতিহ্য এবং মধ্যযুগে ইহুদিধর্মের ওপর ইসলামের প্রভাব তার প্রধান আগ্রহের বিষয়।-অনুবাদক

৩৭৮. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৮।

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও অবদান

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও অবদানকে আমরা তিনটি বিভাগে চিহ্নিত করতে পারি :

- পূর্ববর্তী ভ্রান্তি-বিভ্রাটের সংশোধন
- দেশ ও নিদর্শনসমূহের যথার্থ বর্ণনা
- আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

পৃথিবীর গোলকাকৃতির প্রমাণ

পৃথিবী যে গোলাকার তা প্রথম মুসলিমরাই প্রমাণ করেছিলেন। ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার যাত্রা শুরু হয় এভাবেই। গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী হলো বৃত্তাকার সমতল চাকতি, যাকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে সমুদ্রের জলরাশি। হেকাটিয়াস (Hecataeus of Miletus 500 BC)—যাকে গ্রিক ভূগোলবিদ্যার জনক বিবেচনা করা হয়—তো পৃথিবীকে একটি বৃত্তাকার চাকতি ধরে নিয়ে তার মানচিত্র অঙ্কন করেছেন।[৩৭৯] পৃথিবী যে গোলাকার তার প্রথম তাত্ত্বিক ধারণা দেন প্লেটো (৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), তবে তিনি তার পরবর্তী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের থেকে যথার্থ সমর্থন পাননি। এমনকি রোমান সাম্রাজ্য তার এই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে। রোমান ভূগোলবিদ্যার জনক কসমাস (Cosmas) ৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন, পৃথিবী হলো চাকার সদৃশ, সমুদ্রের জলরাশি তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে...।' বিষয়টি জটিল পর্যায়ে পৌছে যখন গির্জা ও গির্জার প্রথম সারির ফাদাররা—যাদের নেতৃত্বে ছিলেন লাকটানটিয়াস (Lactantius)—কসমাসের উপর্যুক্ত তত্ত্বকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত দেন যে, পৃথিবী হলো সমতল এবং অন্যপাশ হলো অনাবাদিত, তা (পৃথিবী সমতল) না হলে মানুষ শূন্যে পতিত হতো![৩৮০]

---

৩৭৯. হেকাটিয়াস মূলত অ্যানাক্সিম্যান্ডারের (Anaximander 610-546 BC) অঙ্কিত মানচিত্রের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন।-অনুবাদক।

৩৮০. প্রাগুক্ত এবং জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮।

ইসলামি সভ্যতা আবির্ভাবের পর তা পৃথিবীর গোলকাকার তত্ত্বকে গ্রহণ করে এবং এই তত্ত্বের পুনর্জীবনদানে সচেষ্ট হয়। এর পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে পৃথিবীর গোলকাকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا﴾

এবং পৃথিবীকে তারপর বিস্তৃত করেছেন।[৩৮১]

'দাহিয়্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গোলক। পবিত্র কুরআনে আরও অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো এই গোলকটি যে তার নিজের চারপাশে (কক্ষপথে) ঘূর্ণায়মান তা নিয়ে আলোচনা করেছে। গোলকটির (পৃথিবীর) এমন আবর্তনের ফলেই দিবস ও রজনীর সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

তিনি রাতের দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাতের দ্বারা।[৩৮২]

ইবনে খুররাদাযবিহ[৩৮৩] বলেছেন, পৃথিবী বলের মতোই গোলাকার, ডিমের ভেতরে থাকা কুসুমের মতো।[৩৮৪] ইবনে রুসতাইও[৩৮৫] একই কথা বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আকাশকে বলের মতো গোলকাকার বানিয়েছেন, তা শূন্যগর্ভ ঘূর্ণনশীল; পৃথিবীও গোলাকার এবং আকাশের অভ্যন্তরে রয়েছে।[৩৮৬]

---

৩৮১. সুরা নাযিআত : আয়াত ৩০।

৩৮২. সুরা যুমার : আয়াত ৫।

৩৮৩. ইবনে খুররাদাযবিহ : আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে খুররাদাযবিহ (২০৪-২৭২ হি./৮২০-৮৮৫ খ্রি.)। ভৌগোলিক ইতিহাসবিদ। বারমাকিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ المسالك والممالك। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ২২৯।

৩৮৪. ইবনে খুররাদাযবিহ, *আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক*, পৃ. ৪।

৩৮৫. ইবনে রুসতাহ : আবু আলি আহমাদ ইবনে উমর (মৃ. ৩০০ হি./৯১২ খ্রি.)। ভূগোলবিদ। ইরানের ইস্পাহানের অধিবাসী। الأعلاق النفيسة তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১৮৫।

৩৮৬. ইবনে রুসতাহ, *আল-আ'লাক আন-নাফিসাহ*, পৃ. ৮।

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও *আল-ইক্‌দুল ফারিদ* গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে আবদি রাব্বিহি[৩৮৭] কয়েকটি পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন, যেখানে তিনি আবু উবাইদা মুসলিম ইবনে আহমাদ আল-ফালাকির[৩৮৮] বক্তব্যের খণ্ডন করেছেন। আমরা তার পঙ্‌ক্তিমালা থেকে জানতে পারি যে, আবু উবাইদা আল-ফালাকি পৃথিবী গোলকাকার বলে মত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু ইবনে আবদি রাব্বিহি তার সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাই তিনি বলেছেন,

أبـا عُبيدةَ ما المسؤولُ عن خَبرٍ   تَحكـيـهِ إلا سُـؤالاً للـذي سـألا
أبَيـتَ إلا شـذوذًا عن جماعـتِنا   ولم تعبْ رأيُ من أرجا ولا اعْتَزَلا
كـذلكَ الـقِبـلةُ الأولى مُـبدَّلةٌ   وقد أبَيـتَ فمـا تَبـغي بـها بَـدَلا
زعمتَ بهرامَ أو بَيدَختَ يرزقُنا   لا بل عُطاردَ أو بِرجِيسَ أو زُحَلا
وقلتَ إنَّ جمـيعَ الخَـلقِ في فَلكٍ   بهِمْ يحيطُ وفيـهِمْ يـقسمُ الأجَـلا
والأرضُ كورِيَّةٌ حفَّ السماءُ بها   فَوقاً وتحتاً وصارتْ نُقـطةً مَـثَـلا
صَيفُ الجنوبِ شتاءٌ للشَّمَالِ بها   قـد صارَ بَينـهمـا هـذا وذا دُوَلا
فـإنَّ كـانـونَ في صَنعـا وقُرطبةٍ   بردٌ وأيلولُ يُذكي فـيهـما الشُّعَلا
كما استمر ابنُ موسى في غوايتهِ   فوعَّرَ السهلَ حتى خِـلتَـهُ جَبَلا
أَبلِغْ معاويـةَ المُصـغي لقولِهـما   أني كـفرتُ بما قالا ومـا فَـعلا

আবু উবাইদা, আপনি যা বলেন সে বিষয়ে আপনি দায়িত্বশীল নন, বরং প্রশ্নকারীর জন্য রেখে যান প্রশ্ন।

আপনি আমাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং যে বিচ্ছিন্ন হয় বা পাশ কাটিয়ে যায় তার বক্তব্য সঠিক হয় না।

---

৩৮৭. ইবনে আবদি রাব্বিহি : আবু উমর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদি রাব্বিহি ইবনে হাবিব ইবনে হুদাইর ইবনে সালেম (২৪৬-৩২৮ হি./৮৬০-৯৪০ খ্রি.)। শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক। *আল-ইকদুল ফারিদ* গ্রন্থের প্রণেতা। কর্ডোভার অধিবাসী। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০৭।

৩৮৮. আবু উবাইদা আল-ফালাকি : আবু উবাইদা মুসলিম ইবনে আহমাদ (মৃ. ২৯৫ হি.)। গ্রহরাজির আবর্তন ও নক্ষত্রের সন্তরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ছিলেন ফকিহ ও হাদিস বিশারদ। ভাষা ও ব্যাকরণ এবং ছন্দশাস্ত্রেও দখল ছিল তার। দেখুন, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মাক্কারি, *নাফহুত তিব*, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪।

প্রথম কেবলার পরিবর্তন হয়েছিল; কিন্তু আপনি তা স্বীকার করেন না এবং এ ধরনের পরিবর্তন আশাও করেন না।

আপনি দাবি করেছেন, বাহরাম[৩৮৯] বা বায়দুখ্ত[৩৯০] আমাদের রিযিক দান করে, না বরং বুধগ্রহ বা বৃহস্পতিগ্রহ বা শনিগ্রহ রিযিক দান করে।

আপনি বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে এক মহাকাশে, যা তাদের বেষ্টন করে আছে এবং তাদের মধ্যে মহাকাশই নির্ধারণ করে সময়।

আপনি আরও বলেছেন, পৃথিবী হলো গোলাকার, আকাশ তাকে উপর দিক ও নিচ দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, যেন তা আকাশের মধ্যস্থলে একটি বিন্দু।

পৃথিবীর দক্ষিণে (দক্ষিণ মেরুতে) যখন গ্রীষ্ম, উত্তরে (উত্তর মেরুতে) তখন শীত, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যস্থলে রয়েছে পৃথিবীর সব দেশ।

সানআ ও কর্ডোভায় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে থাকে শীত, আর সেপ্টেম্বর মাস এখানে জ্বালায় আগুন।

ইবনে মুসাও তার পথভ্রষ্টতায় রয়েছেন অটল; তিনি সমতলকে করে তোলেন এতটা অসমান যে (বা সহজ বিষয়কে করে তোলেন এতটা কঠিন যে) তাকে তোমার পাহাড় মনে হয়।

মুআবিয়াকে—যে তাদের দুইজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে—জানিয়ে দাও, তারা দুইজন (আবু উবায়দা ও ইবনে মুসা) যা বলেন ও করেন তা আমি স্বীকার করি না।

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই আবু উবাইদার জীবনচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার কাছে মিথ্যাচারের চেয়ে আকাশ থেকে পতনও সহজতর। এই বক্তব্য প্রথমত তার চারিত্রিক গুণাবলিকে নির্দেশ করলে তা থেকে এই বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি ছিলেন

---

৩৮৯. সাসানীয় সম্রাট; প্রথম বাহরাম, দ্বিতীয় বাহরাম ও পঞ্চম বাহরাম সাসানীয় সম্রাট ছিলেন।-অনুবাদক

৩৯০. ইরানের খুরাসান প্রদেশের গুরাবাদ জেলার একটি শহর।-অনুবাদক

সূক্ষ্ম অনুসন্ধানী, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁটিয়ে দেখতেন, কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণা করতেন।

আবু উবাইদা হিজরি তৃতীয় শতকের (খ্রিষ্টীয় নবম শতকের) একজন বিজ্ঞানী। আন্দালুসে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন তিনি ছিলেন তাদের প্রথম সারির অন্যতম ব্যক্তি। আমাদের জন্য আরও একটি ব্যাপার জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামি বিশ্ব এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে—তা যতটাই অভিনব হোক—কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি এবং বিরোধিতাও করেনি। তা ছাড়া যারা কিছুটা বিরোধিতা করতেন, তারাও স্বাভাবিক সীমারেখার বাইরে গিয়ে বিরোধিতা করতেন না। এখানে আমাদের সংগত কারণেই এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, এই সময় থেকে ইউরোপে পাঁচশ বছরব্যাপী জ্ঞানের বিকাশ ছিল রক্তে প্লাবিত, আগুনে দগ্ধ ও ইনকুইজিশনের নির্যাতনের শিকার।

ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি ও পৃথিবীর গোলাকৃতি

এখানে আমাদের এ কথা বলে রাখাও সংগত যে, ইসলামি ধর্মীয় জ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়াতে পারেন না। তারা ইসলামে এমন শিক্ষা পান যা জ্ঞানগত সত্যকে সমর্থন করে এবং সত্য অস্বীকারকারীদের বিরোধিতা করে। যেমন ইবনে হায্ম আল-আন্দালুসি পৃথিবীর গোলাকৃতির ব্যাপারে মুসলিম ইমাম ও মনীষীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পৃথিবী যে গোলাকার সে ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে এবং এই প্রমাণগুলো সঠিক। তবে এর বিপরীত ছিল সাধারণ মানুষের বক্তব্য। (সাধারণ মানুষের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে) আমাদের জবাব এই যে—আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা—মুসলিম মনীষীদের কেউই, যারা এমনকি 'জ্ঞানের ইমাম' উপাধি ধারণের হকদার, পৃথিবীর গোলকাকৃতিকে অস্বীকার করেননি। তাদের কেউই এই বক্তব্যের সমর্থনে নিজেদের পক্ষ থেকে একটি শব্দও খরচ করেননি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই পৃথিবীর গোলকাকৃতির ও ঘূর্ণনের ব্যাপারে বহু প্রমাণ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

> তিনি রাতের দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাতের দ্বারা।[৩৯১]

এদের একটি যে আরেকটিকে পেঁচিয়ে রয়েছে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এটি। كَوَّر العمامة (সে পাগড়ি পেঁচালো) ধাতু থেকে কথাটি এসেছে। পেঁচানোই পাগড়ি বাঁধার প্রক্রিয়া এবং গোলকাকার বস্তুতেই পেঁচানো হয়। পৃথিবীর গোলকাকৃতির ব্যাপারে এটা স্পষ্ট দলিল...।[৩৯২]

আল-ইদরিসি ও পৃথিবীর গোলাকৃতি

শরিফ আল-ইদরিসি যা বলেছেন, নিশ্চয় পৃথিবী বলের গোলকাকৃতির মতো গোলকাকার। পানি তার সঙ্গে এঁটে রয়েছে এবং প্রাকৃতিকভাবেই তার ওপর স্থির রয়েছে ও পড়ে যাচ্ছে না। জলসহ পৃথিবী রয়েছে মহাকাশের অভ্যন্তরীণ শূন্যতায়, যেমন ডিমের অভ্যন্তরে থাকে কুসুম। জলসহ পৃথিবীর অবস্থান মধ্যবর্তী এবং বাতাস (অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল) তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে।[৩৯৩]

আল-ইদরিসি যেসব মানচিত্র এঁকেছিলেন তার সম্পর্কে উইল ডুরান্ট বলেছেন, এসব মানচিত্র মধ্যযুগে মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার (cartography) শ্রেষ্ঠ ফসল। তার পূর্বে এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ, এর চেয়ে সূক্ষ্ম, এর চেয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক মানচিত্র কোথাও অঙ্কন করা হয়নি। অধিকাংশ মুসলিম বিজ্ঞানী যেমন পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টিকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, আল-ইদরিসিও তা-ই করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এটি বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত সত্য।[৩৯৪]

---

[৩৯১]. সুরা যুমার : আয়াত ৫।

[৩৯২]. ইবনে হাযম আল-আন্দালুসি, الفصل في الملل والأهواء والنحل, খ. ২, পৃ. ৭৮।

[৩৯৩]. আল-ইদরিসি, نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق, পৃ. ৭।

[৩৯৪]. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৮।



চিত্র নং-১১
ইদরিসি কৃত পৃথিবীর মানচিত্র

এতকিছুর পরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কিছু আরবি গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র এখনো পশ্চিমা তথ্যসূত্র থেকে নকল করে প্রচার করে যাচ্ছে যে পৃথিবীর গোলকাকৃতির তত্ত্বের সঙ্গে মুসলিমদের পরিচয় ছিল না। বরং কোপার্নিকাসের কল্যাণেই এ তত্ত্বটি ঘোষিত হয়। আপনি এখন কোপার্নিকাসের মৃত্যুতারিখ (১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) আমাদের আলোচিত মুসলিম বিজ্ঞানীদের মৃত্যুতারিখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, কে কাদের থেকে এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছে সেই সত্য প্রতিভাত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট!

খলিফা আল-মামুন এবং পৃথিবীর আয়তনের পরিমাপ

মুসলিমরা যে পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করেছিলেন তার কৃতিত্ব দেওয়া হয় আব্বাসি খলিফা আল-মামুনকে (মৃ. ২১৮ হি./৮৩৩ খ্রি.)। তিনিই প্রথম ভূ-গোলকের আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ) পরিমাপের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ও ভূগোলবিদদের দুটি দলকে নিযুক্ত করেন। একটি দলের নেতৃত্বে থাকে

গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিন্দ ইবনে আলি[৩৯৫] এবং অপর দলটির নেতৃত্বে থাকেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ আলি ইবনে ঈসা আল-আস্তুরলাবি[৩৯৬]। (এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, দুটি দলের একটির নেতৃত্বে ছিলেন বানু মুসা ইবনে শাকির বা মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা।) খলিফা তাদের দুইজনের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তারা দুইজন পৃথিবীর পরিধির মহাবৃত্তের পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি ভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে যাবেন এবং উভয়েই দ্রাঘিমারেখার এক ডিগ্রি পরিমাণ পরিমাপ করবেন (যে দ্রাঘিমারেখা ৩৬০ ডিগ্রি হবে)। ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক দলই একটি বিস্তৃত সমতল ভূখণ্ড বেছে নেয়, ভূখণ্ডের একটি স্থানে একটি কীলক স্থাপন করে। তারপর ধ্রুবতারাকে[৩৯৭] স্থির বিন্দু ধরে নিয়ে কীলক ও ধ্রুবতারা এবং ভূমির মধ্যে কোণ নির্ণয় করে। তারপর উত্তর দিকে এমন জায়গায় এগিয়ে যায় যেখানে ওই কোণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

৩৯৫. সিন্দ ইবনে আলি : আবু তাইয়িব সিন্দ ইবনে আলি আল-ইয়াহুদি (মৃ. ২৫০ হি./৮৬৪ খ্রি.)। প্রখ্যাত মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অনুবাদক, গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। খলিফা আল-মামুনের দরবারে আসেন এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তারকা-সারণি জিজ আল-সিন্দহিন্দ (Zīj al-Sindhind) অনুবাদ ও সম্পাদনার জন্য পরিচিতি লাভ করেন। একজন গণিতবিদ হিসাবে সিন্দ ইবনে আলি আল-খাওরিজমির সহকর্মী ছিলেন। পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ كتاب المنفصلات والمتوسطات في النجوم والحساب। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৫, পৃ. ২৪২।

৩৯৬. আলি ইবনে ঈসা আল-আস্তুরলাবি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ। বাগদাদে বসবাস করতেন। খলিফা আল-মামুনের বিজ্ঞান পরিষদে ছিলেন।

৩৯৭. ধ্রুবতারা (Pole star) : পৃথিবীর উত্তর মেরুর অক্ষ বরাবর দৃশ্যমান তারা ধ্রুবতারা নামে পরিচিত। এই তারাটি পৃথিবীর অক্ষের উপর ঘূর্ণনের সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আবর্তিত হয়। প্রাচীন কালে দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সময় নাবিকেরা এই তারার অবস্থান দেখে দিগ্‌নির্ণয় করত। সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম দুটি তারা, পুলহ এবং ক্রতুকে সরলরেখায় বাড়ালে তা এ তারাটিকে নির্দেশ করে। এটি লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলে দেখা যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দৃশ্যমান সকল তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে। শুধু ধ্রুবতারাই মোটামুটি একই স্থানে দৃশ্যমান থাকে। এটি আকাশের একমাত্র তারা, যেটিকে এ অঞ্চল হতে বছরের যেকোনো সময়েই ঠিক এক জায়গায় দেখা যায়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ থেকে ধ্রুবতারাকে সারা বছরই আকাশের উত্তরে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যায়। দিগ্‌নির্ণয়ে এই তারা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বাংলাদেশের আকাশে ধ্রুবতারাকে বেশি উঁচুতে দেখা যায় না। ঢাকা থেকে ধ্রুবতারার উচ্চতা ২৩ ডিগ্রি ৪৩ মিনিট। দিগ্‌বলয় থেকে আকাশের প্রায় চারভাগের একভাগ উঁচুতেই এই তারাটির মতো উজ্জ্বল আর কোনো তারা নেই বলে একে চিনতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। তবে বাংলাদেশ থেকে যতই উত্তরে যাওয়া যাবে, ধ্রুবতারাকে ততই ওপরে দেখা যাবে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

তারপর উভয় দল কীলক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপ করে। তারা ভূমির ওপর দূরত্ব পরিমাপ করত কীলকের ওপর বাঁধা রশির দ্বারা।[৩৯৮]

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ভূ-গোলকের আয়তন পরিমাপের ফল ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সামসময়িক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অধিকতর নিকটবর্তী। খলিফা আল-মামুন উভয় দলের নির্ণীত পরিমাণের গড় হিসাব গ্রহণ করেন এবং দেখেন যে এটা ৫,৬৬৬ মাইলের কাছাকাছি। আর সামসময়িক বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে এটা ৫,৬৯৩ মাইল। আল-মামুনের এই পরিমাপ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি হলো ২০,৪০০ মাইল, অর্থাৎ, প্রায় ৪১,২৪৮ কিলোমিটার। আধুনিক কালে স্যাটেলাইটের দ্বারা পরিমাপকৃত পৃথিবীর পরিধি হলো ৪০,০৭০ কিলোমিটার। আপনি আল-মামুনের নিযুক্ত দল দুটির পরিমাপ ও আধুনিক স্যাটেলাইটের পরিমাপ মিলিয়ে দেখুন, দেখবেন, উভয় পরিমাপের মধ্যে ভুলের পরিমাণ ৩%-এরও কম! নিশ্চয় এটি গৌরব করার মতো বিষয়।[৩৯৯]

টলেমির *জিয়োগ্রাফি* (*Geography of Claudius Ptolemy*) অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ, যার ওপর মুসলিমরা তাদের ভৌগোলিক বিদ্যার ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলতে গেলে এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা মুসলিমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বসূরিদের উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে। এর সঙ্গে অবশ্য আরেকটি গ্রন্থ ছিল, সেটির রচয়িতা হলেন মারিনুস অফ টায়ার[৪০০]; তবে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত কম।[৪০১]

মুসলিমরা পূর্ববর্তীদের ভ্রান্তি সংশোধন করলেন

টলেমি তার মানচিত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ধারণে যেসব ভুল করেছিলেন মুসলিম ভূগোলবিদেরা তার সংশোধন করেন। তার এসব ভ্রান্তির মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্যসীমা

---

৩৯৮. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬২।

৩৯৯. এই বিষয়ে দেখুন, *Johannes Willers*, *Schätze der Astronomie*, আরবি অনুবাদ, كنوز علم الفلك, পৃ. ২৫।

৪০০. মারিনুস অফ টায়ার (Marinus of Tyre) : টায়ার-এর আরবি নাম সুর। এটি ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি শহর। সিরিয়ায় খ্রিষ্টপূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সময়ে তিনি সুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবৎকাল খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে নিয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত (৭০-১৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। টলেমি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি মারিনুসের শিষ্য ছিলেন। মারিনুস অফ টায়ারের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো '*তাসহিহুল জুগরাফিয়া*'।

৪০১. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯০।

নির্ধারণে অনেক বেশি অতিরঞ্জিত করেন এবং তার পরিচিত পৃথিবীর আবাদিত অংশের বিস্তৃতি নির্ধারণেও বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যান। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে হ্রদ বলে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করেন তখন এই কাজটি করেন। সাইলোন দ্বীপের (শ্রীলংকার) আয়তন নির্ধারণেও তিনি অতিরঞ্জিত করেন। কাস্পিয়াস সাগর ও পারস্য উপসাগরের অবস্থান নির্ধারণে তিনি মারাত্মক ভুল করেন। মুসলিমরা এসব ভ্রান্তিসহ অন্যান্য ভ্রান্তিরও সংশোধন করেন। তারপর মুসলিমরা পৃথিবীকে তাদের বর্ণনামূলক মানচিত্র উপহার দেন, কমপক্ষে পাঁচ শতাব্দী ধরে ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের বহু দল এটির চূড়ান্ত রূপদানে অংশগ্রহণ করেন। এই মানচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তারা এমন অনন্য কীর্তি রেখে যান, মধ্যযুগে যার কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি।[৪০২]

টলেমি যেসব শহরের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করেছিলেন তার অধিকাংশেরই বাস্তবিক অবস্থানের সঙ্গে মোটেই মিল ছিল না। কেবল ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণে তার ভ্রান্তির পরিমাণ হলো চারশ ফারসাখ (তিনি একে চারশ ফারসাখ বাড়িয়ে দেখান)।

আরবদের হাতে ভূগোলবিদ্যার কী পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য গ্রিকদের নির্ণীত জায়গাগুলোর সঙ্গে আরবদের নির্ণীত জায়গাগুলোকে মিলিয়ে দেখাই যথেষ্ট।[৪০৩]

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ

মুসলিমরাই প্রথম ভূ-গোলকের মানচিত্রের ওপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ ও অঙ্কন করেন। প্রথম যিনি দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখা নির্ধারণ করেন তিনি হলেন আবু আলি আল-মুররাকুশি[৪০৪]। তার এ কাজের

---

৪০২. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯০-৩৯৩।

৪০৩. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৮।

৪০৪. আবু আলি আল-হাসান ইবনে আলি ইবনে আল-মুররাকুশি (মৃ. ৬৬০ হি./১২৬২ খ্রি.)। মরোক্কান জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ভূগোলবিদ এবং সূর্যঘড়িনির্মাতা। ত্রিকোণমিতিতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ত্রিকোণমিতিতে তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম সাইন, কোসাইন ইত্যাদি ব্যবহার করেন এবং সাইন-সারণি তৈরি করেন। বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করেন। ২৪০টিরও বেশি নক্ষত্র চিহ্নিত করে তাদের বর্ণনা দেন। সমান সময় নির্দেশ রেখা ব্যবহার করেন। বিভিন্ন ভৌগোলিক ত্রুটি সংশোধন করেন এবং মরক্কোর মানচিত্র নতুনভাবে অঙ্কন করেন। জর্জ সার্টন বলেছেন, আল-মুররাকুশি প্রথম কোণের সাইন এবং ৯০

পেছনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। যাতে মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নামাযের জন্য সমান সময় নির্ধারণ করতে পারেন। আল-বিরুনিই প্রথম ভূ-গোলককে সমতলে রূপান্তরের (সমতলকরণের) গাণিতিক নীতি প্রস্তুত করেন। এটি হলো রেখা ও চিত্রকে গোলক থেকে সমতলে রূপান্তর করা এবং সমতল থেকে গোলকে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। তিনি এই গাণিতিক নীতি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক মানচিত্র অঙ্কন সহজ করে তোলেন।[৪০৫]

পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতা সম্পর্কে গবেষণা

যে সময়টাতে বিশ্বে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে পৃথিবী হলো গোলকাকার এবং ভূ-গোলকের নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মানতার বিষয়ে কেউ আলোচনাও করত না, সেই সময়ে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে) তিনজন মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতা ও আবর্তনের বিষয়টিকে আলোচনায় নিয়ে আসেন। তারা হলেন কাযভিনের আলি ইবনে উমর আল-কাতিবি[৪০৬], আন্দালুসের কুত্‌বুদ্দিন আশ-শিরাজি এবং সিরিয়ার আবুল ফারজ আলি। মানবেতিহাসে তারাই প্রথমবার পৃথিবী যে নিজ কক্ষপথে সূর্যের সামনে প্রতি দিনে-রাতে একবার ঘোরে সেই সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেন। এই বিজ্ঞানীত্রয় সম্পর্কে জর্জ সার্টন বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই তিনজন বিজ্ঞানী যে গবেষণা করেন তা বিফলে যায়নি। বরং তা নিকোলাস কোপার্নিকাসের গবেষণায় অন্যতম অনুঘটক হিসেবে প্রভাব রেখেছে। এই গবেষণা থেকেই কোপার্নিকাস ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে (পৃথিবীর ঘূর্ণায়মানতার) তাত্ত্বিক কাঠামো প্রকাশ করেন।[৪০৭]

ডিগ্রির পূরকের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। جامع المبادئ والغايات في علم الميقات তার বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন জে জে সিডিও এবং প্রকাশ করেন তার ছেলে লুইস সিডিও।

৪০৫. ড. আবদুর রহমান হামিদাহ, *আলামুল জুগরাফিয়্যিনাল আরব*, পৃ. ৪৫৯।

৪০৬. আলি ইবনে উমর আল-কাতিবি : নাজমুদ্দিন আলি ইবনে উমর ইবনে আলি আল-কাতিবি আল-কাযবিনি (৬০০-৬৭৫ হি./১২০৩-১২৭৭ খ্রি.)। প্রজ্ঞাবান ও যুক্তিবিদ। নাসিরুদ্দিন আত-তুসির শিষ্য। তার বহু রচনা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো '*আশ-শামসিয়্যাহ*' ও '*হিকমাতুল আইন*'। দেখুন, সাফাদি, আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত, খ. ২১, পৃ. ২৪৪।

৪০৭. জর্জ সার্টন, *Introduction to the History of Science*, খ. ১, পৃ. ৪৬।

ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা

ভূগোলবিদ্যায় ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানীরা প্রকৃত অর্থেই বহু ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়াকুত হামাবির রচনা *মুজামুল বুলদান*। এই বিশ্বকোষ সম্পর্কে উইল ডুরান্ট বলেন, এটি একটি বৃহদাকার ভৌগোলিক বিশ্বকোষ; তিনি এতে মধ্যযুগের যাবতীয় পরিচিত ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, মানব-ভূগোলবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মধ্যযুগে পরিচিত তথ্যের একটিকেও তিনি বাদ দেননি, বরং প্রতিটি তথ্যকে তার এই বিশ্বকোষে সংকলন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি শহরগুলোর তুলনামূলক আয়তন এবং সেগুলোর গুরুত্ব, এসব শহরে বসবাসকারী বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম ইত্যাদিকে স্থান দিয়েছেন। এই মহান জ্ঞানী পৃথিবীকে যতটা ভালোবেসেছেন, অন্য কেউ ততটা ভালোবেসেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৪০৮]

গুস্তাভ লি বোঁ বলেছেন, ভূগোলবিদ্যার ওপর আরবদের রচিত যেসব গ্রন্থ আমরা পেয়েছি তার গুরুত্ব অপরিসীম। এসব গ্রন্থের কয়েকটি ইউরোপে বহু শতাব্দীব্যাপী ভূগোলবিদ্যার পঠনপাঠনের মৌলিক ভিত্তি ছিল।[৪০৯]

লি বোঁ আরও বলেন, শরিফ আল-ইদরিসি পৃথিবীর যে-মানচিত্র অঙ্কন করেন তার চিত্র আমি প্রকাশ করেছি। এই মানচিত্রে নীলনদ ও বড় বড় ট্রপিক্যাল লেকের উৎস সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে। এসব স্থান সম্পর্কে ইউরোপীয়রা এই আধুনিক কালের আগ পর্যন্ত কোনো সন্ধান পায়নি। আল-ইদরিসির এই মানচিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তার এই মানচিত্রে প্রমাণিত হয় যে, মহা-আফ্রিকার ভূগোল সম্পর্কে আরবদের জ্ঞান ছিল দীর্ঘকাল ধরে যা ধারণা করা হতো তার চেয়ে অনেক বেশি।[৪১০]

---

৪০৮. উইল ডুরান্ট, *'কিস্সাতুল হাদারাহ'*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৭।

৪০৯. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৬৯।

৪১০. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৭০।

ইসলামি মানচিত্রাবলি এবং সমুদ্রবিজ্ঞানের ওপর মুসলিমদের রচনাবলি পাশ্চাত্য নৌ-চলাচলবিদ্যার অগ্রগতিতে পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪১১]

সামুদ্রিক অভিযান ও আমেরিকা আবিষ্কার

মুসলিমদের সামুদ্রিক অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো আমেরিকা আবিষ্কার। যার কৃতিত্ব দেওয়া হয় ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে[৪১২] যে, তিনি ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। মুসলিমরা পৃথিবীর গোলকাকৃতির বিষয়টি ঘোষণা করলেন এবং তা গাণিতিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক দলিল-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করলেন। তারপর তাদের রচনাসমূহে এমন ইঙ্গিত প্রকাশ পেতে শুরু করল যে, ভূ-গোলকের অপর পৃষ্ঠে অবশ্যই আবাদিত জনপদ রয়েছে, যা এখনো অনাবিষ্কৃত। এই তাত্ত্বিক ধারণার একটি ভিত্তি ছিল। তা এই যে, এটা কখনো বোধগম্য নয় যে পৃথিবীর একটি পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ এবং অপর পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে জলভাগ। কারণ তা পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করবে এবং তার ঘূর্ণায়মানতা ও আবর্তনের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাবে।[৪১৩]

আল-বিরুনি প্রথম এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং তার গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু হয়। বড় বড় মুসলিম ভূগোলবিদদের রচনাবলিতে এসব অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল-মাসউদি[৪১৪] কর্তৃক রচিত '*মুরজুয-যাহাব ওয়া*

---

[৪১১]. মার্টিন প্লেসনার, *মাবহাসুল উলুম*, যোসেফ শাখ্ত (Joseph Franz Schacht) ও ক্লিফোর্ড বসওর্থ (Clifford Edmund Bosworth) কর্তৃক সম্পাদিত *The Legacy of Islam*, আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام, খ. ২, পৃ. ১৫৪।

[৪১২]. ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬ খ্রি.) বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকা, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করা হয়। তিনি প্রচণ্ড ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্পেনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪১৩]. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৯৬-৩৯৭।

[৪১৪]. আল-মাসউদি : আবুল হাসান আলি ইবনুল হুসাইন ইবনে আলি (২৮৩-৩৪৬ হি./৮৯৬-৯৫৭ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, পর্যটক, অনুসন্ধানী। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন, কায়রোতে বসবাস করতেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। مروج الذهب ومعادن الجوهر তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২১, পৃ. ৬-৭; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ২৭৭।

মাআদিনুল জাওহার' এবং শরিফ আল-ইদরিসি কর্তৃক রচিত *'নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক'* ইত্যাদি।

বিদ্যমান তথ্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে, খাশখাশ ইবনে সাইদ আল-বাহরি নামের একজন আরব আন্দালুসীয় নাবিক ২৩৫ হিজরিতে (৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে) তার নৌযান চালিয়ে লিসবন থেকে পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরে এগিয়ে যান। তিনি সাগরে একটি আবাদিত দ্বীপ আবিষ্কার করেন, যেখানে বহু বাসিন্দা রয়েছে। তিনি তাদের থেকে উপঢৌকন এনে আন্দালুসের শাসক দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সামনে পেশ করেন। পুরস্কারস্বরূপ আবদুর রহমান খাশখাশকে ইসলামি নৌবহরের আমির নিযুক্ত করেন। এই নাবিক পরে ভাইকিংদের[৪১৫] সঙ্গে একটি সমুদ্রযুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।[৪১৬] তিনিই আমেরিকার আবিষ্কারক হিসেবে প্রতীয়মান হন।

বিদ্যমান তথ্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চিম আফ্রিকার (মরক্কোর) আরবদের একটি দল আটলান্টিক মহাসাগরে বেরিয়ে ওই দ্বীপে যায়। এটা হিজরি চতুর্থ শতক এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতকের ঘটনা। কিন্তু তাদের কেউই ফিরে আসে না এবং তাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদও জানা যায় না। তারপর তাদের ঘিরে 'অভিযাত্রী যুবকেরা' (قصة الفتية المُغَرَّرِين) নামে একটি গল্প তৈরি হয়। অভিযাত্রী যুবকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আল-মাসউদি ও আল-ইদরিসি। এই গল্প থেকে জানা যায় যে, লিসবন শহরে আটজন আরব যুবক আটলান্টিক মহাসাগরে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সবাই ছিল একটি নাবিক পরিবারের সদস্য। তারা ওই দ্বীপটি খুঁজে বের করতে চায় যেখানে তাদের পূর্বসূরিরা গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাদের সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানা যায়নি। ফলে শহরবাসী তাদের 'অভিযাত্রী তরুণদল' (الفتية

---

৪১৫. ভাইকিং (Viking) বলতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সমুদ্রচারী ব্যবসায়ী, যোদ্ধা ও জলদস্যুদের একটি দলকে বোঝায়, যারা ৮ম শতক থেকে ১১শ শতক পর্যন্ত ইউরোপের এক বিরাট এলাকাজুড়ে লুটতরাজ চালায় ও বসতি স্থাপন করে। এদেরকে নর্সম্যান বা নর্থম্যানও বলা হয়। ভাইকিংরা পূর্ব দিকে রাশিয়া ও কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌছেছিল।

৪১৬. আল-মাসউদি, *মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*, খ. ১, পৃ. ১১৯।

(المغررين) উপাধিতে আখ্যায়িত করে। এখানে المغرر শব্দটা এসেছে الغُرَة ধাতু থেকে, যার অর্থ অগ্রযাত্রা বা অভিযাত্রা। শব্দটি الغرور ধাতু নিষ্পন্ন المغرورين (আত্মপ্রবঞ্চিত) নয়, যদিও কোনো কোনো তথ্যসূত্রে এ শব্দটিই রয়েছে। আল-মাসউদি তার *'মুরুজুয-যাহাব'* গ্রন্থে 'যারা আটলান্টিক মহাসাগর ভ্রমণে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা বেঁচে গিয়েছিল ও যারা ধ্বংস হয়েছিল এবং তারা যা দেখেছিল সেই সম্পর্কিত সংবাد' (أخبار من خاطر بنفسه في ركوبه -أي المحيط الأطلسي- ومن نجا منهم ومن تلف، وما شاهدوا منه وما رأوا) শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আল-ইদরিসিও এই গল্পের অবতারণা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই আটজন যুবক আন্দালুসে ফিরে এলে লিসবনের বাসিন্দারা তাদের ঘিরে ধরে। নানা ধরনের সাজসজ্জা ও আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে তাদের অভিনন্দন জানায়। এই যুবকেরা যে সড়কে বসবাস করত সেই সড়কের নাম দেয় 'অভিযাত্রী তরুণদের সড়ক'। এটা খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। তারপর লিসবনে এই নামটি কয়েকশ বছর ধরে পরিচিত ছিল।-অনুবাদক

আবু উবাইদুল্লাহ আল-আন্দালুসি

আবু উবাইদুল্লাহ আল-বাকরি আল-আন্দালুসি (মৃ. ৪৮৭ হি.) তার *'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক'* গ্রন্থে লিসবনের আরব অভিযাত্রী যুবকদের কাহিনি উল্লেখ করেছেন, যারা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। তিনি তাদের ফিরে আসার পরের কাহিনি উল্লেখ করেছেন। ফিরে এসে তারা জানায় যে, ওখানে তাদের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে তারা আরবিতে কথাবার্তা বলে। তারা ওই ভূমিখণ্ডের বর্ণনাও দেয়, সেটি ছিল ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কলম্বাসের আমেরিকায় পৌঁছার তিনশ বছর আগে থেকেই সেখানে মুসলিমরা ছিল।

শিহাবুদ্দিন আল-আরাবি আল-উমারি (১৩০০-১৩৪৯ খ্রি.) খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তার ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ *'মাসালিকুল আবসার ওয়া মামালিকুল আমসার'* রচনা করেন। এটি মোট ২৭ খণ্ডে

রচিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মালি সাম্রাজ্য ছিল ইসলামি শাসনাধীন, মানসা মুসা (মুসা অব মালি) তা শাসন করতেন। মানসা মুসা ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন আল-উমারির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং তাকে মালির নবম সম্রাটের কাহিনি বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন মানসা মুসার বড় ভাই ও তার পূর্ববর্তী সম্রাট। তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে শাসনকার্যই ছেড়ে দেন। আটলান্টিকের ওপারে কী রয়েছে তা তিনি দেখতে চান। এই সংকল্পে তিনি ২০০ জাহাজ ও ২০০০ নৌকা প্রস্তুত করেন। এগুলোতে শুকনো খাবার ও স্বর্ণ বোঝাই করেন। এটা কলম্বাসের আমেরিকায় পৌঁছার ১০০ বছর আগের ঘটনা।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, আমেরিকায় প্রকৃতপক্ষেই আফ্রিকান মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল। কলম্বাসের নিজের একটি পাণ্ডুলিপিতে মার্কিন ভূখণ্ডে আফ্রিকানদের উপস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তারা সোনা গলাত।-অনুবাদক

আরবরাই যে আমেরিকা আবিষ্কারে এগিয়ে ছিলেন তা-ই আন্দালুসের ভূগোলবিদদের রচনা থেকে স্পষ্ট হয়। ঐতিহাসিক ও ভাষাবিজ্ঞানী আল-আব্ আনাসতাস মারি আল-কারমালির[৪১৭] বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি আরও জোরালো হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিমরা কলম্বাসের বহু পূর্বেই লিসবন থেকে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। কারণ তারা আটলান্টিক মহাসাগরে উষ্ণ গলফ স্ট্রিম (Gulf Stream red—hot) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেন, অন্যান্য সব জাতি থেকে আরব জাতিই এই স্ট্রিম ও তার বৈশিষ্ট্যাবলি জানার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। তা মেক্সিকো থেকে কীভাবে আয়ারল্যান্ডে যায় এবং আয়ারল্যান্ড থেকে কীভাবে মেক্সিকোতে ফিরে আসে সেই সম্পর্কে তাদেরই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান ছিল।[৪১৮]

---

৪১৭. আল-আব্ আনাসতাস মারি আল-কারমালি (Al-Ab Anastas Mari Al-Karmali) : তিনি বুতরুস জিবরাইল ইউসুফ আওয়াদ (১২৮৩-১৩৬৬ হি./১৮৬৬-১৯৪৭ খ্রি.) লেবানিজ খ্রিষ্টান পুরোহিত ও আরবি ভাষাবিজ্ঞানী সাহিত্যিক। আরবের দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আরবি ভাষাবিজ্ঞানে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৫।

৪১৮. الأب انستاس ماري الكرملي : عرف العرب أمريكا قبل أن يعرفها الغرب, আল-মুকতাতাফ সাময়িকীতে প্রকাশিত, সংখ্যা ১০৬। আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ তার أثر العرب في الحضارة الأوروبية বইতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, পৃ ৪৭।

মুসলিমগণ আমেরিকার আবিষ্কারক, এ ব্যাপারে যা বলা হলো তার চেয়েও স্পষ্ট, বিস্ময়কর ও প্রভাবসঞ্চারী হলো ওই মানচিত্র যা জার্মান প্রাচ্যবিদ পল আর্নেস্ট কাহলে[৪১৯] তুরস্কের তোপকাপি প্যালেস গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করেছেন। কয়েক বছরব্যাপী আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই মানচিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। এই মানচিত্র বিজ্ঞানীদের মাথা খারাপ করে দেয়, গোটা বিশ্বকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে ফেলে। এই মানচিত্র ছিল তুর্কি মুসলিম ভূগোলবিদের রচিত, তিনি হলেন পিরি রেয়িস (Piri Reis)[৪২০]। তার পূর্ণনাম মুহিউদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ আর-রেয়িস। তিনি ছিলেন তুর্কি নৌবহরের অন্যতম নৌকমান্ডার। তিনি ছিলেন সেই সময়ের 'মাস্টার অফ দা সি'। তার মানচিত্রটি মূলত কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্রে বিভক্ত। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বাংশকে বর্ণনা করেছে, যেখানে রয়েছে স্প্যানিশ ও পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলসমূহ। আপনি যদি এই মানচিত্রে আটলান্টিকের পশ্চিমাংশকে দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সেখানে রয়েছে আমেরিকান ভূখণ্ড, তার উপকূলসমূহ ও দ্বীপসমূহ, বন্দর ও জীবজন্তু। আরও রয়েছে রেড ইন্ডিয়ানদের চিত্র, তাদেরকে তিনি চিত্রিত করেছেন নগ্ন অবস্থায় এবং তারা মেষ চরাচ্ছে।

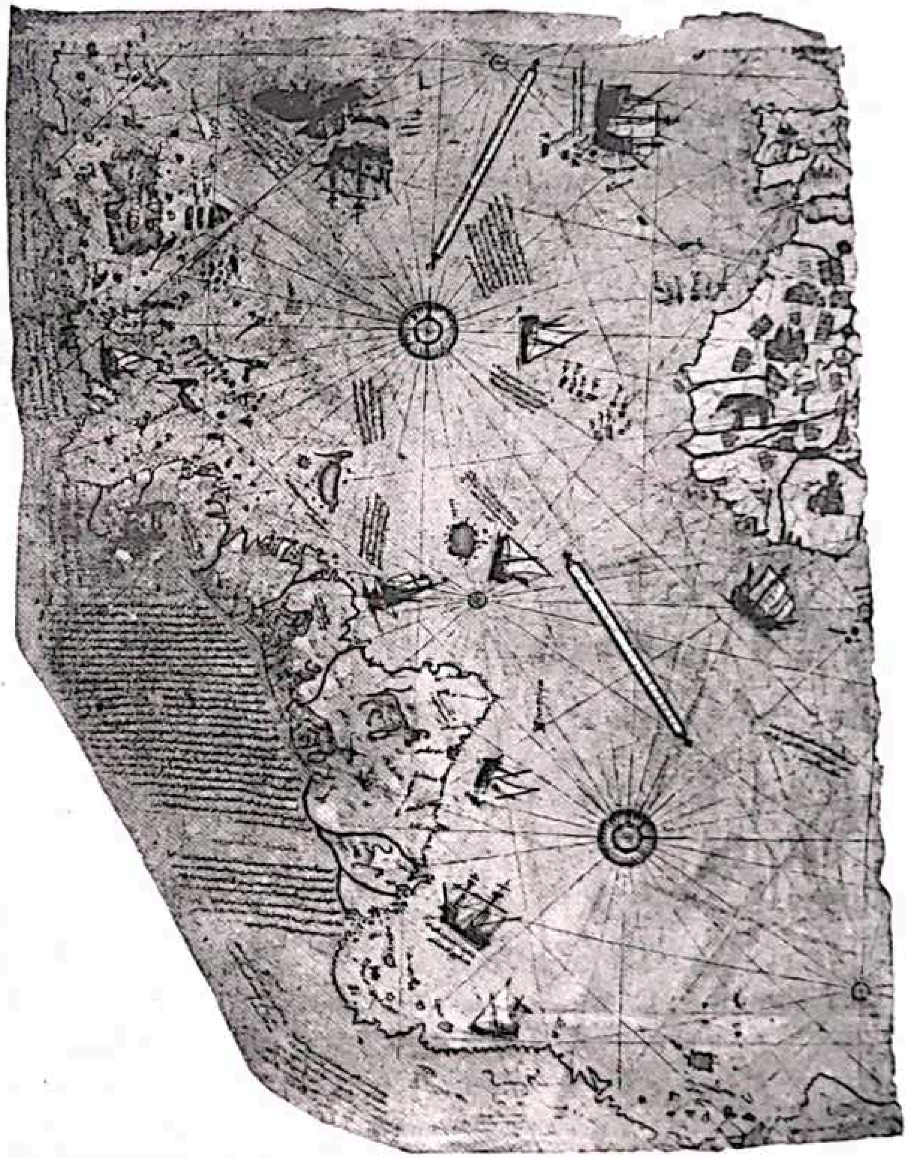
রুশ-সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ ও আরবি ভাষাবিদ ইগন্যাটি ইয়ুলিয়ানোভিচ ক্র্যাচকোভ্স্কি (Ignaty Yulianovich Krachkovsky) তার تاريخ الأدب الجغرافي العربي গ্রন্থে এই মানচিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, পিরি রেয়িস তার মানচিত্র কলম্বাসের মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন। তুর্কি নৌবহর ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন ভেনেটিয়ান

---

৪১৯. পল আর্নেস্ট কাহলে (Paul Ernst Kahle 1875-1964) : বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ। মারবুর্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যের ভাষা শেখেন। প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন রোমানিয়া ও কায়রোতে। কায়রোতে ভাষাতত্ত্বের ওপরও অধ্যয়ন করেন।

৪২০. পিরি রেয়িস : মুহিউদ্দিন ইবনে মুহাম্মাদ আর-রেয়িস (৮৭৭-৯৬২ হি./১৪৭০-১৫৫৫ খ্রি.)। উসমানি নৌসেনাপতি, নাবিক, ভূগোলবিদ ও মানচিত্রাঙ্কনবিদ। ১৫০০ সালে মাওদান সমুদ্রযুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিশ্বের দুটি মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *কিতাবু বাহরিয়্যাহ*।

নৌবহরকে পরাজিত করে এবং তাদের কয়েকটি জাহাজ আটক করে তখন হয়তো কলম্বাসের মানচিত্র পিরি রেয়িসের হাতে এসে থাকবে।[৪২১]



চিত্র নং-১২
মহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্র

কিন্তু অধিকাংশ গবেষকই ক্র্যাচকোভ্স্কির এই মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন। কারণ পিরি রেয়িসের মানচিত্রে এমন সব জায়গার বর্ণনা ছিল যা কলম্বাস জানতেনই না এবং তার সেগুলো আবিষ্কারেরও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এ সকল গবেষক বিকল্প বিচার-

---

৪২১. ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি*, খ. ২, পৃ. ৫৬২।

বিশ্লেষণ করেননি যার দ্বারা এই রহস্যময় মানচিত্রের রহস্য উন্মোচিত হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তা এই যে, ১৯৫২ সালে ব্রাজিলীয় নিউজপেপারগুলো একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, বিবৃতিটি দেন ড. জাগরিস, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব দা উইটওয়াটারস্র্যান্ড-এর সামাজিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার (social archaeological sciences) অধ্যাপক। (অ্যারাবিয়ান বিজনেস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী) বিবৃতিতে বলা হয়, ইতিহাসের গ্রন্থাবলি আমেরিকা আবিষ্কারের বিষয়টিকে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বড় ভুল করেছে। তার কারণ, কলম্বাসের কয়েকশ বছর পূর্বে প্রকৃতপক্ষে আরবরাই[৪২২] (আরব মুসলিমরাই) আমেরিকা আবিষ্কার করেছে।[৪২৩] অধ্যাপক ড. জাগরিসের ছয় বছরব্যাপী পরিচালিত গবেষণার ভিত্তি ছিল মানব-কাঠামো পরীক্ষানিরীক্ষা, যা ব্রাজিলীয় গ্রেনাডায় (Grenada) আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৪২৪]

---

৪২২. প্রফেসর ইভান ভান সারটিমা (Ivan Van Sertima) তার ১৯৭৬ সালে রচিত *They Came Before Columbus : The African Presence in Ancient America* গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। কলম্বাসের নিজের কথা থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আরবরাই প্রথম আমেরিকায় পৌঁছেছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন ওই দ্বীপে যেসব রেড ইন্ডিয়ানদের দেখেছেন তারা মূলত আরব বংশোদ্ভূত, তার আগেই তারা ওখানে পৌঁছেছিল। আরবদের পাণ্ডুলিপি থেকেই তিনি এসব তথ্য জেনেছিলেন। ব্রিটিশ রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি The Discoverers নামে একটি ডকুমেন্টারি টিভি সিরিজ তৈরি করেছে। এখানে একটি পর্ব ছিল কেবল কলম্বাস ও তার আবিষ্কার সম্পর্কে। তা থেকে জানা যায় যে, তিনি আরবি ভাষা জানে এমন একজনকে তার সহযাত্রী মনোনীত করেছিলেন। অর্থাৎ লোকটা ছিল আরব বংশোদ্ভূত। তিনি এই লোককে দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের সর্দারের কাছে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিটি ছিল আরবি ভাষায় লেখা। চিঠিতে কলম্বাস বলেন, হে মহামান্য, স্পেন ও ক্যাস্টাইল রাজ্যের রানি, রানি ইসবালে আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। তিনি স্পেন ও ক্যাস্টাইল রাজ্য এবং আপনার দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।-অনুবাদক

৪২৩. ড. আবদুর রহমান হামিদাহ, *আলামুল জুগরাফিয়্যিনাল আরব*, পৃ. ২২৫।

৪২৪. শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫০০।

দক্ষিণ মেরুতে ষষ্ঠ মহাদেশ আবিষ্কার

মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস (পিরি রেয়িস)-এর মানচিত্রে বিস্ময়কর এমন কিছু ছিল, যার ফলে তা মহাকাশ ভ্রমণ ও স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীর ছবি উত্তোলনের যুগ শুরু হওয়ার পরও বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত রেখেছে। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ও ইউরোপে মানচিত্রাঙ্কনবিদদের প্রথম বিশ্বাস ছিল যে পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলো ততটা সূক্ষ্ম ও যথার্থ নয়, বরং এর চিত্রাঙ্কনে বেশ ভুলত্রুটি রয়েছে। মার্কিন উপকূলীয় অঞ্চল সম্পর্কে তাদের সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এমনই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু যখন প্রথমবার স্যাটেলাইট থেকে এসব অঞ্চলের ছবি তুলে তা প্রকাশ করা হয় তখন তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কারণ তারা এতদিন পর্যন্ত যা ভেবেছেন ও চিন্তা করেছেন মুহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্রই তার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম ও যথার্থ! তা পরিপূর্ণরূপেই স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ! বরং তাদের তথ্যাবলিই ভুল। এর ফলে নাসায় (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) একদল বিজ্ঞানী মুহিউদ্দিন আর-রেয়িসের মানচিত্রগুলোর পুনর্নিরীক্ষণ করেন, সেগুলো বারবার বড় করে দেখেন। এবার তারা দ্বিতীয়বারের মতো বিমূঢ় হন। কারণ মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস তার মানচিত্রে দক্ষিণ মেরুতে ষষ্ঠ মহাদেশ নির্দেশ করেছেন, যার নাম এন্টার্কটিকা (Antarctica)। এটি তাদের এন্টার্কটিকা আবিষ্কারের দুইশ বছরেরও আগের ঘটনা। মুহিউদ্দিন আর-রেয়িস এন্টার্কটিকার পাহাড়সমূহ ও উপত্যকাসমূহের বর্ণনাও দিয়েছেন, যেগুলো ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

পিরি রেয়িসের মানচিত্রের সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা

সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেন (Erich von Däniken) *Zuvi Chariots of the Gods? Unsolved Mysteries of the Past* নামক বইয়ে[৪২৫] বলেছেন, পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলো মার্কিন মানচিত্রাঙ্কনবিদ ও নাবিক আর্লিংটন ম্যালেরির (Arlington H. Mallery) কাছে পেশ করা হয়। তিনি মানচিত্রগুলোর সূক্ষ্ম পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের

---

৪২৫. বইটির ইংরেজি অনুবাদ, *Memories of the Future: Unsolved Mysteries of the Past*. মূল জার্মান থেকে বইটির অনুবাদ করেছেন মাইকেল হেরন।

পর সিদ্ধান্ত দেন যে, এগুলো (আমেরিকা-সম্পর্কিত) যাবতীয় ভৌগোলিক তথ্য ও বাস্তবতাকে ধারণ করেছে। তবে তার সন্দেহ থেকে যায় যে, এখানে একটি ভুল থেকে গেছে অথবা কোনো কোনো স্থান-নির্দেশ যথার্থ হয়নি। ফলে তিনি মার্কিন নৌবহরের হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরোর মানচিত্রাঙ্কনবিদ মিস্টার ওয়ালটার্স (Mr. Walters)-এর শরণাপন্ন হন। তারা উভয়ে স্থান-নির্দেশক সংখ্যাঙ্কিত বর্গজালি তৈরি করেন এবং মানচিত্রগুলোকে একটি আধুনিক গ্লোবে রূপান্তরিত করেন। এভাবে তারা চাঞ্চল্যকর সব তথ্য আবিষ্কার করেন। মানচিত্রগুলো সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। কেবল ভূমধ্যসাগর ও মৃতসাগরই নয়, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল এবং এন্টার্কটিকা সংলগ্ন অঞ্চলগুলোও পিরি রেয়িসের মানচিত্রে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মূলত ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (Topographic Map), এতে বিস্ময়কর সূক্ষ্মতায় অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরীণ ভূ-সংস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে পাহাড়-পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, নদীনালা, মালভূমি ইত্যাদির স্পষ্ট ও নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেন এগুলোর চিত্র মহাকাশ থেকে ধারণ করা হয়েছে![৪২৬]

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন গ্রেট অবজারভেটরি ও মার্কিন সমুদ্র-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে একদল ভূগোলবিজ্ঞানী পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর ওপর অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালান। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার পর তারা দেখেন যে ষষ্ঠ মহাদেশ এন্টার্কটিকার চিত্র বিস্ময়কর পর্যায়ে বিশুদ্ধ ও যথার্থ। এমনকি আমাদের বর্তমান যুগেও যেসব স্থান পরিপূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়নি তারও বর্ণনা রয়েছে পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোতে! দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের পর্বতরাশির অস্তিত্ব ১৯৫২ সালের আগে আবিষ্কৃত হয়নি। এগুলো সবসময়ই পুরু বরফের স্তরে ঢাকা থাকে। আধুনিক মানচিত্রগুলোতে এসব পর্বত আবিষ্কার করা হয়েছে ইকো-সাউন্ডিং যন্ত্রপাতি (Echo-Sounding apparatus) ব্যবহার করে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, দক্ষিণ মেরু অঞ্চল অর্থাৎ

---

৪২৬. এরিক ফন দানিকেন, *Chariots of the Gods?*, আরবি অনুবাদ, عربات الآلهة, অনুবাদক, আদনান হাসান, পৃ. ২৯।

এন্টার্কটিকার উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় মহাকাশযান থেকে ভূ-গোলকের যেসব চিত্র ধারণ করা হয়েছে তার সঙ্গে এসব মানচিত্র সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহাকাশযান থেকে পাঁচ হাজার মাইলব্যাপী অঞ্চলের চিত্র ধারণ করা হয়েছে। তা ছাড়া তারা স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত চিত্রসমূহ ও পিরি রেয়িসের মানচিত্রগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস্য মিল খুঁজে পেয়েছেন![৪২৭]

স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত নৌপথ আবিষ্কার

আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি (মৃ. ১৪১৮) তার *সুবহুল আ'শা* গ্রন্থে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগের বিষয়টি যথার্থভাবে বর্ণনা করেছেন। তার এই বক্তব্য থেকে মুসলিমরা যে ভাস্কো দা গামার[৪২৮] আগেই এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন তা স্পষ্ট হয়। তিনি আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে বলেছেন, এই মহাসাগর মরোক্কান উপকূল থেকে জিব্রাল্টার প্রণালির—যা আন্দালুস ও মরক্কোকে বিভক্ত করেছে—পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়েছে এবং বার্বারদের অঞ্চল লামতুনা মরুভূমি অতিক্রম করেছে। আল-কালকাশান্দি তারপর সমুদ্রপথের বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর তা জিবালুল কামারের (Dhofar Mountains) পেছন দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়েছে। জিবালুল কামার থেকে মিশরের নীলনদের উৎস শুরু হয়েছে। এর আলোচনা পরে আসবে। এভাবে আটলান্টিক মহাসাগর ভূমি থেকে দক্ষিণমুখী হয়েছে এবং আরদু খারাব (ওয়াস্টল্যান্ড)-এর ওপর দিয়ে ও যান্‌জ (Zanj) দেশের পেছন দিয়ে (সহিলি উপকূলকে বামে রেখে) পূর্বদিকে এগিয়েছে, তারপর পূর্বে ও উত্তরে বিস্তৃত হয়ে ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।[৪২৯]

ইগন্যাটি ক্র্যাচকোভ্স্কি উল্লেখ করেছেন যে, একজন আরব নাবিক ভাস্কো দা গামা যে ভ্রমণ করেছেন সেই একই ভ্রমণ করেছেন ১৪২০ খ্রিষ্টাব্দে,

---

৪২৭. আহমাদ শাওকি আল-ফানজারি,
http://www.islamset.com/arabic/asc/fangry1.html.

৪২৮. ভাস্কো দা গামা (১৪৬৯-১৫২৪ খ্রি.) ছিলেন পর্তুগিজ অনুসন্ধানকারী ও পর্যটক। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ভারত আসেন। তার এই সমুদ্রপথ আবিষ্কার বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদে নতুন মাত্রা যোগ করে। তিনি ভারতের কোচিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৪২৯. আবুল আব্বাস আল-কালকাশান্দি, *সুবহুল আ'শা*, খ. ৩, পৃ. ২৩৭।

তবে উলটোপথে, তিনি ভারত মহাসাগরের একটি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং আফ্রিকার চারপাশ ঘুরে আটলান্টিক মহাসাগরে মরক্কোর বন্দরে পৌঁছেন। এটি ভাস্কো দা গামার জন্মেরও ৪৭ বছর আগের ঘটনা।[৪৩০]

ভাস্কো দা গামা তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে, ভ্রমণকালে যে-সকল আরব নাবিকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তারা উন্নতমানের কম্পাস রাখতেন জাহাজের দিক-নির্দেশনার জন্য। তাদের সঙ্গে পর্যবেক্ষণযন্ত্রও থাকত, থাকত সামুদ্রিক মানচিত্রও। বিভিন্ন সময়ে তিনি তাদের শরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি আরব নাবিকদের কিছু মানচিত্র পর্তুগালের সম্রাট ম্যানুয়েলের (Manuel I of Portugal) কাছে পাঠিয়ে দেন। আরেকজন মুসলিম নাবিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তার নাম মুআল্লিম কানা। তিনি মালিন্ডির বাসিন্দা ছিলেন। তিনিই ভাস্কো দা গামার জাহাজকে মালিন্ডি[৪৩১] থেকে ভারতের কালিকোট বন্দরে পৌঁছে দেন। অন্যান্য তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ভাস্কো দা গামার জাহাজ চালিয়ে নিয়ে আসেন তিনি হলেন আরব মুসলিম ভূগোলবিদ ও নাবিক ইবনে মাজেদ[৪৩২]। তিনিই কম্পাস আবিষ্কার করেছিলেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, পরবর্তী মুসলিমদের অঙ্কিত মানচিত্রগুলোতে—যেমন আল-মাসউদির মানচিত্র ও আল-ইদরিসির মানচিত্র—আফ্রিকাকে ঘিরে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের সংযোগ-ব্যবস্থার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এসব সামুদ্রিক অঞ্চল আরব নৌবহরের দ্বারা আবাদিত ছিল। এসব নৌবহর ভারত ও পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে যাওয়া-আসা করত।[৪৩৩]

ভূগোলবিদ্যায় মুসলিমদের প্রচেষ্টা ও তাদের চারপাশের ভূ-অঞ্চল আবিষ্কারের যে কাহিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়লে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তাদের সেসব প্রচেষ্টার ফল কত-না উজ্জ্বল, কত-না চমৎকার!

---

৪৩০. ক্র্যাচকোভ্স্কি, *তারিখুল আদাবিল জুগরাফিয়্যিল আরাবি*, খ. ২, পৃ. ৫৬৩।

৪৩১. মালিন্ডি উপসাগরের তীরবর্তী গালানা নদীর মুখে অবস্থিত একটি শহর।

৪৩২. ইবনে মাজেদ : আহমাদ ইবনে মাজেদ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাজদি (১৪৩২-১৪৯৮ খ্রি.)। উপাধি : সমুদ্রসিংহ ও ধাবমান নক্ষত্র। আরবের শ্রেষ্ঠ নাবিকদের অন্যতম। মানচিত্রাঙ্কনবিদ। নৌবিজ্ঞানী ও নৌ-ইতিহাসবিদ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২০০।

৪৩৩. বিস্তারিত দেখুন, হুসাইন মু'নিস, *আতলাসু তারিখিল ইসলাম*, পৃ. ১২ ও তার পরবর্তী।

আরবের গুরুত্বপূর্ণ ভূগোলবিদ ও তাদের রচিত গ্রন্থসমূহের পরিসংখ্যান ব্যাপক ও বিস্তৃত বর্ণনার দাবি রাখে। আবুল ফিদা[৪৩৪] একাই ষাটজন ভূগোলবিদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তার পূর্বে।...ইউরোপীয়রা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের প্রতি (বিদ্বেষভাবাপন্ন) চিন্তাভাবনা আঁকড়ে ধরে লালন না করত, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে, তাহলে ইউরোপের ভূগোলবিদ্যার বড় বড় পণ্ডিতরা কেন মুসলিমদের অবদানকে অস্বীকার করে তার কারণ উদ্‌ঘাটন করা দুষ্কর হতো। তা সত্ত্বেও আরবরা যেসব বড় বড় কাজ করেছেন তা তাদের কদর ও মূল্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কারণ আরবরাই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করেছেন, যা মানচিত্রবিদ্যার প্রধান ভিত্তি।[৪৩৫]

এগুলোও আমাদের কথা নয়, বরং গুস্তাভ লি বোঁর কথা।

---

[৪৩৪] আবুল ফিদা : ইসমাইল ইবনে আলি ইবনে মাহমুদ ইবনে শাহেনশাহ (৬৭২-৭৩২ হি./১২৭৩-১৩৩১ খ্রি.)। আল-মালিক আল-মুআইয়াদ, হামার অধিপতি। ভৌগোলিক ইতিহাসবিদ। দখল ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানেও। تقويم البلدان ও المختصر في أخبار البشر তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১০৪; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ৩১৯।

[৪৩৫]. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৭১।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞান মুসলিমদের কাছে অনেকাংশে তাদের ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। ভৌগোলিক অবস্থান ও ঋতুর ভিন্নতা অনুযায়ী নামাযের সময় নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পড়ে। কেবলার দিক নির্ধারণেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হতে হয়। রোযার সূচনা, হজ ও অন্যান্য বিষয়ের সময় নির্ধারণের জন্য চাঁদের চলাচলও পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্যার ওপর কুরআনের গুরুত্বারোপ

কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে যা মহাকাশ ও মানুষকে পরিবেষ্টনকারী মহাবিশ্ব সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, কুরআন আকাশ ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে তার ওপর অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

তাদের জন্য রাত এক নিদর্শন, তা থেকে আমি দিবালোককে অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, তা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন

মনযিল।[৪৩৬] অবশেষে তা শুকনো বাঁকা পুরাতন খেজুরশাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।[৪৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ إِنَّ فِى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ﴾

তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও (মাসসমূহের) হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ তা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এইসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিশ্চয় দিবস ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকি সম্প্রদায়ের জন্য।[৪৩৮]

তারপর কুরআন আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট তারকা ও নক্ষত্রের নাম ধরে তাদের উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ○ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ○ النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾

শপথ আকাশের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার, তুমি কি জানো রাতে যা আবির্ভূত হয় তা কী? তা উজ্জ্বল নক্ষত্র![৪৩৯]

---

৪৩৬. مَنَازِل শব্দটি مَنْزِل শব্দের বহুবচন। আরবি জ্যোতির্বিজ্ঞানে চান্দ্রমাসকে ২৮টি মনযিলে ভাগ করা হয়েছে। চান্দ্রমাসের এই মনযিলকে বাংলায় তিথি বলে।

৪৩৭. সুরা ইয়াসিন : আয়াত ৩৭-৪০।

৪৩৮. সুরা ইউনুস : আয়াত ৫-৬।

৪৩৯. সুরা তারিক : আয়াত ১-৩।

তিনি আরও বলেন,

﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾

আর এই যে, তিনি শিরা[৪৪০] নক্ষত্রের মালিক।[৪৪১]

আরও ব্যাপার আছে। কুরআন যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর অগাধ ও বিস্তৃত জ্ঞান থাকা ছাড়া কারও পক্ষে সেগুলো বোঝা বা সেগুলো ব্যাখ্যার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মনোযোগ ও প্রযত্ন আবশ্যক করে তোলে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিমদের মনোনিবেশ

মুসলিমরা তাদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর শুরুতে পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর বিজ্ঞানীরা যে উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন তার ওপর নির্ভর করেছেন। প্রথমেই তারা গ্রিক, ক্যালডিয়ান (Chaldean), সুরয়ানি, পারসিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলোর অনুবাদ করেছেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রথম যে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন সেটি হলো হার্মেস আল-হাকিম[৪৪২] কর্তৃক রচিত, অনূদিত গ্রন্থটির নাম '*মাফাতিহুন নুজুম*'। তারা গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। এটা উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিকের ঘটনা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর গ্রিক থেকে অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে আরও ছিল টলেমির *আল-মাজেস্ট* (*Almagest*)। আরবিতে এটির নাম হয় كتاب المجسطي। এটি জ্যোতির্বিদ্যা ও নক্ষত্ররাজির সঞ্চরণের ওপর রচিত। এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল আব্বাসি খিলাফতকালে।[৪৪৩]

---

৪৪০. শিরা একটি নক্ষত্রের নাম, একে একটি সম্প্রদায় পূজা করত। বাংলায় 'লুব্ধক', ইংরেজিতে 'Sirius'.

৪৪১. সুরা নাজম : আয়াত ৪৯।

৪৪২. হার্মেস আল-হাকিম (Hermes Trismegistus): একজন গ্রিক ব্যক্তিত্ব। সত্য ও কল্পকাহিনির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে তার ব্যক্তিত্ব।

৪৪৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩৪৮।

মুহাম্মাদ মুসা ইবনে শাকির

আব্বাসি যুগে তিনজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তারা বানু মুসা ইবনে শাকির (মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা) নামে পরিচিত। এই মুসা ইবনে শাকির ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। খলিফা আল-মামুনের দরবারে থাকতেন। তিনি মারা গেলে আল-মামুন তার পুত্রদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেন। তারা তখন ছোট ছিল। তিনি তাদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াহইয়া ইবনে মানসুরের কাছে ন্যস্ত করেন। এই ছোট ছেলেরা যখন বড় হয়ে উঠছিল তখন আল-খাওয়ারিজমি বাগদাদের বাইতুল হিকমায় বসে টলেমির ভ্রান্তিগুলোর সংশোধন করছিলেন। তিনি তখন বাইতুল হিকমায় বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই ছোট শিশুরা যুবকে পরিণত হলে তাদের মধ্যে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির। খলিফা আল-মামুন তার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য বাগদাদের উপকণ্ঠে সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করে দেন। বাব আশ-শামাসিয়্যার কাছাকাছিই ছিল এটির অবস্থান। বৈজ্ঞানিকভাবে ও সূক্ষ্মরূপে নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ ও বিস্ময়কর হিসাবনিকাশ তৈরির উদ্দেশ্যেই এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সে সময় গুনদেশাপুরেও[৪৪৪] একটি মানমন্দির ছিল। তিন বছর পর দামেশকের সন্নিকটে কাসিয়ুন পাহাড়ের ওপর আরেকটি মানমন্দির স্থাপন করা হয়। বাগদাদের মানমন্দিরকে এ দুটির সঙ্গে তুলনা করা হতো এবং এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তারকা-সারণি তৈরির জন্য বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কাজ করতেন। এসব তারকা-সারণির নাম হতো 'আল-মুজাররাবা' বা 'আল-মামুনিয়্যাহ'। এগুলো ছিল টলেমির প্রাচীন তারকা-সারণির সূক্ষ্ম ও যথার্থ সংস্কার।[৪৪৫]

খলিফা আল-মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল নিযুক্ত করেন। তাদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির। বিজ্ঞানী দলটির কাজ ছিল মহাজাগতিক বস্তুরাশি পর্যবেক্ষণ করা ও এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা, টলেমির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা

---

৪৪৪. ইরানের খুযিস্তানে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক শহর। সাসানি সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল এই শহর। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চারও কেন্দ্র ছিল এটি।

৪৪৫. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১১৮-১১৯।

করা এবং সৌর-কলঙ্ক (Sunspots) নিয়ে গবেষণা করা। তারা ভূ-গোলককে ভিত্তি ধরে নিয়ে একই সময়ে পালমিরা ও সিনজার থেকে সূর্যের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর (অক্ষাংশের ও দ্রাঘিমাংশের) ডিগ্রি পরিমাপ করতে শুরু করেন। তারা এই পর্যবেক্ষণ থেকে ডিগ্রি পরিমাপ করেন ৫৬.৭৫ মাইল। এটা আমাদের আধুনিক যুগের পরিমাপ থেকে আধা মাইল বেশি। এই ফলাফল থেকে তারা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন প্রায় ২০,০০০ মাইল। আধুনিক যুগের হিসাব মতে তা ২১,৬০০ মাইল। এ সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত না হলে কোনোকিছুই গ্রহণ করতেন না। তারা তাদের গবেষণায় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করতেন।[(৪৪৬)]

প্রকৃত সফলতা হলো মুসলিমরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন এবং তাতে যা ভুলভ্রান্তি ছিল তা সংশোধন করেছেন। তা ছাড়া ওই জ্ঞানকে তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বের করে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ময়দানে নিয়ে এসেছেন। আরবরা জাহিলি যুগে যেসব কুসংস্কার ও মায়াবিদ্যায় বিশ্বাস করত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেককিছু থেকে এই জ্ঞানকে পবিত্র করেছেন। প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে যখন জ্যোতিষতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে তার সমকালে আরবেও কুসংস্কার ও মায়াবিদ্যার বিস্তার ঘটে। ইসলামি শরিয়া জ্যোতিষতত্ত্বকে বাতিল করে দিয়েছে এবং একে অস্বীকার করেছে। বরং একে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এটাই হলো ইসলামি সভ্যতার প্রকৃত অবদান।

মানমন্দির নির্মাণ

মুসলিমরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় কতটা মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার জোরালো প্রমাণ মেলে এতেই যে, তারা বহু বড় বড় মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এসব মানমন্দির ছিল সব ধরনের যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এবং সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত (বেতনভুক্ত) বিজ্ঞানীরা এগুলোতে গবেষণা করতেন। ইসলামি বিশ্বের দূরদূরান্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল মানমন্দির। খলিফা আল-মামুন মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন দামেশকের সন্নিকটে কাসিয়ুন পাহাড়ের ওপর এবং

---

৪৪৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮২।

বাগদাদের আশ-শামাসিয়্যাহ এলাকায়।[৪৪৭] এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। বানু মুসা ইবনে শাকির বাগদাদে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এখানে তারা পূর্ণচন্দ্রের হিসাব বের করেন। ইরানের মারাগিতে (মারাঘায়) একটি মানমন্দির ছিল। এটি নির্মাণ করেছিলেন নাসিরুদ্দিন আত-তুসি। মারাঘার মানমন্দির ছিল সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বিখ্যাত। এটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এই মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ ছিল সবচেয়ে নিখুঁত ও যথার্থ। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা তাদের রেনেসাঁসের যুগে ও তার পরেও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করতেন। এগুলোর পাশাপাশি আরও মানমন্দির ছিল। যেমন সিরিয়ায় ইবনে শাতিরের[৪৪৮] মানমন্দির, ইস্পাহানে আদ-দিনাওয়ারির মানমন্দির, সমরকন্দে উলুগ বেগের[৪৪৯] মানমন্দির, ইরানে শারফুদ্দাওলার মানমন্দির (জ্যোতির্বিদ আবু সাহ্‌ল আল-কুহি এ মানমন্দির থেকে সাতটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন), কায়রোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর নির্মিত আল-হাকিমি মানমন্দির এবং আরও অনেক মানমন্দির।[৪৫০]

---

৪৪৭. দামেশকে আরেকটি মানমন্দির ছিল, যেটি নির্মাণ করেছিলেন উমাইয়া খলিফারা।-অনুবাদক

৪৪৮. ইবনে শাতির : আবুল হাসান আলাউদ্দিন আলি ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারি আদ-দিমাশকি আল-মুআযযিন, ইবনে শাতির নামে পরিচিত (৭০৪-৭৭৭ হি./১৩০৪-১৩৭৫ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও প্রকৌশলী। ছিলেন দামেশকের প্রধান মুআযযিন। তিনি দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদে একটি ধর্মীয় সময়-নির্দেশক (religious timekeeper) বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং মসজিদটির মিনারে তৈরি করে দিয়েছিলেন একটি সূর্যঘড়ি। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে তার বহু পুস্তিকা রয়েছে। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৪, পৃ. ৯।

৪৪৯. উলুগ বেগ : মির্যা মুহাম্মাদ তারাগাই ইবনে শাহরুখ ইবনে তৈমুর লং (৭৯৬-৮৫৩ হি./১৩৯৪-১৪৪৯ খ্রি.)। তৈমুরি পরিবারের চতুর্থ শাসক। উলুগ বেগ নামে সর্বাধিক পরিচিত। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। তিনি পাঁচটি ভাষা জানতেন : আরবি, ফার্সি, তুর্কি, মঙ্গোলীয় ও চৈনিক। ত্রিকোণমিতি ও গোলীয় জ্যামিতিতে তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। তিনি সেই যুগের সবচেয়ে বড় মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বুখারা ও সমরকন্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহাবিদ্যালয়। দেখুন, *যিরিকলি*, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৩২৮।

৪৫০. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ৭৪-৮২; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮১-৮২।

মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এসব মানমন্দিরে অসংখ্য যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ ব্যবহার করেছেন, এগুলো যেমন ছিল সূক্ষ্ম তেমনই কারিগরি শৈলীতে ছিল অনন্য। এসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলি ও অবস্থাবলির ব্যাপারে অবগত হতেন। এসব যন্ত্রের অধিকাংশই ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত, যেগুলো ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। যেমন কীলকযুক্ত কল, আর্মিলারি স্ফেয়ার (Armillary sphere), সাইন কোয়াড্রেন্ট (Sine quadrant), আর্চেড কোয়াড্রেন্ট (Arched quadrant), হোরারি কোয়াড্রেন্ট (Horary quadrant), ফুইকুলা (Fuicula), দিগংশ ও সুবিন্দু পরিমাপযন্ত্র, ম্যারিডিয়ান কোয়াড্রেন্ট (Meridian quadrant), প্যারাল্যাকটিক রুলার (Parallactic ruler) এবং সময় পরিমাপের বিভিন্ন সূর্যঘড়ি ও অন্যান্য যন্ত্র।[৪৫১]

পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সাহায্যও গ্রহণ করেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা। এসব যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রোল্যাব[৪৫২]। যন্ত্রটি তার গ্রিক নামই ধরে রেখেছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোল্যাবের উন্নতি সাধন করেন এবং নানা ধরনের নমুনা তৈরি করেন। যা তাদের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই অনুষঙ্গ। যেমন তারা উদ্ভাবন করেছেন গোলকাকার অ্যাস্ট্রোল্যাব ও বোট অ্যাস্ট্রোল্যাব। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞানজাদুঘরে এসব অ্যাস্ট্রোল্যাবের নমুনা সংরক্ষিত আছে। দিগ্‌বলয়

---

৪৫১. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৯২।

৪৫২. অ্যাস্ট্রোল্যাব (astrolabe) একটি বিস্তৃত নতি-পরিমাপক যন্ত্র (inclinometer)। একে এনালগ ক্যালকুলেটরও বলা যেতে পারে। এই যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও নাবিকেরা মহাকাশীয় বা মহাজাগতিক বস্তুর দিগ্‌বলয়ের উপরের উচ্চতা, দিন বা রাত নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন। গ্রহ ও নক্ষত্র নির্ণয়ের জন্যও এই যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। নির্দিষ্ট স্থানীয় সময়ে স্থানীয় অক্ষাংশ, জরিপ ও ত্রিভুজীকরণে (triangulation)-ও অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহৃত হতো। ধ্রুপদি সভ্যতায়, ইসলামি স্বর্ণযুগে, ইউরোপীয় মধ্যযুগে ও আবিষ্কারের যুগে উপরিউক্ত সব কাজের জন্য অ্যাস্ট্রোল্যাবের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। ইসলামি বিশ্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অ্যাস্ট্রোল্যাবের নকশার ক্ষেত্রে কৌণিক স্কেল প্রবর্তন করেন। দিগংশকে নির্দেশ করে এমন বৃত্ত যুক্ত করেন। কিবলা অনুসন্ধানের উপায় হিসেবেও যন্ত্রটির ব্যবহার ছিল। অষ্টম শতাব্দীর গণিতজ্ঞ মুহাম্মাদ আল-ফাযারি প্রথম অ্যাস্ট্রোল্যাব-নির্মাতা হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করেন।-অনুবাদক।

থেকে নক্ষত্ররাজির উচ্চতা এবং সময় নির্ধারণে অ্যাস্ট্রোল্যাবের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল।[৪৫৩]



চিত্র নং-১৩
অ্যাস্ট্রোল্যাব

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপাত্ত-সারণি

মহাকাশের বস্তুরাশির হিসাবনিকাশের জন্য মুসলিমরা জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উপাত্ত-সারণি বা তারকা-সারণি তৈরিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের জন্য এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারকা-সারণি বলতে বোঝায় গাণিতিক সংখ্যার তালিকাকে, যেখানে কক্ষপথে চলমান তারকারাজির অবস্থান নির্ধারণ, মাস ও দিন জানার সূত্রাবলি ও অতীতকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। গ্রহমণ্ডলীর ঊর্ধ্ব-অবস্থান, নিম্ন-অবস্থান, হেলে বা ঝুঁকে পড়া ও অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ও জানা যায় তারকা-সারণি থেকে। এসব সারণি অতিশয় সূক্ষ্ম ও নির্ভুল গাণিতিক

[৪৫৩]. ডোনাল্ড আর. হিল, *আল-উলুমু ওয়াল হান্দাসাতু ফিল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৭৫; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ৮২-৮৩; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ১৫০।

সূত্রাবলি ও সংখ্যাসূচক আইনকানুনের ওপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বিখ্যাত তারকা-সারণি হলো ইবনে ইউনুস আল-মিশরির[৪৫৪] (আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস) তারকা-সারণি।[৪৫৫]

খ্যাতিমান কয়েকজন

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারা অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং তাদের উত্তরসূরিদের জন্য নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আহমাদ ইবনে ইউনুস আল-ফারগানি। পশ্চিমাবিশ্বে তিনি আলফ্রাগানুস নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থ كتاب في جوامع علم النجوم (*A Compendium of the Science of the Stars or Elements of astronomy on the celestial motions*) ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায় সাতশ বছর ধরে নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিরাজমান থেকেছে।[৪৫৬] তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে চাঁদের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আলফ্রাগানুস-এর।

আল-বাত্তানি

বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন আল-বাত্তানি। তিনি বিখ্যাত আয়-যিজুস-সাবি এর (الزيج الصابئ) প্রণেতা। এই তারকা-সারণি জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি অনেক তারকার অবস্থান চিহ্নিত করেন। চাঁদের সন্তরণ ও গ্রহরাজির কক্ষপথে আবর্তন সম্পর্কে তিনি সঠিক ধারণা দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির কিছু ভুলও তিনি সংশোধন করে দেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ-সম্পর্কিত টলেমি যে তত্ত্ব ব্যক্ত করেছিলেন, আল-বাত্তানি তা ভুল প্রমাণ করে নতুন প্রামাণিক তথ্য প্রদান

---

৪৫৪. ইবনে ইউনুস : আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউনুস (মৃ. ৩৯৯ হি./১০০৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য রচনা : *আয়-যিজুল হাকিমি*, যা যিজ ইবনে ইউনুস নামে পরিচিত। মিশরের ফুসতাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন কায়রোতে। দশম শতাব্দীতে যিনি সময় পরিমাপের জন্য সরল দোলক ব্যবহার করেছিলেন তিনি হলেন ইবনে ইউনুস। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪২৯।

৪৫৫. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৫১।

৪৫৬. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ১৩, পৃ. ১৮২।

করেন। সৌর-অপসূর[৪৫৭] নির্ধারণেও তিনি টলেমির বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার নিজের মত দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আল-বাত্তানির সর্বাধিক পরিচিত অর্জন হলো সৌরবর্ষ নির্ণয়। আল-বাত্তানিই প্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন যে, এক সৌরবৎসরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড হয়। এর সঙ্গে আধুনিক পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ২ মিনিট ২২ সেকেন্ড কম। আল-বাত্তানি পৃথিবীর বিষুবরেখার মধ্য দিয়ে যাওয়া কাল্পনিক সমতলের সঙ্গে সূর্য ও পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যে যে সমতল, তা অসদৃশ বলে ব্যাখ্যা করেন। বিস্ময়করভাবে তিনি এই দুই কাল্পনিক সমতলের মধ্যকার কোণ পরিমাপ করেন। এই কোণকে বলা হয় 'সৌর অয়নবৃত্তের বাঁক'। আল-বাত্তানি এর পরিমাপ করেন ২৩ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট, যা বর্তমানের আধুনিক পরিমাপ ২৩ ডিগ্রি ২৭ মিনিট ৮.২৬ সেকেন্ডের খুবই কাছাকাছি। তার এসব জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্পর্কিত তথ্য রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তারা আল-বাত্তানির কাজের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। কয়েক শতাব্দী পর কোপার্নিকাস কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন পরিমাপের চেয়ে আল বাত্তানির পরিমাপ অনেক বেশি নিখুঁত ছিল।[৪৫৮]

---

[৪৫৭]. সূর্যের চারদিকে কোনো গ্রহের কক্ষপথের নিকটতম বিন্দুকে অনুসূর (Perihelion) এবং দূরতম বিন্দুকে অপসূর (Aphelion) বলে। অনুসূর অবস্থান পাড়ি দেওয়ার সময় গ্রহরা জোরে এবং উলটোভাবে অপসূর দিয়ে যাওয়ার সময় ধীরে চলে। আমাদের সৌরজগতের গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তু সাধারণত বৃত্তাকার কক্ষপথে না ঘুরে অনেকটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ অনুসরণ করে। তাই সূর্য থেকে এর দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। সব গ্রহ এই নিয়ম মেনে চলে। কোনো গ্রহ থেকে সূর্যের ন্যূনতম দূরত্বকে ওই গ্রহের অনুসূর এবং এর বিপরীতকে অপসূর বলা হয়। যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে, তাকে অনুসূর বলে। সাধারণত ১ থেকে ৩ জানুয়ারি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে। যেদিন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে, তাকে অপসূর বলে। সাধারণত ১ থেকে ৪ জুলাই সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

[৪৫৮]. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১০৬; জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫৪৩।

আবদুর রহমান আস-সুফি[৪৫৯]

তিনি পশ্চিমা বিশ্বে Azophi এবং Azophi Arabus নামে পরিচিত। আবদুর রহমান আস-সুফি স্থির তারকারাজির সারণির প্রথম উদ্ভাবক। এ বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন যার আরবি নাম صُوَرُ الكَوَاكِبِ الثَّابِتَةِ এবং ইংরেজি নাম *Book of Fixed Stars*[৪৬০]। এটি তিনি ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন। এতে তিনি ২৯৯ হিজরির/৯১১ খ্রিষ্টাব্দের স্থির তারকারাজির বিবরণ তুলে ধরেন। বিবরণের পাশাপাশি তিনি চিত্রও অঙ্কন করেছেন। এই সারণি এমনকি আধুনিক কালেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যারা কতিপয় তারকা এবং তাদের অবস্থান ও গতিময়তার ইতিহাস জানতে চান তাদের জন্য। এতে তিনি এক হাজারেরও বেশি তারকার চিত্র অঙ্কন করেছেন। আবদুর রহমান আস-সুফি ও তার অনন্য কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চাঁদের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ **'আযোফি' ও গৌণ গ্রহ ১২৬২১ আল-সুফির** নামকরণ করা হয়েছে তার নামেই।[৪৬১]

---

৪৫৯. আবদুর রহমান আস-সুফি : আবুল হুসাইন আবদুর রহমান ইবনে উমর ইবনে সাহল আর-রাযি (২৯১-৩৭৬ হি./৯০৩-৯৮৬ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পারস্যের (ইরানের) রায় শহরের অধিবাসী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب تطارح الشعاعات، كتاب التذكرة، رسالة العمل بالأسطرلاب، كتاب الكواكب الثابتة غير المتحركة। দেখুন, আল-কাফাতি, *ইখবারুল-উলামা*, পৃ. ১৫২-১৫৩।

৪৬০. গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি ও অনুবাদ এখনো টিকে আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বডলেইয়ান লাইব্রেরিতে গ্রন্থটির ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপি আছে। এটি মূলত লেখকের পুত্রের কাজ। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে গ্রন্থটির ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি অনুলিপি। -অনুবাদক

৪৬১. শাওকি আবু খলিল, *দাওরুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, প্রথম মুদ্রণ, দারুল ফিকর, দিমাশক, ১৪১৭ হি./১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৭৩।

আবুল ওয়াফা আল-বুযজানি (আল-বুজানি)[৪৬২]

তিনি চন্দ্র পঞ্জিকা তৈরির জন্য একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন যা গতি-সমীকরণ নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো চাঁদের গতিময়তায় অসাম্য (lunar inequalities) আবিষ্কার। তার এই আবিষ্কার পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বলবিদ্যার পরিধি বিস্তৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আবিষ্কারের মালিক ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে[৪৬৩] নাকি আল-বুযজানি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে, তৃতীয় অসাম্য (Third lunar inequality) হলো আল-বুযজানির অন্যতম আবিষ্কার। তার *আল-মাজেস্ট* (*Kitāb al-Majisṭī*/كتاب المجسطي) তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দীব্যাপী আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তার এই গ্রন্থে গোলকাকার ত্রিকোণমিতি, গ্রহতত্ত্ব ও কিবলার দিক নির্ধারণে সমাধান প্রসঙ্গে অসংখ্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।[৪৬৪]

---

৪৬২. আবুল ওয়াফা আল-বুযজানি : আবুল ওয়াফা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাইল (৩২৮-৩৮৮ হি./৯৪০-৯৯৮ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রপ্রকৌশলী। খুরাসানের বুযজানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال من علم الحساب، كتاب في ما يحتاج إليه الصانع من الأعمال الهندسية، زيج الواضح، كتاب المجسطي। তিনি দাওফান্তাস (Diophantus of Alexandria) ও আল-খাওয়ারিজমির আলজেব্রা-বিষয়ক গ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা রচনা করেন এবং ইউক্লিডের এলিমেন্টস-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬৭।

৪৬৩. টাইকো ব্রাহে (Tycho Brahe) একজন প্রখ্যাত ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী (১৫৪৬-১৬০১ খ্রি.)। তিনি দুটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। একটি হলো প্রাসাদ-মানমন্দির (Uraniborg) এবং তার পাশে অপরটি হলো ভূগর্ভস্থ মানমন্দির (Stjerneborg)। তিনি ডেনমার্কের সম্রাটের কাছ থেকে একটি দ্বীপ উপহার পেয়েছিলেন। ডেনমার্কের উপকূলের কাছে সেই ভেন দ্বীপেই তিনি মানমন্দির দুটি নির্মাণ করেন। তিনি অসংখ্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও গণনাকে আরও নিখুঁত করেন, নানান দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যবহারিক ফল ও বিশেষ সারণির সাহায্যে প্রাপ্ত তাত্ত্বিক গণনা—এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করেও দেখতেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বাধিক ও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল তার হাতেই।

৪৬৪. কাদরি তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি ফির-রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল-ফালাক*, পৃ. ২৩২; আবু যায়দ শালবি, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ওয়াল-ফিকরিল ইসলামি*, পৃ. ৩৫৫।

আবু ইসহাক আন-নাক্কাশ আয-যারকালি[৪৬৫]

বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তিনি *আয-যিজুত তুলাইতিলি* (*Toledan Tables* or *Tables of Toledo*) প্রণেতাদের অন্যতম। এই যিজ বা তারকা-সারণির নামকরণ করা হয়েছে আন্দালুসের শহর তুলাইতিলাহ (Toledo)-এর নামে। টলেমিও আল-খাওয়ারিজমির মতো পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের থেকে আহরিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি এই তারকা-সারণি প্রস্তুত করেন। এই সারণিতে তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। তার একটি কিতাব রয়েছে الصحيفة الزيجية নামে, এতে তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাব ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাবের একটি উন্নত সংস্করণও উদ্ভাবন করেন। এটিকে আস-সাহিফাতুয যারকালিয়্যাহ বা আয-যারকালাহ বলা হয়। পশ্চিমাবিশ্বে এটি Saphaea নামে পরিচিত। তিনিই প্রথম প্রমাণ পেশ করেন যে, স্থির তারকারাজির তুলনায় সৌর-অপসূরের ঝুঁকে পড়ার পরিমাণ ১২০৫ মিনিটে পৌঁছে। আধুনিক নিরীক্ষায় যার পরিমাণ ১২০৮ মিনিট। আয-যারকালির নির্ণীত পরিমাণের চেয়ে মাত্র ৩ মিনিট বেশি।[৪৬৬] টলেমীয় মডেলের ডায়াগ্রাম (রেখাচিত্র) ব্যবহার করে গ্রহরাজির অবস্থান নির্ণয়ে একটি যন্ত্রও (equatorium) আবিষ্কার করেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি দুটি রচনা লেখেন, রচনা দুটি ক্যাসটাইলের রাজা আলফোনসোর (King Alfonso X) নির্দেশে স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়। এটি হিব্রু ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়। আয-যারকালি তার كتاب الجداول (*Book of Tables*) গ্রন্থের জন্যও বিখ্যাত। এর একটি সারণি কিবতি (Coptic), রোমান, পারসিক ও চান্দ্রমাস শুরুর দিনটিকে নির্দেশ করে, অন্য একটি সারণি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহের অবস্থান নির্দেশ করে এবং অপর একটি সারণি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে।

---

৪৬৫. আয-যারকালি : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ইয়াহইয়া আত-তুজিবি আন-নাক্কাশ (৪২০-৪৮০ হি./১০২৯-১০৮৭ খ্রি.)। স্পেনের টলেডোয় জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং একাধিক যন্ত্রের উদ্ভাবক। অ্যাস্ট্রোল্যাবের বেশ কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন।

৪৬৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২০৯; শাওকি আবু খলিল, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা ওয়া মুজাযুন আনিল হাদারাতিস সাবিকা*, পৃ. ৫৪৪।

আবুল ইয়ুস্‌র বাহাউদ্দিন আল-খারাকি[৪৬৭]

ষষ্ঠ হিজরি শতকে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে মগ্ন হয়েছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। গণিত ও ভূগোলবিদ্যায়ও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *আত-তাবসিরাহ* (التبصرة)[৪৬৮] এবং *মুনতাহাল-ইদরাক ফি তাকসিমিল-আফলাক* (منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك)।[৪৬৯]

আল-বাদি আল-আস্তুরলাবি[৪৭০]

তিনি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার উল্লেখযোগ্য কীর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি তারকা-সারণি, যা তিনি বাগদাদের সালজুকি সুলতানের প্রাসাদে থেকে তৈরি করেছিলেন। তারকা-সারণিটি তার কিতাবে সন্নিবেশন করেন। সুলতান মাহমুদ আবুল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের নামে সারণিটির নামকরণ করা হয়েছে যিজ আল-মাহমুদি।[৪৭১]

---

৪৬৭. আল-খারাকি : বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর আল-খারাকি (৪৬৯-৫৩৩ হি./১০৭৬-১১৩৯ খ্রি.)। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ। খাওয়ারিজমের শাহদের প্রিয়ভাজন ও তাদের রাজদরবারের জ্যোতির্বিদ ছিলেন। দেখুন, উমর রেজা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৮, পৃ. ২৩৮।

৪৬৮. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ৩৩৮; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২১৮।

৪৬৯. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১৮৫২।

৪৭০. আল-বাদি আল-আস্তুরলাবি : আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হুসাইন ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদি (মৃ. ৫৩৪ হি./১১৩৯ খ্রি.)। দার্শনিক, চিকিৎসক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যিজগ্রন্থ বা তারকা-সারণি বিষয়ে তার *'আল-মুআররাবুল মাহমুদি'*। তিনি যেমন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছিলেন, তেমনই পূর্ববর্তীদের তৈরিকৃত যন্ত্রপাতির সংস্কারও করেছিলেন। درة التاج من شعر ابن حجاج তার কবিতার বই। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২৭, পৃ. ১৬০।

৪৭১. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি আল-বাগদাদি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৭১৪।

ইবনে শাতির

ইবনে শাতিরের (মৃ. ৭৭৭ হি./১৩৭৫ খ্রি.) জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাবলিও অনেক মূল্যবান। তিনি যেসব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন তা কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে চালু ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো : যিজ ইবনে শাতির *ইদাহুল মুগাইয়াব ফিল-আমাল বিরল-মুজাইয়াব রিসালাহ ফিল-আস্তুরলাব*, *মুখতাসার ফিল-আমাল বিল-আস্তুরলাব*, *আন-নাফউল আম ফিল-আমাল বির-রুবইত তাম্ম*, *নুযহাতুস সামি ফিল-আমাল বির-রুবইল জামি*, *কিফায়াতুল কুনু ফিল-আমাল বির-রুবইল মাকতু*, *নিহায়াতুল গায়াত ফিল-আমালিল ফালাকিয়্যাত*, *আয-যিজুল জাদিদ*। এই তারকা-সারণি তিনি উসমানি খলিফা প্রথম মুরাদের আহ্বানে প্রস্তুত করেছিলেন। ইবনে শাতির এতে যেসব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উদাহরণ, তত্ত্ব ও মত এবং পরিমাপ পেশ করেন তা ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। তবে তার এই সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ফলাফল পরবর্তীকালে নিকোলাস কোপার্নিকাসের নামে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ইতিহাসবিদ ডেভিড এ. কিং[৪৭২] ১৩৯০ হিজরিতে/১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন যে, পোলিশ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাসের নামে চালু অধিকাংশ তত্ত্বই মূলত ইবনে শাতিরের। এর তিন বছর পর ১৩৯৩ হিজরিতে/১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পোল্যান্ডে কিছু আরবি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, এসব পাণ্ডুলিপি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোপার্নিকাস এগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন।[৪৭৩]

---

৪৭২. ডেভিড এ. কিং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত গ্যোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Mathematical Astronomy In Medieval Yemen (1983); A Survey Of The Scientific Manuscripts In The Egyptian National Library (1986); Islamic Mathematical Astronomy (1986/1993); Islamic Astronomical Instruments (1987/1995); Astronomy In The Service Of Islam (1993); The Ciphers Of The Monks: A Forgotten Number Notation Of The Middle Ages (2001).*

৪৭৩. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৩৮৭; হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ৮১; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৩৬-২৩৮।

উলুগ বেগ

উলুগ বেগ বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করে গবেষণার কাজে ভাবনাহীন রাখতেন। তিনি সমরকন্দে সেই সময়ের সবচেয়ে বড় মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একজন প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ লিখেছেন, উলুগ বেগ ছিলেন জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উদ্যমী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক জ্ঞান তার দখলে ছিল। একইসঙ্গে তিনি অলংকারশাস্ত্রেরও অত্যন্ত নিপুণ পরীক্ষক ছিলেন। তার যুগে বিজ্ঞানীদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে ঊর্ধ্বে। জ্যামিতিতে তিনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আর মহাবিশ্বের মানচিত্র রচনা (Cosmography)-এর ক্ষেত্রে তিনি টলেমির একটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তার মতো কোনো সম্রাট আজ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেননি। তিনি প্রাথমিক যুগের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় নক্ষত্রসমূহের টীকা লেখেন। তিনি সমরকন্দে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সৌন্দর্যে ও মানে এবং শিক্ষাদীক্ষার উৎকর্ষে এমন মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন সাতটি প্রদেশের কোথাও ছিল না।[৪৭৪]

উলুগ বেগ একটি আকাশ-পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে তার কার্যকালে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সক্ষম হন। ৭২৭ হি./১৩২৭ খ্রি. থেকে ৮৩৯ হি./১৪৩৫ খ্রি. পর্যন্ত তার আকাশ-পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে একটি সামগ্রিক সারণি তৈরি করেন। এই সারণির নাম যিজ উলুগ বেগ বা আয-যিজুস-সুলতানি। এতে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে ও যথার্থভাবে নক্ষত্ররাজির অবস্থান নির্ণয় করেন। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়ও নির্ণয় করেন। উলুগ বেগ স্থির তারকারাজিরও একটি সারণি প্রস্তুত করেন। চাঁদ, সূর্য, গ্রহরাজির সন্তরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শহরগুলোর দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের সারণিও তিনি তৈরি করেন।[৪৭৫]

---

৪৭৪. উইল ডুরান্ট, *কিসসাতুল হাদারাহ*, খ. ২৬, পৃ. ৫১।

৪৭৫. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৪৩-২৪৬।

আর-রুদানি শামসুদ্দিন আল-ফাসি[৪৭৬]

তিনি হলেন পরবর্তীকালের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম, যারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের অর্জিত কীর্তিগুলোর সাহায্য গ্রহণ করে সামনে এগিয়েছেন। আর-রুদানি সময় নির্দেশের জন্য একটি গোলকাকার যন্ত্র (গোলক অ্যাস্ট্রোল্যাব) উদ্ভাবন করেছিলেন। গোলকাকার যন্ত্রটির ওপরে ছিল কিছু বৃত্ত এবং তিসি তেলের প্রলেপযুক্ত সাদা রঙের নকশা। গোলকাকার যন্ত্রটির ওপর আরেকটি গোলক যুক্ত ছিল, যা ছিল দুটি অংশে বিভক্ত, এগুলোর ওপর ছিল সৌর-বন্ধনী ও অন্যান্য বস্তু নির্দেশক ছিদ্র। এগুলোও ছিল নিচেরটির মতো গোলকাকার ও সুবজ রঙে চিহ্নিত। আর-রুদানির এই গোলক অ্যাস্ট্রোল্যাবটি অতি সহজে ব্যবহার করা যেত এবং সব শহরের সময় নির্দেশের জন্যও ছিল যথোপযুক্ত। এ বিষয়ে তিনি '*বাহজাতুত তুল্লাব ফিল-আমাল বিল-আস্তুরলাব*' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন, এতে তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ ও তার ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৭৭]

পরিশেষে আমরা যা আলোচনা করেছি তার প্রেক্ষিতে বলতে হয়, মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানে—সেই সময়ে লব্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা সত্ত্বেও—যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও অবদান রেখেছেন তা অবশ্যই সম্মানের যোগ্য, শ্রদ্ধার যোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ময়দানে তারা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আকাশের বহু নক্ষত্র এখনো আরবি নাম বহন করে চলেছে। যেমন সুহাইল (Canopus), আল-মাজাররাহ (rogue star), আল-জাওযা (Betelgeuse), আদ-দাব্বুল আকবার (Ursa Major), আদ-দাব্বুল

---

৪৭৬. আর-রুদানি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান ইবনে আল-ফাসি (১০৩৭-১০৯৪ হি./১৬২৭-১৬৮৩ খ্রি.)। মালিকি মাযহাবপন্থী মরোক্কান মুহাদ্দিস, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পর্যটক। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : صلة الخلف بموصول السلف، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ، مختصر تلخيص المفتاح في المعاني وشرحه، تحفة أولي الألباب في العمل بالأسطرلاب। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ১৫১।

৪৭৭. ইসমাইল পাশা আল-বাবানি, *হাদিয়্যাতুল আরিফিন আসমাউল মুআল্লিফিন ওয়া আসারুল মুসান্নিফিন*, পৃ. ৬০৭; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৪৮-২৫০।

আসগার (Ursa Minor), আল-গাওল (Algol), আস-সাম্‌ত এবং আরও অনেক।

মারয়াম আল-আস্তুরলাবি[৪৭৮]

দশম শতাব্দীর একজন মুসলিম নারী জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তার মূল নাম আল-ইজলিয়্যাহ বিনতে আল-ইজলি আল-আস্তুরলাবি। জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শী ছিলেন। তার পিতা কুশিয়ার আল-জিলানি কয়েকটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা। যেমন *'মাজমালুল-উসুল ফি আহকামিন নুজুম'*, *'আল-যিজ আল-জামি'* *'আল-মাদখাল ফি সানাআতি আহকামিন নুজুম'* ও *'আস্তুরলাব'*। তারা বসবাস করতেন সিরিয়ার আলোপ্পোতে। সেখানেই মারয়াম আল-আস্তুরলাবি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক কাজ করতেন।

মারয়াম ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নাস্তুলুসের শিষ্য ছিলেন। নাস্তুলুস ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি ইতিহাসে প্রথম বিস্তৃত অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন। নাস্তুলুসের কাছে শিক্ষাগ্রহণের পর মারয়াম 'উন্নত অ্যাস্ট্রোল্যাব' নির্মাণে ব্রতী হন। তার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটি ছিল একটি উৎকর্ষের প্রতীক। তিনি তার অ্যাস্ট্রোল্যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে মহাকাশের বস্তুরাশির নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

হিজরি চতুর্দশ শতকে (খ্রিষ্টীয় দশম শতকে) মারয়াম আল-আস্তুরলাবি যখন আলেপ্পোতে বসবাস ও গবেষণা করতেন, সেই সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন সাইফুদ্দাওলাহ। তিনি আলেপ্পো স্টেট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ছিল হামদানি সাম্রাজ্যের একটি প্রতীক। মারয়াম সাইফুদ্দাওলার রাজদরবারে ৯৪৪-৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাকাশ-গবেষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একটি নয়, বিভিন্ন ধরনের একাধিক অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন।

মারয়াম আল-আস্তুরলাবি যে অ্যাস্ট্রোল্যাব নির্মাণ করেছিলেন তা অনেক আধুনিক নৌবৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন কম্পাস, স্যাটেলাইট ও বিশ্বজনীন

---

৪৭৮. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

অবস্থান-নির্ণায়ক ব্যবস্থা, যা সংক্ষেপে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) নামে পরিচিত।

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেনরি ই. হল্ট ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগোতে অবস্থিত পালোমার মানমন্দিরে গবেষণাকালে একটি গ্রহাণু-বেষ্টনী (asteroid belt) আবিষ্কার করেন। তিনি এটির নাম দেন 'মারয়াম আল-আস্তুরলাবি'।[৪৭৯]

Asif Rahman
10.07.'21
10:23 pm.

৪৭৯. *ডেইলি সাবাহ*, ইস্তাম্বুল, ১৬ জুলাই, ২০১৬ খ্রি.; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৬৭১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন

মানবজগতের প্রতি রহমতস্বরূপ ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই ধর্ম তার অনুসারীদের প্রগতি ও অগ্রগামিতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। ফলে অন্যান্য জাতিও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সভ্যতাকেন্দ্রিক উৎকর্ষ ও অগ্রগামিতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। এই উৎকর্ষ কেবল জীবনের একটি দিকে নয়, বরং সব দিকেই বিস্তৃত। কুরআন মুসলিমদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। পূর্ববর্তী লোকদের অর্জিত সাফল্য ও কীর্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে নিষেধ করেছে। অবশ্য পূর্ববর্তীদের যা-কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে বাধা নেই। অবিশ্বাসীরা অন্ধ-অনুকরণের পথ বেছে নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে বিরত থাকে, অন্ধ-অনুকরণকেই তারা যথেষ্ট মনে করে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো, তারা বলে না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তারপরও?[৪৮০]

এই রীতি প্রতিটি বিষয়ে বারবার দৃষ্টিপাত করতে, বিশুদ্ধ যুক্তির সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখতে এবং দলিল-ভিত্তিক চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

৪৮০. সুরা বাকারা : আয়াত ১৭০।

আল-আহযাব (খন্দকের) যুদ্ধে পরিখা খননের চিন্তাকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অথচ পরিখা খননের বিষয়টি আরব সমাজের জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগ যুগ ধরে আরবে পরিচিত ও অনুসৃত যুদ্ধের কলাকৌশল আঁকড়ে ধরে থাকেননি, একজন অনারব সাহাবির পরামর্শে তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন।

এই রীতি মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। তাই তারা পূর্ববর্তী জ্ঞানের পরিধিতে আটকে থাকেননি এবং ইসলামপূর্ব অন্যান্য সভ্যতার কীর্তিগুলোর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। তারা নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন, ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কেবল আবিষ্কারই নয়, বরং মৌলিকভাবে নতুন জ্ঞানশাখার ভিত্তিও নির্মাণ করেছেন। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোতে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদ : রসায়নশাস্ত্র

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ওষুধবিজ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভূতত্ত্ববিদ্যা

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বীজগণিত

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : যন্ত্রপ্রকৌশল

প্রথম অনুচ্ছেদ

রসায়নশাস্ত্র

রসায়নশাস্ত্র ইসলামি সভ্যতার পূর্বে সস্তা ধাতুকে সোনা ও রুপায় রূপান্তরের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই শাস্ত্রের নির্ভরশীলতা ছিল বুদ্ধি ও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণের ওপর, তা পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারেকাছেও যায়নি।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রে এ অবস্থাই বিরাজ করছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীরা যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজ্ঞানের এই শাখায় নির্ভেজাল সত্যে উপনীত হতে নির্ভর করেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ওপর, এগুলোর সঙ্গে বুদ্ধি ও উপলব্ধিকেও যুক্ত করেন। ফলে রসায়নশাস্ত্র-সংশ্লিষ্ট কতিপয় মূলনীতি ও নিয়মের উদ্ভব হয়। জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি এই বিশাল শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি ইউরোপে রসায়নশাস্ত্র কয়েক শতাব্দীব্যাপী 'জাবিরের সৃষ্টিকর্ম' হিসেবে পরিচিত ছিল।

জাবির ইবনে হাইয়ানই অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি বলে স্থির করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের গবেষণাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এরূপ গবেষণাপদ্ধতির নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনি দেখবেন যে, তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা (এক্সপেরিমেন্ট) ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানাচ্ছেন, কারণ এ দুটির ওপরই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলছেন, প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাই এই শাস্ত্রের কাঠামোয় পূর্ণতা দেয়। কেউ প্রয়োগ ও পরীক্ষা না করলে কিছুই অর্জন করতে পারবে না।[৪৮১]

---

৪৮১. জাবির ইবনে হাইয়ান, *কিতাবুত তাজরিদ*, এরিক জন হোলমেয়ার্ড কর্তৃক সম্পাদিত مصنفات في علم الكيمياء للحكيم جابر بن حيام الصوفي সংকলনগ্রন্থের অন্তর্গত। প্রকাশক, P. Geuthner, ১৯২৮ খ্রি., প্যারিস।

উইল ডুরান্ট বলছেন, বলা যায় মুসলিমরাই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র হিসেবে রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। কারণ, মুসলিমরাই রসায়নশাস্ত্রীয় গবেষণায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও তার ফলাফল নির্ধারণে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ এই ময়দানে গ্রিকরা—আমরা যতদূর জানি—কারিগরি মূল্যায়ন ও দুর্বোধ্য অনুমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। মুসলিমরা আলেমবিক[৪৮২] আবিষ্কার করেছেন এবং একে এই নাম দিয়েছেন। অসংখ্য বস্তু ও ধাতুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রস্তুত করেছেন। ক্ষার ও এসিডের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। যেসব পদার্থ ক্ষার বা এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেগুলোর পরীক্ষা করেছেন। শত শত ওষুধ নিয়ে গবেষণা করেছেন, শত শত ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালি তৈরি করেছেন। মুসলিমরা সাধারণ ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করার যে জ্ঞান তা পেয়েছিলেন মিশর থেকে। এই জ্ঞানই তাদেরকে সত্যিকার রসায়নবিদ্যায় উপনীত করেছে। শত শত আবিষ্কার, যা তারা যুগপৎভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং রসায়নবিদ্যা নিয়ে কর্মকাণ্ডে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা-ই তাদেরকে এই পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। মধ্যযুগে তাদের অবলম্বিত পন্থা ও পদ্ধতিগুলোই সঠিক বৈজ্ঞানিক উপায় হিসেবে সবচেয়ে বেশি উপযোগী ছিল।[৪৮৩]

রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভবের পর খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া নামের একজন তরুণ বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি রোমান পাদরি মরিয়েনুসের (Morienus the Greek) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার প্রায়োগিক দিকগুলো শেখেন। তার পূর্বে রসায়নশাস্ত্র গ্রিকদের থেকে অনূদিত হয়ে প্রাথমিক স্তরে ছিল। তিনি একে প্রত্যক্ষ অর্জন ও দৃশ্যমান আবিষ্কারের স্তরে উন্নীত করেন। খালিদ ইবনে ইয়াযিদ রসায়ন নিয়ে তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেগুলো হলো : এক ফردوس الحكمة في علم الكيمياء; দুই. السر البديع في فك الرمز المنيع; এবং তিন. مقالتا مريانوس الراهب। শেষের পুস্তিকায় তিনি মরিয়েনুস ও তার মধ্যে কী

৪৮২. আলকেমিস্টদের চোলাইযন্ত্র। এতে একটি নল দিয়ে দুটি পাত্র যুক্ত থাকে।
৪৮৩. উইল ডুরান্ট, *স্টোরি অব সিভিলাইজেশন*, খ. ১৩, পৃ. ১৮৭।

ঘটেছে এবং তিনি যেসব প্রতীকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা তার কাছ থেকে কীভাবে শিখেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৪৮৪]

তর্কাতীতভাবেই জাবির ইবনে হাইয়ান হলেন রসায়নশাস্ত্রের জনক এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রায় হাজার বছর ধরে তার গ্রন্থাবলিই ছিল রসায়নবিদ্যার বিশ্বস্ত উৎস। এসব গ্রন্থে অসংখ্য রাসায়নিক যৌগের[৪৮৫] পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে যা তার আগে কেউ জানত না। এ বৈশিষ্ট্যই তার রচনাবলিকে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পাঠ্যবিষয়ে পরিণত করেছে। যেমন জোহান বার্থোলোমিউ[৪৮৬], লরেন্স এম. ক্রাউস[৪৮৭], এরিক জন হোলমেয়ার্ড। হোলমেয়ার্ড জাবির ইবনে হাইয়ানের প্রতি ইনসাফপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তাকে শীর্ষস্থানে আসীন করেছেন এবং মতলববাজ সুবিধাবাদী বিজ্ঞানীরা তাকে ঘিরে সন্দেহের যে দেয়াল তৈরি করেছিল তা তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। জর্জ সার্টন মন্তব্য করেছেন যে, জাবির ইবনে হাইয়ান ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময় দখল করে আছেন।

আবু বকর আল-রাজি (মৃ. ৩১১-৯২৩ হি.) জাবির ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থাবলি থেকে পাঠগ্রহণ করেছেন, রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি মজবুত করেছেন এবং এই শাস্ত্রের বিকাশে বড় অবদান রেখেছেন। তিনি তার *'কিতাবুল আসরার'*-এর ভূমিকায় এসব কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী দার্শনিকরা যা লিখেছেন তা ব্যাখ্যা করেছি। যেমন আগাথা ডিমুস[৪৮৮], হারমেস[৪৮৯], অ্যারিস্টটল, খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া এবং আমাদের গুরু জাবির ইবনে হাইয়ান। বরং তাতে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে যার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। আমার এই গ্রন্থ

---

৪৮৪. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২২৪; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৬।

৪৮৫. রাসায়নিক যৌগ হলো একপ্রকারের পদার্থ যা দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলিক উপাদানের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়। মৌলিক উপাদানগুলো নির্দিষ্ট ভরের অনুপাতে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক যৌগ গঠন করে এবং যৌগ ভাঙলে এর মৌলিক উপাদানগুলো পাওয়া যায়।

৪৮৬. Johann Bartholomew.

৪৮৭. Lawrence M. Krauss.

৪৮৮. Agatha Demus.

৪৮৯. Hermes Trismegistus.

তিনটি বিষয়ের জ্ঞানভান্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে: ওষুধ-সম্পর্কিত জ্ঞান, যন্ত্র-সম্পর্কিত জ্ঞান, পরীক্ষানিরীক্ষার জ্ঞান।[৪৯০]



চিত্র নং-১৪

জাবের ইবনে হাইয়ান রচিত 'আস-সিররুস সার'

---

[৪৯০]. আলি আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িয়িল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৭৭ থেকে উদ্ধৃতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা রসায়নের বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও সেগুলোর রহস্য উন্মোচন করেছেন। তাদের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, নাইট্রোহাইড্রোক্লরিক এসিড, সিলভার নাইট্রেট, মার্কারি ক্লোরাইড[৪৯১], মার্কারি অক্সাইড[৪৯২], পটাশিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, আয়রন সালফাইড। তারা আরও আবিষ্কার করেন অ্যালকোহল, পটাশ, অ্যামোনিয়া বা এজেন, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ক্ষার। قلو (ক্ষার) শব্দটি তার আরবি নাম (Alkaki) নিয়েই ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে প্রবেশ করেছে।[৪৯৩]

তারা রসায়নবিদ্যাকে চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগিয়েছেন। তারাই প্রথম ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালি, ধাতুনির্মিত বস্তুর প্রস্তুতপ্রণালি, ধাতু পরিষ্কারকরণপদ্ধতি এবং অন্যান্য যৌগ বস্তু ও আবিষ্কারসমূহের কৌশল প্রকাশ করেছেন। যার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন সাবান, কাগজ, সিল্ক, রঞ্জক পদার্থ (রং), বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, চামড়া পাকাকরণ, সুগন্ধি তৈরি, স্টিল তৈরি, ধাতু পলিশ এবং অন্যান্য আবিষ্কার। মুসলিম বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষায় বেশ কিছু রাসায়নিক যন্ত্র ও উপকরণের ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন ধাতু গলানোর পাত্র, চোলাইযন্ত্র, অতি গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম স্কেল। তারা ধাতুসমূহ ও সেগুলোর ভরের অনুপাত নির্ণয় করতেন।[৪৯৪]

---

৪৯১. Mercury (II) chloride or mercuric chloride

৪৯২. Mercury (II) oxide or mercuric oxide

৪৯৩. ডোনাল্ড আর. হিল, *Islamic Science and Engineering*, আরবি অনুবাদ, العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ পাশা, পৃ. ১২০-১২৬।

৪৯৪. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ১৫৯।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ওষুধবিজ্ঞান

মুসলিমদের পক্ষে রসায়নবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানশাখাগুলোতে, বিশেষ করে ওষুধবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তারা রসায়নবিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। যেহেতু ওষুধের জন্য প্রয়োজন রাসায়নিক নিয়মকানুন ও সমীকরণ জানা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার ফলাফল নিশ্চিত করা। ফলে কার্যকরী অর্থেই রাসায়নিক ওষুধের বিস্তার ঘটেছিল এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সামনে এক নতুন যুগের দরজাসমূহ উন্মোচিত হয়েছিল।

বাস্তবতা এই যে, ওষুধবিজ্ঞান দারুণভাবে মুসলিম বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাদের যুগেই ওষুধপ্রস্তুপ্রণালি বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরীরূপে এবং নতুন পন্থায় বিকশিত হয়েছিল। এই অনন্য বৈশিষ্ট্য তাদের সভ্যতাকালকে দিয়েছিল ভিন্ন মর্যাদা। এ ব্যাপারে গুস্তাভ লি বোঁ যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য, আমরা কোনোরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই মুসলিম বিজ্ঞানীদের ওষুধবিজ্ঞানের প্রবর্তক বলে আখ্যায়িত করতে পারি। আমরা বলি যে, এটি একটি মৌলিক আরবি (ইসলামি) আবিষ্কার।[৪৯৫] পূর্বে যেসব ওষুধ প্রচলিত ছিল সেগুলোর সঙ্গে তাদের সৃষ্টিলব্ধ নতুন নতুন ওষুধি যৌগ যুক্ত করেছিলেন। তারাই প্রথম ওষুধ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪৯৬]

অবশ্য মুসলিমরা শূন্য থেকে শুরু করেননি, তারা শুরুর দিকে গ্রিকদের থেকে এই জ্ঞানের ধারণা গ্রহণ করেছেন। গ্রিক চিকিৎসক Pedanius Dioscorides (৪০-৯০ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক রচিত *De materia medica (On Medical Material)*[৪৯৭] গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এই

---

৪৯৫. গুস্তাভ লি বোঁ : *The World of Islamic Civilization* (1974), পৃ. ৪৯৪।

৪৯৬. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৬।

৪৯৭. ভেষজ ওষুধ এবং ওষুধের উপকরণ-সম্পর্কিত গ্রন্থ।

গ্রন্থ المادّة الطبيّة في الحشائش والأدوية المفردة নামে আরবিতে অনূদিত হয়েছে।[৪৯৮] বেশ কয়েকবার এটার অনুবাদ হয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত দুটি : বাগদাদে হুনাইন ইবনে ইসহাকের অনুবাদ[৪৯৯] এবং কর্ডোভায় আবু আবদুল্লাহ আস-সিকিল্লির অনুবাদ। কিছুকাল পরেই মুসলিম ওষুধবিজ্ঞানীরা তাদের চর্চা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই গ্রন্থে অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করেন এবং Dioscorides যেসব বিষয়ের বর্ণনা দেননি সেগুলোর বর্ণনা দেন। এভাবেই ওষুধবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের সূচনা ঘটে এবং ব্যাপকতা লাভ করে। আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি[৫০০] রচনা করেন '*মুজামুন নাবাত*', ইবনে ওয়াহশিয়্যাহ[৫০১] রচনা করেন '*আল-ফিলাহাতুন নাবাতিয়্যাহ*' এবং ইবনুল আওয়াম আল-ইশবিলি[৫০২] রচনা করেন '*আল-ফিলাহাতুল আন্দালুসিয়্যাহ*'। পরবর্তীকালে যারা ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন তারা এই তিনটি গ্রন্থ ও অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

ভেষজবিদ্যা যে মুসলিমদের বিদ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পেছনে একটি রহস্য আছে। তা এই যে, আরবরা যে দেশে বাস করত তার প্রকৃতি-পরিবেশ ছিল খেজুরগাছ রোপণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী... তা

---

৪৯৮. আরবি উৎসগুলোতে গ্রন্থটি আরও কিছু নামে পরিচিত :

كتاب الحشائش، كتاب الحشائش والأدوية، كتاب الخمس مقالات، المقالات الخمس، هيولى الطب، كتاب ديسقوريدوس في الأدوية المفردة.

৪৯৯. এটি আরবিতে অনুবাদ করেছেন মূলত হুনাইনের শিষ্য স্তাফান ইবনে বাসিল, হুনাইন এটির সম্পাদনা করেছেন।-অনুবাদক

৫০০. আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারি : আহমাদ ইবনে দাউদ ইবনে ওয়ানানদ আদ-দিনাওয়ারি (২১২-২৮২ হি./৮২৮-৮৯৫ খ্রি.)। প্রতিভাবান যন্ত্রপ্রকৌশলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ। ইরানের দিনাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ খণ্ডে কুরআনের তাফসির রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশটিরও বেশি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১২৩।

৫০১. ইবনে ওয়াহশিয়্যাহ : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলি ইবনে কাইস ইবনে মুখতার ইবনে আবদুল কারিম ইবনে হারসিয়্যাহ (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি.)। আলকেমিস্ট, কৃষিবিদ, বিষবিশেষজ্ঞ ও মিশরবিদ এবং সুফি। যাদুবিদ্যায়ও কারিকুরি দেখিয়েছেন। যাদুবিদ্যা নিয়ে তিনটি, রসায়নশাস্ত্র নিয়ে দুটি, প্রতীকবিদ্যা নিয়ে দুটি এবং কৃষি নিয়ে একটি বই রচনা করেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ১৭০।

৫০২. ইবনুল আওয়াম আল-ইশবিলি : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ (মৃ. ৫৮০ হি./১১৮৫ খ্রি.)। আন্দালুসীয় বিজ্ঞানী। '*আল-ফিলাহাতুল আন্দালুসিয়া*' গ্রন্থটি রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থের একটি অংশ স্প্যানিশ ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৬৫।

ছাড়া ওই এলাকায় অম্লীয় বৃক্ষ প্রচুর জন্মাত, বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যেত ভেষজ নির্যাস এবং অন্যান্য বস্তু, যা মানুষের উপকার করত এবং ক্ষতিও করত। ফলে তাদের ভূমিতে কী কী বৃক্ষ ও উদ্ভিদ জন্মে তার দিকে আরবদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। মালাবার, সাইলান ও পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকাগুলোয়—যেগুলোর সঙ্গে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল—কী কী উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় সেগুলোর দিকেও তাদের নজর গেল। ফলে যেসব উদ্ভিদ ও বৃক্ষলতা চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরির জন্য উপযোগী, সেগুলো বাছাই করে সংগ্রহ করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেল।[৫০৩]

এই ধরনের উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিয়ে স্থানীয় উদ্ভিদ ও লতাপাতা থেকে কীভাবে সাহায্য নেওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হলো। শুরুর দিকে বিভিন্ন উদ্ভিদের নাম তালিকা আকারে প্রকাশ করে কোষগ্রন্থজাতীয় গ্রন্থ রচিত হলো। উদ্ভিদগুলোর নাম লেখা হলো আরবি, গ্রিক, সুরয়ানি, ফারসি ও বারবারি ভাষায়। একক (অযৌগ) ওষুধসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। এ ক্ষেত্রে প্রায়োগিক প্রচেষ্টাও শুরু হলো। রশিদুদ্দিন আস-সুরি[৫০৪] এই উদ্যোগ নিলেন। তিনি উদ্ভিদে পরিপূর্ণ জায়গাগুলোতে যেতেন এবং তার সঙ্গে থাকত একজন চিত্রকর। তিনি উদ্ভিদগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং খাতায় তার বিবরণী টুকে নিতেন। রশিদুদ্দিন চিত্রকরকে প্রথমবার দেখাতেন উদ্ভিদের প্রাথমিক অবস্থা, যা মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছে; দ্বিতীয়বার দেখাতেন উদ্ভিদের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, যখন ফল বা বীজ বেরিয়েছে এবং তৃতীয়বার দেখাতেন ফলে যাওয়া অবস্থায়। চিত্রকর তিনবারই উদ্ভিদটির ছবি এঁকে নিতেন।[৫০৫]

ভেষজবিদ্যার বিকাশের শুরুর দিকে মুসলিমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এই যে, তারা এতে জবাবদিহির[৫০৬] নীতি ও ওষুধ তত্ত্বাবধানের

---

৫০৩. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮১।

৫০৪. রশিদুদ্দিন আস-সুরি : রশিদুদ্দিন আবুল ফযল ইবনে আলি (৫৭৩-৬৩৯ হি./১১৭৭-১২৪১ খ্রি.)। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। আইয়ুবি সুলতান আল-মালিক আল-আদিলের সহচর। সুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১৪২।

৫০৫. ইবনে আবি উসাইবিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, খ. ২, পৃ. ২১৯।

৫০৬. আরবিতে 'হিসবাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ জবাবদিহি। পরিভাষায় শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সৎকাজ পরিত্যাগ করতে দেখলে সৎকাজের আদেশ করা এবং

বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেন। পেশাটিকে স্বাধীন ব্যবসা থেকে গুটিয়ে এনে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানের অধীনে ন্যস্ত করেন। ফলে যে-কেউ ওষুধ তৈরি ও বিতরণের পেশায় নিয়োজিত হতে পারত না। এটা খলিফা আল-মামুনের যুগের কথা। তিনি এই আইন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ ওষুধ-ব্যবসার পেশায় কতিপয় অসৎ ও প্রতারক ঢুকে গিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ দাবি করত যে তার কাছে সব ধরনের ওষুধ আছে। তারা রোগীদের যেমনটা মিলে সেই ওষুধই গছিয়ে দিত। ওষুধ সম্পর্কে রোগীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারা এই কাজটি করত। ভাবত যে, রোগীরা তো আর কোনটা কীসের ওষুধ তা জানে না। এ কারণে খলিফা আল-মামুন ওষুধ-প্রস্তুতকারীদের আমানত ও দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেন। আল-মামুনের পর খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ (মৃ. ২২৭ হিজরি) যেসব ওষুধ-প্রস্তুতকারী সততা ও দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদের সনদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সনদে উল্লেখ থাকবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওষুধ-ব্যবসা বৈধ। এভাবে ওষুধশিল্প জবাবদিহির সামগ্রিক নীতির আওতায় আসে। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের (৬০৭-৬৪৮ হি./১২১০-১২৫০ খ্রি.) এই ব্যবস্থা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুহতাসিব[৫০৭] শব্দটি বর্তমান সময়েও আরবি উচ্চারণেই স্প্যানিশ ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

সরকার দেশের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করত। ওষুধের বিশুদ্ধতা ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে ওষুধপ্রস্তুতকারীদের জবাবদিহি করতে হতো। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেনাপতি আল-আফশিন (হায়দার ইবনে কাউস) নিজে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ওষুধপ্রস্তুতকারীদের পরিদর্শনে যেতেন এবং তারা যাবতীয় ভালো উপকরণ দিয়ে ওষুধ তৈরি করছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন।[৫০৮]

মন্দকাজ করতে দেখলে মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা। দেখুন, আবুল হাসান আলি আল-মাওয়ারদি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ. ২৪০।-অনুবাদক

৫০৭. যিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করেন। জবাবদিহি চান।

৫০৮. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (1854), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮২।

এভাবে মুসলিমরাই প্রথম ওষুধশাস্ত্রকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হিসবাহ (জবাবদিহি)-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ওষুধালয় ও ওষুধপ্রস্তুতকারীদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করেন।[৫০৯]

ম্যাক্স মেয়েরহফ[৫১০] বলেন, এই যুগে ভেষজবিজ্ঞান নিয়ে কী পরিমাণ পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। একক বা অবিমিশ্র ওষুধের যেমন পুস্তক রচিত রয়েছে, তেমনই মিশ্র বা যৌগিক ওষুধ নিয়েও পুস্তক রচিত হয়েছে। একক ওষুধ নিয়ে যারা পুস্তক রচনা করেছেন, কোনোরূপ তর্কবিতর্ক ছাড়াই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন ইবনুল বাইতার। তার রচিত গ্রন্থের নাম كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (*Compendium on Simple Medicaments and Foods*)।[৫১১] তিনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল, স্পেন ও সিরিয়া থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলোর গুণাগুণ পরীক্ষা করতেন। তিনি তার এই গ্রন্থে ১৪০০টি ভেষজ উদ্ভিদ ও ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। রেফারেন্স হিসেবে ১৫০জন আরব বিজ্ঞানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এই গ্রন্থ তার গভীর অধ্যয়ন, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও ব্যাপক জানাশোনার পরিপক্ব ফল। আরবি ভাষায় উদ্ভিদ সম্পর্কে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।[৫১২]

ওষুধশিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ওষুধপ্রস্তুতকারীরা নতুন নতুন ওষুধ উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে যান। এতে তারা স্থানীয় পরিবেশ থেকেই পরিমিত অনুপাতে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে যৌগিক ওষুধ প্রস্তুতকরণের

---

৫০৯. مبحث إدارة المستشفيات والمراقبة الصحية المجتمع الإسلامي, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *The Preaching of Islam : A history of the Propagation of the Muslim Faith* গ্রন্থ থেকে। আরবি অনুবাদ, تراث الاسلام (১৯৫৪), অনুবাদ ও টীকা সংযোজন, জর্জিস ফাতহুল্লাহ, পৃ. ৫১২।

৫১০. Max Meyerhof (১২৯১-১৩৬৪ হিজরি/১৮৭৪-১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) : জার্মান চক্ষু-চিকিৎসক ও প্রাচ্যবিদ। ইউরোপের বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে মিশর ভ্রমণ করেন এবং কায়রোতে অবস্থান করেন। কায়রোতেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৫১১. উনিশ শতকে গ্রন্থটি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিক মুদ্রণে গ্রন্থটির বিস্তৃতি ৯০০ পৃষ্ঠার বেশি।-অনুবাদক

৫১২. ম্যাক্স মেয়েরহফ, *মাবহাসুত তিব্ব*, থমাস ওয়াকার আর্নল্ড কর্তৃক সম্পাদিত *তুরাসুল ইসলাম*, পৃ. ৪৮৫।

ধাপে উপনীত হন। রসায়নশাস্ত্র থেকে উপকার লাভের ফলে নতুন নতুন ওষুধ তৈরিতে তারা একটি বড় ধাপ পেরিয়ে যান। কিছু ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভে এসব ওষুধ ইতিবাচক প্রভাব রাখে। যেমন অ্যালকোহল প্রস্তুতকরণ, মার্কারি বা পারদের যৌগ তৈরি, অ্যামোনিয়া সল্ট, সিরাপ ও ইমালশন[৫১৩] তৈরি এবং ছত্রাকীয় নির্যাস তৈরি। তা ছাড়া ঐকান্তিক গবেষণা তাদেরকে উৎস ও শক্তিমাত্রার ভিত্তিতে ওষুধের শ্রেণিবিন্যাস প্রস্তুত করার পথ দেখিয়ে দেয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতার বলে এমন কিছু নতুন ভেষজ ওষুধ বা উদ্ভিদের দেখা পান যা পূর্বে পরিচিত ছিল না। যেমন কর্পূর (গাছ), হানজাল বা রাখালশসা[৫১৪] এবং হেনা বা মেহেদি।[৫১৫]

ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য বইপত্র রচিত হয়। ধীরস্থির গবেষণার ফলে নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবিত হতে থাকে। পুরোনো ওষুধ তো আছেই। ওষুধবিজ্ঞানী বা গ্রন্থপ্রণেতাদের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী এসব ওষুধের নামাবলি বিন্যস্ত হয়। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর বিস্তারিত দৃষ্টান্ত আমরা যেসব গ্রন্থে পাই সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আল-

---

৫১৩. একটি তরল পদার্থের মধ্যে অমিশ্রণীয় অপর একটি তরল পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে বিস্তৃত থাকলে সে মিশ্রণকে ইমালশন বা অবদ্রবণ বলা হয়। ইমালশন দুই প্রকার : ১. পানিতে তেল ইমালশন। যেমন দুধ। এখানে পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে তরল চর্বি বিস্তৃত থাকে। ২. তেলে পানির ইমালশন। যেমন কডলিভার অয়েলে কড মাছের লিভারের তেলে পানি, মাখনে চর্বির মধ্যে পানি, আইসক্রিমের ক্রিমের মধ্যে বরফের কণিকা। স্থায়ী ইমালশন তৈরির জন্য তৃতীয় কোনো পদার্থ ইমালশনের সঙ্গে যোগ করতে হয়। এই তৃতীয় পদার্থকে বলা হয় ইমালশনকার বা অবদ্রবণকারক। পানিতে তেল ইমালশনের ক্ষেত্রে ক্ষার ধাতুর সাবান, গাম-অ্যাকাসিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইমালশনকারক। ভারী ধাতুঘটিত সাবান তেলে পানির ইমালশনের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। দুধের ইমালশনকারক হলো ক্যাজিন। জীবাণুনাশক ফিনাইল ও লাইসল পানিতে ঢাললে ইমালশন তৈরি হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং সেই সঙ্গে শিল্প, কৃষি, ওষুধ ও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমালশনের ব্যবহার আছে। ট্যানিং, ডাইয়িং, লুব্রিকেশন শিল্পে ব্যবহৃত কয়েকটি ইমালশন হলো ডিটারজেন্ট, পেইন্ট, বার্নিশ, রেজিন, গাম, গ্লু ইত্যাদি আঠালো পদার্থ।-অনুবাদক

৫১৪. রাখালশসা একটি সপুষ্পক উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Citrullus colocynthis, যা Cucurbitaceae পরিবারভুক্ত। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম গবাক্ষী বা ইন্দ্রবারুণী। ইন্দ্রায়ণ নামেও এটি পরিচিত। রাখালশসার ইংরেজি নামগুলো হলো Bitter apple, Colocynth, Vine of Sodom, Citron, Bitter Cucumber, Egusi, desert gourd ইত্যাদি। এটি লতা-জাতীয় উদ্ভিদ। আদি নিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া ও তুরস্ক। এর লতা অনেকটা তরমুজ লতার মতো, এতে ছোট ও শক্ত তিতা ফল হয়।

৫১৫. কাদরি তাওকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, পৃ. ২৭।

রাজি কর্তৃক রচিত *'কিতাবুল হাবি'*, আল-বিরুনি কর্তৃক রচিত *'আস-সাইদালাহ ফিত-তিব্বি'*, আলি ইবনে আব্বাস কর্তৃক রচিত *'কামিলুস সানাআহ'* এবং ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত *'কিতাবুল কানুন'*।

এই ক্ষেত্রে আল-রাজির রচনাবলি দৃষ্টান্ত হতে পারে। তিনি ওষুধপ্রস্তুতকরণ-সংক্রান্ত কয়েকটি জ্ঞানশাখার ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছেন। সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, প্রস্তুতকরণের পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, সেগুলোর রহস্য ও শক্তি উন্মোচন করেছেন। সেগুলোর বিকল্প কী হতে পারে তাও উল্লেখ করেছেন। যে সময়সীমার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ সম্ভব তা নির্দেশ করেছেন। তিনি ওষুধের উপাদানগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন : ১. মাটির গর্ভজাত বা খনিজ পদার্থসমূহ ২. উদ্ভিতজাত উপাদান ৩. প্রাণীজাত উপাদান এবং ৪. এগুলো থেকে প্রস্তুতকৃত উপাদান।

মুসলিম ওষুধপ্রস্তুতকারীরা ওষুধ প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়ায় বহু নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি পদ্ধতি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ১. আত-তাক্‌তির বা পাতন, তরল পদার্থ শোধন করার প্রক্রিয়া ২. আল-মালগামাহ বা সংমিশ্রণ, পারদকে অন্যান্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণের প্রক্রিয়া ৩. আত-তাসামি বা উর্ধ্বপাতন, কঠিন পদার্থকে তরলে রূপান্তরিত না করেই বাষ্পে পরিণত করা, তারপর সেটাকে কঠিন অবস্থায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া এবং ৪. আত-তাবাল্লুর বা স্ফটিকীকরণ, দ্রবীভূত পদার্থ থেকে স্ফটিক আলাদা করার প্রক্রিয়া ৫. আত-তাকয়িস বা সাধারণ জারণ-প্রক্রিয়া।[৫১৬]

ওষুধবিজ্ঞানে মুসলিমদের আরেকটি আবিষ্কার এই যে, তারা ওষুধকে একবার মধুর সঙ্গে এবং আরেকবার চিনি ও রসের সঙ্গে মেশাতে পারতেন। আরবরা প্রাচীনপন্থীদের বিপরীতে চিনিকে মধুর ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ফলে তারা অনেক উপকারী ওষুধি ফর্মুলা পেয়েছেন।[৫১৭]

আল-রাজিই প্রথম মলম তৈরিতে পারদ ব্যবহার করেন এবং বানরের ওপর প্রয়োগ করে এর কার্যক্ষমতা পরখ করেন। মুসলিম চিকিৎসকেরাই

---

৫১৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫৭।

৫১৭. লুইস সিডিও (Louis-Pierre-Eugène Sédillot), *Histoire des Arabes* (১৮৫৪), আরবি অনুবাদ, *তারিখুল আরাবিল আম*, পৃ. ৩৮৩।

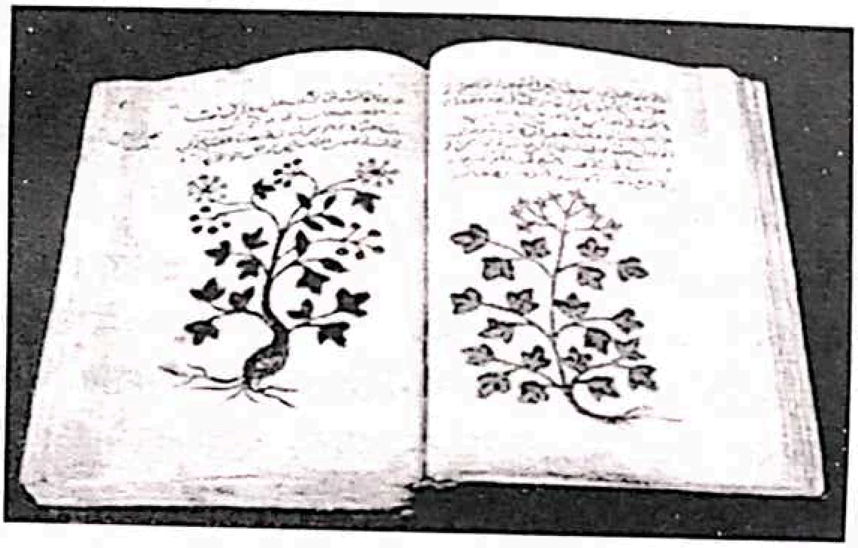
প্রথম বর্ণনা করেন যে, কফি গাছের বীজ হৃদ্‌রোগের ওষুধবিশেষ। তারা আরও বর্ণনা দেন যে, কফিবীজ (বিচূর্ণ কফি) টনসিল, আমাশয় ও দগদগে জখমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তারা বলেন যে, কর্পূর হৃৎপিণ্ডকে সঞ্জীবনীশক্তি দান করে। তারা দারুচিনি বা লবঙ্গের সঙ্গে লেবুর রস বা কমলার রস মিশিয়ে কিছু ওষুধের শক্তিও হ্রাস করেন। তারা বিষের প্রতিষেধক ওষুধও প্রস্তুত করতে সমর্থ হন, যা কয়েক ডজন এবং কখনো কখনো কয়েকশ ওষুধের মিশ্রণে তৈরি করা হতো। আফিমের সঙ্গে পারদ মিশিয়ে উপকারী মিশ্রণ তৈরি করেন। রোগীর অনুভূতিবিলোপ বা অ্যানেসথেসিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ভাং ও আফিমের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু মিশিয়ে কার্যকরী ওষুধ প্রস্তুত করেন।[৫১৮]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা ওষুধ নিয়ে গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (*Compendium on Simple Medicaments and Foods*)। এটি রচনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-মাকালি, যিনি ইবনুল বাইতার নামে সমধিক পরিচিত (মৃ. ৬৪৬ হি./১২৪৮ খ্রি.)। তিনি উদ্ভিদের উৎপাদনস্থানগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং কোনো উদ্ভিদ নিয়ে লেখার আগে সেটার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। ইবনুল বাইতার তার এই গ্রন্থে ইউনানি বা গ্রিক তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন। তিনি এতে প্রায় পনেরোশ ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন। ভেষজ ওষুধ, প্রাণিজ ওষুধ ও খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি ওষুধের বর্ণনা রয়েছে এতে। তিনি এসব ওষুধের ব্যবহাররীতিও বলে দিয়েছেন। আভিধানিক বর্ণমালার ভিত্তিতে ওষুধের নামাবলি সাজিয়েছেন, যাতে খুঁজে পেতে সহজ হয়। এই গ্রন্থে তিনি একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। ভূমিকায় তিনি ওষুধ সম্পর্কে তথ্য সংকলনে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তীদের থেকে আমি যেসব তথ্য নিয়েছি সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি এবং পরবর্তীদের থেকে তথ্যাবলি যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেছি। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে যা বিশুদ্ধ মনে হয়েছে এবং সংবাদের ভিত্তিতে নয় বরং পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত

---

৫১৮. কাদরি তাওকান, *উলামাউল আরব ওয়া-মা আতাওহু লিল-হাদারাহ*, পৃ. ২৭-২৮।

হয়েছে সেটাকেই আমি প্রবহমান ভান্ডাররূপে সংকলন করেছি। এই ক্ষেত্রে সাহায্যগ্রহণের জন্য নিজেকে আল্লাহ ছাড়া কারও মুখাপেক্ষী মনে করিনি। যে ওষুধের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের বা পরবর্তীদের কারও ভ্রান্তি ঘটে গেছে সে ব্যাপারে সতর্ক করেছি। কারণ তাদের অধিকাংশই বিদ্যমান তথ্যাবলি ও সংবাদের ওপর নির্ভর করেছেন। আর আমি নির্ভর করেছি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর, যেমন ইতিপূর্বে তা আমি উল্লেখ করেছি।[৫১৯]



চিত্র নং-১৫
ইবনে বাইতারের গ্রন্থ

ওষুধবিজ্ঞানের ওপর আবু বকর আল-রাজি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *'মানাফিউল আগযিয়া'*, *'সাইদালিয়্যাতুত তিব্ব'*, *'আল-হাবি ফিত-তাদাবি'*। আলি ইবনুল আব্বাস *'কামিলুস সানাআতিত তিব্বিয়্যাহ'* ছাড়াও রচনা করেছেন *'আল-মালাকি'*। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি কেবল ওষুধশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এতে তিনি ত্রিশটি অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। আবুল কাসিম খাল্‌ফ ইবনে আব্বাস আয-যাহরাবি রচনা করেছেন *'আত-তাসরিফু লিমান আজাযা আনিত তালিফ'*। এতে তিনি একটি অধ্যায়ে কেবল ওষুধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দাউদ আল-আনতাকি[৫২০] রচনা করেছেন *'তাযকিরাতু উলিল আলবাবি ওয়াল-*

---

৫১৯. জালাল মাজহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩০৮-৩০৯; মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২২৩।

৫২০. দাউদ ইবনে উমর আল-আনতাকি (মৃ. ১০০৮ হি./১৬০০ খ্রি.) আনতাকিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। ছিলেন অন্ধ। দামেশক, কায়রো, আনাতোলিয়া ভ্রমণ

জামিউ লিল আজাবিল-উজাব। কোহেন আল-আত্তার রচনা করেছেন '*মিনহাজুদ দাক্কান ওয়া দাসতুরুল আয়ান*'। ইবনে যাহর আল-আন্দালুসি[৫২১] রচনা করেছেন '*আল-জামিউ ফিল-আশরিবাতি ওয়াল মাজুনাত*'। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ইদরিস রচনা করেছেন '*আল-জামিউ লি-সিফাতি আশতাতিন নবাতাত ওয়া দুরুবি আনওয়াইল মুফরাদাতি মিনাল আশজারি ওয়াল-আসমার ওয়াল-উসুল ওয়াল-আযহার*'। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাফিকি রচনা করেছেন '*জামিউল আদবিয়াতিল মুফরাদাহ*'। আল-কিন্দি চিকিৎসা ও ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে বাইশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। '*ফিরদাউসুল হিকমা*'-কে তাবারি কর্তৃক ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে রচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। এটি ওষুধবিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে পুরোনো কোষগ্রন্থ।

ওষুধবিজ্ঞানের নিয়মনীতি নির্ধারণ এবং তার বিকাশ ও ব্যাপকতা সাধনে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে তা-ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওষুধবিজ্ঞান নিয়ে তারা অসংখ্য মূল্যবান স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, ফলে এটি প্রকৃত অর্থেই একটি বিজ্ঞানশাখার মর্যাদা পেয়েছে।

করেছেন। শেষে মক্কায় ভ্রমণ করে সেখানেই স্থির হন। মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب (ভেষজ-বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ, ৩০০০টি ভেষজ উদ্ভিদের পরিচয় রয়েছে, পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত), رسالة في الفصد والحجامة (চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ) এবং দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ حجر الفلاسفة। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৮, পৃ. ৪১৫-৪১৬।

৫২১. ইবনে যাহর আল-আন্দালুসি : আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে যাহর ইবনে আবদুল মালিক আল-ইশবিলি (৪৬৪-৫৫৭ হি./১০৭২-১১৬২ খ্রি.)। চিকিৎসক। সেভিলের বাসিন্দা। তার যুগে তার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : التيسير في المداواة والتدبير। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১১০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভূতত্ত্ববিদ্যা

কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে ভূস্তর-সম্পর্কিত বিদ্যার (জিয়োলজি)[৫২২] প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾

আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।[৫২৩]

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।[৫২৪]

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾

আমি তো তোমাদের দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি।[৫২৫]

এগুলো ছাড়াও আরও বহু আয়াত বিজ্ঞানের এই শাখা অর্থাৎ ভূবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। এ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীরা ভূতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন কালেও মানবজাতির খনিজ ও আকরিক সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধি ছিল। তবে তা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। গ্রিক

---

৫২২. ভূতত্ত্ব বা ভূবিদ্যা (geology) : ভূস্তর, শিলা ইত্যাদি ভিত্তিক পৃথিবীর ইতিহাস-সম্পর্কিত বিজ্ঞান। ভূবিজ্ঞানের এই শাখায় পৃথিবী, পৃথিবীর গঠন, পৃথিবী গঠনের উপাদানসমূহ, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস এবং তার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়।-অনুবাদক

৫২৩. সুরা ফাতির : আয়াত ২৭।

৫২৪. সুরা হাদিদ : আয়াত ২৫।

৫২৫. সুরা আরাফ : আয়াত ১০।

বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে অ্যারিস্টটল (৩৮৩-৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পৃথিবীকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেন : প্রথমত জমিন, যা পানি, আগুন, বায়ু ও মাটি এই চারটি উপাদানের দ্বারা গঠিত এবং দ্বিতীয়ত আকাশ, যা ইথারের দ্বারা গঠিত। ইসলামের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত অ্যারিস্টটলের মতামতই আধিপত্য বিস্তার করে ছিল। ইসলাম এসে যাবতীয় রূপকথা, কল্পকাহিনি ও গালগল্পের অবসান ঘটিয়েছে।[৫২৬]

মুসলিমগণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রতিটি বিষয় নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সত্য উদ্‌ঘাটনে গবেষণায় ব্রতী হন। ফলে তার প্রাকৃতিক ঘটনাবলির বিচার-বিশ্লেষণে এবং পাথর ও শিলা, পাহাড়-পর্বত ও আকরিক বস্তুরাশির ব্যাখ্যায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। অসংখ্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলি, যেমন ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, জোয়ারভাটা, পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকার গঠন, নদীনালা, স্রোতপ্রবাহ ইত্যাদির কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন করেছেন। ভূবিজ্ঞানে মুসলিমদের প্রথম কীর্তি সম্ভবত কোষগ্রন্থ ও অভিধানগুলোতে সংকলিত এই জ্ঞান-সম্পর্কিত শব্দভাণ্ডার। যেমন ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি কর্তৃক রচিত অভিধান '*আস-সিহাহ*', আল-ফাইরুজাবাদি[৫২৭] কর্তৃক রচিত অভিধান '*আল-কামুসুল মুহিত*', ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি[৫২৮] কর্তৃক রচিত '*আল-মুখাসসাস*'। ভ্রমণ এবং দেশ ও অঞ্চল-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আরও রয়েছে ভৌগোলিক

---

৫২৬. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯১।

৫২৭. আল-ফাইরুজাবাদি : আবু তাহির মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ (৭২৯-৮১৭ হি./১৩২৯-১৪১৫ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম ইমাম। ইরানের শিরাজ নগরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়ামেনের যুবাইদে মৃত্যুবরণ করেন। '*আল-কামুসুল মুহিত*' তার বিখ্যাত রচনা এবং তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হলো البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ১২৬।

৫২৮. ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি : আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল, ইবনে সিদাহ আল-মুরসি নামে পরিচিত (৩৯৮-৪৫৮ হি./১০০৭-১০৬৬ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইমাম। ছিলেন অন্ধ। আন্দালুসের মুরসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন আন্দালুসেরই দানিয়ায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المخصص، المحكم والمحيط الأعظم، الأنيق، شرح إصلاح المنطق، شرح ما أشكل من شعر المتنبي، العلام في اللغة على الأجناس، الوافي في علم أحكام العالم والمتعلم، القوافي। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০-৩৩১।

গবেষণামূলক গ্রন্থাবলি, যেমন হাসান ইবনে আহমাদ আল-হামদানি কর্তৃক রচিত '*সিফাতু জাযিরাতিল আরাব*'।

তারপর আমরা যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞানচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে স্পষ্টভাবে পেয়ে যাই ভূতত্ত্ববিদ্যার সীমারেখা। যেমন আল-কিন্দি, আল-রাজি, আল-ফারাবি, আল-মাসউদি, ইখওয়ানুস সাফা, আল-মাকদিসি[৫২৯], আল-বিরুনি, ইবনে সিনা, আল-ইদরিসি, ইয়াকুত হামাবি, আল-কাযবিনি[৫৩০] এবং আরও অনেকে।

এ সকল জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব পেশ করেছেন, ভূমিকম্পের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেছেন, খনিজ বস্তুরাশি ও শিলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পাললিক শিলা ও অশ্মীভূত বস্তুর পরিচয় প্রদান করেছেন। তা ছাড়া শিলার মাত্রাগত রূপান্তর (ডাইমেনশনাল ট্রান্সফরমেশন) সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন। উল্কা ও উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে তারা লিখেছেন। উল্কার প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছেন। উল্কাপিণ্ডকে তারা দুই ভাগে ভাগ করেছেন, পাথুরে উল্কাপিণ্ড ও লৌহ উল্কাপিণ্ড। তারা এগুলোর আকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্কশ ও এবড়োখেবড়ো উল্কা। ভূগর্ভের তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেছেন। ভঙ্গিল পর্বত[৫৩১] স্তূপ

---

৫২৯. আল-মাকদিসি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর আল-বিনা (৯৪৫-৯৯১ খ্রি.)। ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার উদ্দেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। ফলে অধিকাংশ দেশ সম্পর্কে তার জানা হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হন এবং প্রায় সব মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। এ বিষয়ে তার অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত আছে তার বিখ্যাত গ্রন্থ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم-এ। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৫, পৃ. ৩১২।

৫৩০. আল-কাযবিনি : যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ (৬০৫-৬৮২ হি./১২০৮-১২৮৩ খ্রি.)। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। কাজি ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : آثار البلاد وأخبار العباد ,عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات। দেখুন, যাহাবি, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ২, পৃ. ২২; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৪৬।

৫৩১. ভঙ্গিল পর্বত : ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার উঁচু-নিচু ভাঁজ। পৃথিবীর উচ্চতম অধিকাংশ পর্বত এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অংশে প্রবল পার্শ্বচাপের ফলে ভূভাগে ক্রমোন্নতি-অবনতির সৃষ্টি হলে সেই স্থানটিতে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পর্বতগুলো কখনো কখনো ৫০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতার হয়। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ।-অনুবাদক

পর্বত[৫৩২] ও অন্যান্য শ্রেণিতে পর্বত-বিভাজনের যে তত্ত্ব তাও তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কী কী কারণে পাহাড়ে ধস নামে এবং নদীপাড়ের মাটি ক্ষয়ে যায় তাও তারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ভূবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ভূবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা উপহার দিয়েছেন। এসব গবেষণায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান জলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে দালিলিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের রচনাবলিতে জলের এসব অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নদীনালা গঠনে তাদের মতামত নির্ভেজালভাবে বৈজ্ঞানিক। ইখওয়ানুস সাফার প্রবন্ধসমগ্র (*রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা*), ইবনে সিনার *'আন-নাজাত'* কিতাবে এবং আল-কাযবিনির *'আজায়িবুল মাখলুকাত'* গ্রন্থে আমরা এসব মতামত ও বক্তব্য পাই। একইভাবে কেলাসবিজ্ঞান (Crystallography) সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন আল-বিরুনি। তার হাতেই বিজ্ঞানের এই শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তার রচিত *'আল-জামাহির ফি মারিফাতিল জাওয়াহির'*[৫৩৩] গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। তারপর এই বিজ্ঞান বিকশিত হয় আল-কাযবিনির হাতে, তিনি তার *'আজায়িবুল মাখলুকাত'* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তারা দুজন যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার বিবরণ তাদের কিতাবে পাওয়া যায়, তাতে কেউই তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেই বিজ্ঞানশাখা নিয়েও আলোচনা করেছেন যাকে আমরা খনিজ তেল-বিষয়ক বিজ্ঞান (বা পেট্রোলিয়াম জিয়োলজি) বলতে পারি। এটি প্রায়োগিক ভূবিজ্ঞানের একটি শাখা। তারা দুই ধরনের খনিজ তেলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং দুই ধরনের তেলই তারা ব্যবহার করেছেন। তারা তেল অনুসন্ধান (পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন) সম্পর্কেও

---

[৫৩২]. স্তূপ পর্বত : ভূ-আলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ ও সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ ও সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটল তৈরি হয়। কালক্রমে এসব ফাটল বরাবর ভূত্বক স্থানচ্যুত হয়। ভূগোলের ভাষায় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এমন স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে হয়, কোথাও হয় নিচের দিকে। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে। ভারতের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।-অনুবাদক

[৫৩৩]. গ্রন্থটির বিষয়বস্তু আকরিক ও খনিজ পদার্থ, শিলা ও পাথর।

আলোচনা করেছেন এবং তেল অনুসন্ধানের কয়েকটি নকশাও তারা প্রদান করেছেন।

মুসলিমদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিজ্ঞানীদের অনেকেই পৃথিবীর গঠন, স্থলভাগ ও জলভাগের বিভাজন এবং ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ-বিষয়ক গবেষণায় গুরুত্বারোপ করেছেন। পৃথিবীর গঠনের বাহ্যিক উপাদান নিয়েও তারা আলোকপাত করেছেন। যেমন নদীনালা, সমুদ্র, বায়ু, সামুদ্রিক ঝড় ইত্যাদি। যেসব অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভূত্বকে পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিয়েও তারা চিন্তাভাবনা করেছেন। যেমন আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ভূমিধস ও স্থানচ্যুতি। স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে স্থানের অদলবদল এবং এই অদলবদলের সময়সীমা সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেছেন। নদীর উৎপত্তি ও উচ্ছল প্রবাহ, তারপর বার্ধক্য এবং তারপর মৃত্যু—এসব বিষয় নিয়েও আলোকপাত করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিমদের অধীত ভূতত্ত্ববিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানশাখার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই এগিয়েছে। যা তার বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভে সাহায্য করেছে। তখনকার বিজ্ঞানীদের এটাই ছিল রীতি। বিজ্ঞানশাখাগুলোর মধ্যে এখনকার মতো সূক্ষ্ম বিভাজন ছিল না, বরং ব্যাপক ও সামগ্রিক অধ্যয়ন-গবেষণা ছিল। তাই মুসলিম বিজ্ঞানীদের জিয়োলজি ও ভূবিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কাজগুলো বিভিন্ন নামের অসংখ্য গ্রন্থাবলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন আমরা দেখি যে, ইবনে সিনা তার '*আশ-শিফা*' গ্রন্থে খনিজ পদার্থ ও আবহাওয়া-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে আকরিক ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি[৫৩৪] আবহবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্যা নিয়েও আলোকপাত করেছেন তার '*নিহায়াতুল আরাবি ফি ফুনুনিল আদাব*' গ্রন্থে। আল-মাসউদি তার '*মুরুজুয যাহাবি ওয়া মাআদিনুল*

---

৫৩৪. আন-নুওয়াইরি : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আহমাদ আল-বাকরি (৬৭৭-৭৩৩ হি./১২৭৮-১৩৩৩ খ্রি.)। বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানী গবেষক। মিশরের বনি সুওয়াইফের একটি গ্রাম নুওয়াইরার দিকে সম্পর্কিত করে তাকে আন-নুওয়াইরি বলা হয়। মূলত তিনি কাওসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। '*নিহায়াতুল আরাবি ফি ফুনুনিল আদাব*' তার সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল-কামিনাহ*, খ. ১, পৃ. ২৩১।

জাওহার' কিতাবে ভৌগোলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভূতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর পর্যালোচনাও করেছেন।[৫৩৩]

ভূমিকম্প

আদিকাল থেকেই ভূমিকম্পের বিষয়টি মানুষের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রেখেছে। কতিপয় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ভূ-অভ্যন্তরীণ বায়ুপ্রবাহের ফলে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবীর গভীর তলদেশে রয়েছে আগুন, তাই দেখা দেয় ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও কার্যকারণ-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ পায় মুসলিমদের হাতে, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে)। মুসলিম বিজ্ঞানীরা তখন ভূমিকম্প, ভূমিকম্প সংঘটনের ইতিহাস ও ভূকম্পনপ্রবণ এলাকাগুলোর ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান করেন। ভূমিকম্পের প্রকারভেদ, তার শক্তিমাত্রা, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসলীলা এবং এর ফলে উদ্‌গত শিলারাশির স্থানান্তর ও তার অপকার-উপকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার ওপর জোর দেন। ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় তার কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন কেউ কেউ। ইবনে সিনার *'আশ-শিফা'* গ্রন্থের খনিজ পদার্থ ও আবহাওয়া-সম্পর্কিত অংশে, ইখওয়ানুস সাফার *'রাসায়িল'-এ* এবং আল-কাযবিনির *'আজায়িবুল মাখলুকাত'-এ* এসব বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারা সবাই তাদের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে ইবনে সিনার বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য, তা সংঘটনের কারণ ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে ইবনে সিনা বলেছেন, ভূমিকম্প হলো পৃথিবীর কোনো একটি অংশের কম্পন, যা তার অভ্যন্তরীণ কারণে সৃষ্টি হয়। ভূ-অভ্যন্তরে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তার ফলে আবশ্যকভাবে ওই অংশের ভূত্বকও কেঁপে ওঠে। ভূ-অভ্যন্তরে যে অংশটির নড়ে ওঠা সম্ভব তা হয়তো বাষ্পীভূত, ধূমায়িত ও বাতাসের মতো প্রবলবেগ কাঠামো, বা খরস্রোতা জলীয় কাঠামো, অথবা বায়বীয় কাঠামো, কিংবা আগ্নেয় কাঠামো অথবা ভূমি-কাঠামো। অবশ্য

---

৫৩৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯১ থেকে উদ্ধৃত।

ভূমি-কাঠামোর কম্পনের জন্য এমন একটি কারণ দরকার, যা এই ভূত্বকের কম্পনের কারণের অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে প্রথম কারণটিই ভূমিকম্পের সংঘটক। অন্যদিকে বায়বীয় কাঠামো–চাই তা আগ্নেয় হোক বা অন্যকিছু–নিজেই ভূ-অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূত্বকে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।[৫৩৬]

ইখওয়ানুস সাফা ভূমিকম্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ভূ-অভ্যন্তরের উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। ওসব গ্যাসই ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে। যদি ওই ভূখণ্ডের জমিন আলগা-আলগা হয় তবে সেসব গ্যাস ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অন্যথায় ভূমিতে ফাটল ধরে ও সেসব গ্যাস বেরিয়ে পড়ে এবং ভূমিতে ধস নামে। ফলে তীব্র আওয়াজ ও কম্পন অনুভূত হয়।[৫৩৭]

খনিজ ও শিলা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান পাথরসমূহের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেগুলোর প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করেছেন। খনিজ পদার্থ ও শিলারাশির স্তরবিন্যাস সাজিয়েছেন এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বর্ণনা প্রদান করেছেন। খনিজ পদার্থ ও মূল্যবান পাথর কোথায় পাওয়া যায় সেসব জায়গাও চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট আর কোনটি অপকৃষ্ট তা নির্ণয় করার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিয়েছেন। পাললিক শিলার গঠন, তার উপরিভাগের গঠন, উপত্যকার পলল, ভূমির সঙ্গে সমুদ্রের ও সমুদ্রের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক এবং সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট পাথুরে কাঠামো ও ভূমিক্ষয়ের কার্যকারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

সম্ভবত উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাসিব[৫৩৮] প্রথম ব্যক্তি যিনি আরবি ভাষায় পাথর সম্পর্কে বই রচনা করেছেন। এই বইটির নাম '*মানাফিউল*

---

৫৩৬. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬৪; আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩১৪।

৫৩৭. ইখওয়ানুস সাফা, *রাসায়িলু ইখওয়ানিস সাফা*, খ. ২, পৃ. ৯৭, দারু সাদির, বৈরুত।

৫৩৮. উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ : উতারিদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাবিলি আল-বাগদাদি (মৃ. ২০৬ হি./৮২১ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. العمل بالأسطرلاب ২. تركيب الأفلاك। দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৬।

আহজার। তিনি এই বইয়ে মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথরের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।[৫৩৯] আল-রাজি এই বইটির কথা তার '*আল-হাবি*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল-বিরুনির যুগ পর্যন্ত মুসলিমরা ভূমি থেকে উত্তোলিত বস্তুরাশির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ৮৮টি মণিমাণিক্য ও মূল্যবান পাথরের সন্ধান পেয়েছেন।

ইবনে সিনা তার '*আশ-শিফা*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনটি কারণে শিলা গঠিত হয়। মাটি শুষ্ক হতে হতে তা থেকে গঠিত হয়, পানি বাষ্পীভূত হওয়ার ফলেও শিলা গঠিত হয় এবং পলল জমেও শিলা গঠিত হয়। তিনি খনিজ পদার্থগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন : শিলা বা পাথর, গন্ধক বা সালফার, লবণ বা দ্রবীভূত বস্তুসমূহ। ইবনে সিনা ধাতুসমূহেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলোর গঠনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বহু আকরিক ও খনিজ পদার্থের নাম উল্লেখ করে সেগুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এসব পদার্থের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে বজায় থাকে তাও উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক পদার্থের বিশেষ গঠনরূপ রয়েছে, আমাদের পরিচিত রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় সেগুলোর পরিবর্তন ঘটে না। যা ঘটা সম্ভব তা হলো ধাতুর আকৃতি ও কাঠামোর বাহ্যিক পরিবর্তন।[৫৪০]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা খনিজ পদার্থসমূহের প্রাকৃতিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাহ্যিক কার্যকারণের ফলে সেগুলোর বিশেষ গুণ ও স্বভাবে কী ধরনের পদার্থগত পরিবর্তন সাধিত হয় তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু খনিজ পদার্থ প্রাকৃতিকভাবেই নির্দিষ্ট জ্যামিতিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং তাদের এরূপ গঠনে মানুষের কোনো হাত নেই। আমরা বর্তমান সময়ে যাকে কেলাসবিজ্ঞান নাম দিয়েছি তারই প্রাথমিক লক্ষণ ছিল এটা। আল-বিরুনি এসব পদার্থের কয়েকটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উপরিভাগ পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কাঠামো জ্যামিতিক। তিনি উদাহরণ হিসেবে হীরার কথা উল্লেখ করেছেন। হীরার আকৃতি তার একান্ত নিজস্ব, মোচাকার বহুভুজী। কোনো কোনো হীরা হয়ে থাকে যৌগিক

---

৫৩৯. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬১।
৫৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

ত্রিভুজাকৃতির, অগ্নিসদৃশ তলগুলো পরস্পর সংলগ্ন, আবার কোনো কোনো হীরা আছে দ্বৈত পিরামিড আকৃতির।

শিলার উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে মুসলিম বিজ্ঞানীরা আলোকপাত করেছেন। জলপ্রবাহের ফলে পলল জমে যে শিলা গঠিত হয়েছে তা হলো পাললিক শিলা[৫৪১] এবং অগ্নিময় অবস্থা থেকে যে শিলার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো আগ্নেয় শিলা[৫৪২]। তা ছাড়া তারা অসংখ্য শিলা ও ধাতুর নির্দিষ্ট ভর বের করেছেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যথাযথ। ভূবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তারা ভূ-সংস্থান[৫৪৩], ভূ-প্রকৃতি, জলীয় ভূতত্ত্ব[৫৪৪], জীবাশ্মবিজ্ঞান, মহাকাশীয় প্রভাব বা আবহবিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আবহবিদ্যা বা আবহাওয়াবিজ্ঞান হলো ভূবিদ্যা ও জলবায়ুবিজ্ঞানের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক।[৫৪৫]

---

৫৪১. পৃথিবীর শুরু থেকে যেসব শিলা উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে কঠিন হয়েছে তা-ই আগ্নেয় শিলা। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এ শিলার সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে আগ্নেয় শিলা বলে। আগ্নেয় শিলার অন্য নাম অস্তরীভূত শিলা (Unstratified Rock), প্রাথমিক শিলা। আগ্নেয় শিলা স্ফটিকাকার, অপেক্ষাকৃত ভারী, কঠিন ও কম ভঙ্গুর। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। যেমন গ্রানাইট, গ্যাব্রো, ব্যাসল্ট, ডাইক, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ ইত্যাদি।

৫৪২. পলি বা পলল সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তা পাললিক শিলা। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা নরম ও হালকা, সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পাললিক শিলায় জীবাশ্ম যেমন দেখা যায়, তেমনই ছিদ্রও দেখা যায়। যেমন চুনাপাথর, কয়লা, নুড়িপাথর, বেলেপাথর, পলিপাথর, চক, কোকিনা, লবণ, ডোলোমাইট, জিপসাম, ডায়াটম ইত্যাদি।-অনুবাদক

৫৪৩. ভূ-সংস্থান (Topography) : যেকোনো ভৌগোলিক এলাকার প্রাকৃতিক এবং মানবিক দৃশ্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ ও উপস্থাপনকে ভূ-সংস্থান বলে। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি বলতে যেকোনো এলাকার উদ্ভিদ, প্রাণী, নদনদী, ভূমির বন্ধুরতা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বিবরণকে বোঝায়। মানবিক দৃশ্যাবলি বলতে যেকোনো এলাকার বসতি, নগর-বন্দর, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ, অফিস-আদালত, পরিবহন ইত্যাদির বিবরণকে বোঝায়। ভৌগোলিক পঠনপাঠনের জন্য যেকোনো এলাকার প্রাকৃতিক ও মানবিক দৃশ্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো ভৌগোলিক এলাকার যাবতীয় প্রাকৃতিক ও মানবিক দৃশ্যাবলির বিভিন্ন সূচক ও চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত মানচিত্রকে ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (Topographic Map) বলে। এটি হলো বৃহৎ স্কেল বা মাপনীর মানচিত্র।-অনুবাদক

৫৪৪. হাইড্রোগ্রাফি বা পৃথিবীর জলভাগ সম্বন্ধে গবেষণামূলক বিজ্ঞান।-অনুবাদক

৫৪৫. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

সমুদ্র ও জোয়ারভাটা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের ভূগোল-সংশ্লিষ্ট রচনাবলিতে সমুদ্র ও নদীভিত্তিক ভূতত্ত্ব নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন, যা অন্যকোনো বিষয় নিয়ে করেননি। ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে তারা আলাদা আলাদা অধ্যায় রচনা করেছেন, যেখানে সমুদ্রসমূহের নাম, সমুদ্রের অবস্থান ও সমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। স্থলভাগের যেসব জায়গা একসময় নদী ও সমুদ্র ছিল এবং অতীতকালের যেসব জনপদ সমুদ্রে পরিণত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নৌচালনবিদ্যা নিয়ে তারা গ্রন্থ রচনা করেছেন। জোয়ারভাটার ঘটনাবলি—যার ওপর নদীপথে ও সমুদ্রপথে চলাচলের সময় জাহাজের নাবিকেরা নির্ভর করে থাকেন—সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এসব বিষয়ে যে-সকল মুসলিম বিজ্ঞানীর নিজস্ব মতামত ও বক্তব্য ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে আল-কিন্দি, আল-মাসউদি, আল-বিরুনি, আল-ইদরিসি, আল-মাকদিসি প্রমুখ।

যেসব গ্রন্থে দেশ ও অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে তার কোনোটিই নদী ও সমুদ্র-সম্পর্কিত বিবরণ থেকে মুক্ত নয়। আল-মাসউদি তার *'আখবারুয যামান'* কিতাবে সমুদ্রের গঠন ও তার কার্যকারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য কী তা নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার *'মুরুজুয যাহাব'* কিতাবে একগুচ্ছ ভূতাত্ত্বিক পর্যালোচনা রয়েছে, যেখানে সমুদ্র ও নদী এবং জোয়ারভাটা সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। তিনি সমুদ্র সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন, যার নাম ذكر الأخبار عن انتقال البحار (সমুদ্রের স্থানান্তর-সম্পর্কিত তথ্যাবলি)।[৫৪৬]

আল-মাকদিসি এসব সমুদ্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমূহ এবং বিপজ্জনক স্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি জোয়ারভাটা-সংক্রান্ত ঘটনাবলির উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।[৫৪৭]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জলীয় পৃষ্ঠের (সমুদ্রপৃষ্ঠের) বিস্তৃতি পরিমাপ করেছেন এবং স্থলভাগের সঙ্গে মিলে তার আয়তন কতটা বিশাল হয় তাও

---

৫৪৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ২১৯।

৫৪৭. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৩১০।

জানিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠের নানা প্রকারের উঁচু গঠন সম্পর্কে তারা আলোকপাত করেছেন। এসব উঁচু গঠনের ফলেই সমুদ্রের জলরাশি পৃথিবীকে তলিয়ে দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইয়াকুত হামাবি বলেছেন, এসব উঁচু অংশ না থাকলে (সমুদ্রের) পানি স্থলভাগের চারপাশ ঘিরে তাকে নিমজ্জিত করে ফেলত। ফলে পৃথিবীর কোনো স্থলভাগই প্রকাশ পেত না। পৃথিবীর জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ কতটুকু সে সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ পাই আবুল ফিদার কাছে। তিনি তার '*তাকবিমুল বুলদান*' কিতাবে জলভাগ ও স্থলভাগের অনুপাত উল্লেখ করে বলেছেন, ভূপৃষ্ঠের যে অংশ জলে আচ্ছন্ন তার পরিমাণ ৭৫%। পৃথিবীর যে অংশ উন্মোচিত বা দৃশ্যমান তা প্রায় এক চতুর্থাংশ, আর বাকি তিন চতুর্থাংশ সমুদ্রে নিমজ্জিত।[৫৪৮]

ভূপ্রকৃতিবিজ্ঞান বা ভূমিরূপবিদ্যা

মুসলিম বিজ্ঞানীরা জিয়োমোরফোলজি (ভূপ্রকৃতিবিজ্ঞান) বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা করেছেন। তারা এমন কিছু বাস্তবিক সত্যে উপনীত হয়েছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কালগত কার্যকারণের ভূমিকা ও প্রভাব, স্থলভাগ ও জলভাগের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় শিলাচক্র ও জ্যোতিশ্চক্রের প্রভাব, ইরোশন বা ক্ষয়কার্যে পানি, বাতাস ও জলবায়ু এদের প্রত্যেকটির সাধারণ ভূমিকা। বিজ্ঞানের এই দিকটি যারা ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল-বিরুনি। ভারতবর্ষের একটি সমতলভূমির গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই জায়গায় একটি সমুদ্র অববাহিকা ছিল। এখানে পলি জমতে থাকে এবং পলি জমতে জমতে একসময় তা সমতলভূমিতে পরিণত হয়। নদীর পলি সঞ্চিত হওয়ার ঘটনাও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিশেষ করে যখন নদী মোহনার কাছাকাছি আসে তখন পলি বেশি জমে। মূল নদী তার উৎসের কাছে বড় আকারের হয় এবং মোহনার কাছাকাছি এসে তা তুলনামূলক ছোট আকার ধারণ করে। আল-বিরুনির বক্তব্য, পাহাড়ের কাছে পাথরগুলো বড় বড় এবং নদীর জলের প্রবাহও তীব্র, দূরে এসে পাথরগুলো হয় ছোট এবং জলের প্রবাহও থিতিয়ে আসে। জলের প্রবাহ

---

৫৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২-৩২৪।

ধীর হয়ে এলে সমুদ্রে প্রবেশপথের কাছাকাছি বালু জমতে থাকে। তাদের এসব সমতলভূমি প্রাচীন কালে সমুদ্র ছিল, তারপর জলপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বালু ও পলি জমে তা সমতলভূমিতে পরিণত হয়।[৫৪৯]

জিয়োমোরফোলজির ক্ষেত্রে ইবনে সিনার বক্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিক তাত্ত্বিক মতামতের কাছাকাছি। উদাহরণত, তিনি কিছু পাহাড় গঠনের ক্ষেত্রে দুটি কার্যকারণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। একটি হলো প্রত্যক্ষ কার্যকারণ, অপরটি পরোক্ষ। যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী ভূমিকম্প ভূমির একটি অংশকে স্থানান্তর করে ফেলে তখন সরাসরি ছোট পাহাড় জেগে ওঠে। এটি প্রত্যক্ষ কারণ। যখন ঝড়ো হাওয়া বা খাত সৃষ্টিকারী খরস্রোতা জল পার্শ্ববর্তী ভূমির কিছু অংশের ক্ষয় ঘটায় এবং কিছু অংশ স্বাভাবিক থাকে, ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ নিচু হয়ে যায় এবং তার পাশের অংশ উঁচু থাকে। তারপর এই নিচু অংশ দিয়ে জলপ্রবাহ তার পথ তৈরি করে নেয় এবং তা ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে। পাশের অংশ উঁচু টিলার মতোই থেকে যায়। এটা হলো পরোক্ষ কারণ।[৫৫০]

আবহবিদ্যা (মিটিয়োরোলজি)

মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবহবিদ্যা[৫৫১] বা আবহাওয়াবিজ্ঞানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তারা এই বিজ্ঞানকে علم الآثار العلوية (উচ্চ প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান) নামে আখ্যায়িত করেছেন। বায়ুমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, ঘনত্ব, তাপমাত্রার স্তর, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ও বৃষ্টি এই বিজ্ঞানের মূল বিষয়। একে علم الأرصاد الجوية (আবহাওয়া বিজ্ঞান)-ও বলা হয়। অবশ্য আরও আগে আরব ভাষাবিজ্ঞানীরা এই বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বহু পরিভাষা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে কিছু পরিভাষা এখানে উল্লেখ করা হলো। তারা কম তাপমাত্রাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন।

---

৫৪৯. আল-বিরুনি, *তাহকিক মা লিল হিন্দ*, পৃ.৮০।

৫৫০. প্রাগুক্ত।

৫৫১. আবহাওয়াবিজ্ঞান বা আবহবিদ্যা (Meteorology) : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার বিভিন্নতা নিয়ে যে বিজ্ঞান তার নাম আবহবিদ্যা। আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর বেগ, তাপমাত্রা, চাপ, বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, শিশির, কুয়াশা, তুষারপাত, বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক পদার্থ (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন) ইত্যাদির পরিমাণ পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করেন, আবহাওয়া সম্পর্কে অনুমান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

যথা : বার্‌দ (ঠান্ডা), হার্‌র (উষ্ণ), কুর্‌র (ঠান্ডা), যামহারির (অতিশয় ঠান্ডা), সাকআ (হিম বা হিমাঙ্কের নিচের ঠান্ডা), সির্‌র (প্রচণ্ড ঠান্ডা), আরিয (বিপজ্জনক ঠান্ডা)। বেশি তাপমাত্রাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। যথা : হার্‌র (উষ্ণ), হারুর (বেশি গরম), কায়য (অতিশয় গরম), হাজিরাহ (তীব্র গরম), ফায়হ (আগুনের মতো গরম)। তারা বায়ুকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে অথবা বায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুসারে। বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে বায়ুর প্রকার : শাম্‌আল, শামাল, শামিয়া (উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), জানুব বা তায়াম্মুন (দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), সাবা (পুব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), দাবুর (কাবার পেছন থেকে প্রবাহিত বায়ু), আস-সাবাবিয়্যাহ (উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আল-আযয়াব (দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আদ-দাজিন (দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু), আল-জারয়াবা (উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু)। বৈশিষ্ট্য অনুসারে বায়ুর প্রকার : গরম বায়ুকে বলা হয় সামুম, শীতল বায়ুকে বলা হয় সারসার, বর্ষণমুখর বায়ুকে বলে মু'সিরা এবং বর্ষণহীন বায়ুকে বলে আকিম।

আরব ভাষাবিজ্ঞানীরা মেঘেরও বিভিন্ন নাম দিয়েছেন যা সেগুলোর বিভিন্ন অংশ ও গঠনের স্তরসমূহকে নির্দেশ করে। যেমন গামাম (এমন মেঘ যার দ্বারা আকাশের চেহারা পালটে যায়), মুয্‌ন (বৃষ্টিমুখর সাদা মেঘ), সাহাব (বজ্রহীন ও ঝড়হীন বর্ষণমুখর মেঘ), আরিদ (দিগন্তে ভাসমান মেঘ), দিমাহ (ঝড়-বজ্রহীন স্থির মেঘ), রাবাব (সাদা মেঘ)। মেঘের অংশসমূহ: হাইদাব, মানে নিচের মেঘ, কিফাফ, মানে উপরের মেঘ; রাহা, মানে মধ্যবর্তী স্তরে ভাসমান মেঘ, খিনদিয, মানে মেঘের দূরবর্তী প্রান্ত, বাওয়াসিক, মানে মেঘের সর্বোচ্চ অংশ। যে পানি আকাশ থেকে নামে বা কম তাপমাত্রার কারণে জমে যায় তারও বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন কাত্‌র (ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বৃষ্টিজল), নাদা (শিশির), সাদা (রাতের শিশির), দাবাব (কুয়াশা), তাল্‌ল (কুয়াশার মতো বৃষ্টি), গায়স (বৃষ্টি), রাযায (ঝিরিঝিরি বৃষ্টি), ওয়াবিল (প্রবল বৃষ্টি), হাতিল (নিরবচ্ছিন্ন তুমুল

বৃষ্টি), হাতুন (প্রবল বর্ষণ)। এগুলোর প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইবনে সিনা ও ইখওয়ানুস সাফা।[৫৫২]

জীবাশ্মবিজ্ঞান (palaeontology)

মুসলিম বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে গিয়ে এবং সমুদ্রের শুষ্ক ভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রমাণাদি উপস্থিত করতে গিয়ে জীবাশ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। আল-বিরুনি তার '*তাহদিদু নিহায়াতি আমাকিনি লি-তাসহিহি মাসাফাতিল-মাসাকিন*' কিতাবে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ জলে নিমজ্জিত ছিল। ভূতাত্ত্বিক কালপরিক্রমায় তা থেকে পানি সরে যায়। কেউ যদি জলাশয় বা কূপ খনন করে, সেখানে সে পাথর দেখতে পাবে, সেই পাথর ভাঙলে তা থেকে বেরিয়ে আসবে শঙ্খ (বা সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক)। এই যে আরব মরুভূমি, তা একসময় সমুদ্র ছিল, সমুদ্রের জল শুকিয়ে গিয়ে ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে জলাশয় বা কূপ খনন করতে গেলেই আমরা তার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। মাটি, বালু ও কঙ্করের কয়েকটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। তারপর পাওয়া যায় মৃৎপাত্র বা কুমারের মাটি, কাচ ও হাড়। এর অর্থ এই নয় যে, এখানে আগমনকারী কাউকে এখানে দাফন করা হয়েছিল। খননের ফলে পাথরও বেরিয়ে আসে। পাথর ভাঙলে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শঙ্খ। একে মাছের কান বলা হয়। এসব শঙ্খ হয়তো নিজ অবস্থায় বহাল থাকে অথবা জীর্ণ হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন তার কাঠামো আকারেই ওই জায়গাটুকু পাথরের ভেতরে খালি থাকে।[৫৫৩]

আল-বিরুনি এখানে ফসিল বা জীবাশ্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এগুলো হলো অশ্মীভূত পূর্ণাঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা পাথরের অভ্যন্তরে খোদাই হওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিহ্ন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, কিছু অঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত ছিল, তারপর তা স্থলভাগে পরিণত হয়েছে।

---

৫৫২. *রিসালাতুল আসারিল আলাবিয়্যা*, *মিন রাসায়িলি ইখওয়ানিস সাফা*, দারু সাদির, বৈরুত, খ. ২, পৃ. ৬২ ও তার পরবর্তী।

৫৫৩. আল-বিরুনি, *তাহদিদু নিহায়াতিল আমাকিনি লি-তাসহিহি মাসাফাতিল মাসাকিন*' ইস্তাম্বুলের জামে আল-ফাতিহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে জার্মান প্রাচ্যবিদ Fritz Krenkow কর্তৃক চয়নকৃত অংশ। *আল-মুজাল্লাদুত তাযকারি*, পৃ. ২০৪।

ইবনে সিনাও আল-বিরুনির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। কোনো শুকনো ভূখণ্ডে বা স্থলভাগে জলজ প্রাণীর জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে এই এলাকা কোনো এক সময় জলে নিমিজ্জত ছিল। *আশ-শিফা* গ্রন্থে ইবনে সিনার বক্তব্য এসেছে এভাবে, অনুমিত হয় যে, এই আবাদিত জনপদ প্রাচীন কালে আবাদ ছিল না, বরং সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। পরে তা প্রস্তরীভূত হয়েছে। প্রস্তরীভবনের ঘটনা ঘটেছে হয়তো সমুদ্র থেকে পানি সরে গিয়ে তা উন্মোচিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে, বছরের পর বছর ধরে, যার বিবরণ ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে সুরক্ষিত থাকেনি। অথবা সমুদ্রের তলদেশে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে, ফলে তাতে প্রস্তরীভবনের ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রথম কারণটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই ক্ষেত্রে সমুদ্র-এলাকার মাটি এঁটেল হওয়ায় তা প্রস্তরীভবনে সাহায্য করেছে। আবাদিত জনপদে প্রচুর পাওয়া গেছে। এসব পাথর ভাঙলে ভেতরে পাওয়া গেছে জলজ প্রাণীর খোলস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেমন শঙ্খ ও অন্যান্য প্রাণী।[৫৫৪]

এই প্রসঙ্গে ইবনে সিনা আরও বলেছেন, প্রাণীর ও উদ্ভিদের অশ্মীভবনের (পাথরে বা ফসিলে পরিণত হওয়া) যেসব ঘটনা শোনা যায় তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এর পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। কিছু সামুদ্রিক এলাকায় ভূগর্ভে প্রচণ্ড শক্তির চাপ অশ্মীভবনের ঘটনা ঘটিয়েছে। অথবা ভূমিকম্প ও ভূমিধসের কারণে ভূখণ্ডের একটি অংশ সরে গেছে এবং এর ফলে সেখানে অশ্মীভবনের ঘটনা ঘটেছে।[৫৫৫]

মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাদের গ্রন্থসমূহে ও রচনাবলিতে ভূতত্ত্ব ও ভূবিজ্ঞান বিষয়ে যা-কিছু লিখেছেন, উপরিউক্ত আলোচনা তার সিন্ধুর মধ্যে ভাসমান হিমশৈলের একটি চূড়ামাত্র। এ থেকেই অগ্রগামিতা ও নেতৃত্বের দিকটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিজ্ঞানীরাই ভূবিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন ইবনে সিনা, আল-বিরুনি ও আল-কিন্দি। মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রে যে অবদান ও কীর্তি রেখে গেছেন আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যা তারই সম্প্রসারিত রূপ।

---

৫৫৪. মুহাম্মাদ সাদিক আফিফি, *তাতাওউরুল ফিকরিল ইলমি ইনদাল মুসলিমিন*, পৃ. ২৬৩।

৫৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

বীজগণিত

বীজগণিতের সূচনা ও তার ভিত্তি স্থাপন করেছেন বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খাওয়ারিজমি (১৬৪-২৩২ হি./৭৮১-৮৪৬ খ্রি.)। মিরাসের অংশবণ্টনে কিছু জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি বীজগণিতের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন। তিনি বীজগণিতের কিছু মূলনীতি ও নিয়ম স্থির করেছেন যা একে প্রকৌশল ও গণিতের অন্যান্য শাখা থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞানের মর্যাদা দান করেছে।

আল-খাওয়ারিজমিই প্রথম বর্তমানে আলজেব্রা নামে পরিচিত জ্ঞানশাখাটির জন্য 'জাব্‌র' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইউরোপীয়রা তার থেকে তা গ্রহণ করে। এখনো পর্যন্ত 'আল-জাব্‌র' তার আরবি নামেই ইউরোপের যাবতীয় ভাষায় পরিচিত। তা ইংরেজি ভাষায় Algebra এবং ফরাসি ভাষায় Algèbre। অন্যান্য ভাষায়ও অনুরূপ। ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে যত শব্দে algorithme বা algorithm বা algorism রয়েছে তা 'আল-খাওয়ারিজমি' নামটির অপভ্রংশ। মানুষকে আরবি সংখ্যা শেখানোর কৃতিত্বও তারই। তাই তো আল-খাওয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক বলা হয়।[৫৫৬]

---

৫৫৬. কারাম হিলমি ফারহাত, *আত-তুরাসুল ইলমি লিল-হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিশ শাম ওয়াল ইরাক খিলালাল কারনির রাবিয়িল হিজরি* পৃ. ৬৪২-৬৪৩, মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমুনা আল্লামুল আলামা*, পৃ. ৭৪-৭৫, আকরাম আবদুল ওয়াহহাব, *মিয়াতু আলিমিন গাইয়ারু ওয়াযহাল আলাম* পৃ. ২০।


بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب وضعه محمد بن موسى الخوارزمي افتتحه بان قال
الحمد لله على نعمه بما هو اهله من محامده

চিত্র নং-১৬
আল-খাওয়ারিজমি রচিত 'আল-জাবরু' (বীজগণিত)

আল-খাওয়ারিজমির কিতাব *'আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা'* গণিতশাস্ত্রের একটি প্রধান বই এবং বিপুল প্রভাবসঞ্চারী। এতে তিনি সমীকরণের পক্ষান্তর ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন যে, খলিফা আল-মামুন তাকে এই গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কীভাবে তিনি অনুরোধ জানান তারও বিবরণ দিয়েছেন। গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন জেরার্ডো ডি ক্রিমোনা (Gerardo de Cremona)।[৫৫৭] ১৮৫১ সালে লন্ডন থেকে গ্রন্থটির আরবি ভাষ্যসহ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন ফ্রেডেরিক রোজেন। তিনিই এটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। অনূদিত গ্রন্থটির নাম *The Algebra Of Mohammed Ben Musa*।

আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা গ্রন্থটির একাধিক অনুবাদের ফলে ভারতীয় গণিত ও দশমিক পদ্ধতির[৫৫৮] ব্যবহার ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি সেখানে গাণিতিক ক্রিয়া-কার্য Alguarismo নামে পরিচিতি লাভ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এগুলোই আবার আরবিতে অনূদিত হয় اللوغاريتمات নামে, যদিও তা মূলত আল-খাওয়ারিজমির প্রতি সম্বন্ধিত। এর সঠিক তরজমা হবে الخوارزميات বা الجداول الخوارزمية।

আল-খাওয়ারিজমির *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থটি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণিতশাস্ত্রের প্রধান উৎস হিসেবে বিরাজমান ছিল। তার পরে যারা আলজেব্রা বা বীজগণিত নিয়ে বই লিখেছেন তাদের অধিকাংশই এই গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল। আরবি ভাষা থেকে লাতিন ভাষায় এটির অনুবাদ করেন রবার্ট অব চেস্টার (Robert of Chester)। ফলে এর দ্বারা ইউরোপ আলোকিত হয়। আধুনিক কালে দুইজন ডক্টর মিশরীয় পদার্থবিদ আলি মুস্তাফা মুশরাফা ও মিশরীয় গণিতবিদ মুহাম্মাদ মুরসি আহমাদ *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।[৫৫৯] এটি كتاب الجبر والمقابلة، تحقيق:

---

৫৫৭. গ্রন্থটি রবার্ট অব চেস্টার (Robert of Chester) কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।-অনুবাদক

৫৫৮. Decimal Numeral System.-অনুবাদক

৫৫৯. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, মুবতাকির ইল্‌মিল-জাবর... মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি, *মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১৮৭ এবং *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৭৭; মুহাম্মাদ আলি উসমান, *মুসলিমুনা আল্লামুল*

علی مصطفى مشرفة ومحمد مرسی أحمد নামে ১৯৩৭ সালে কায়রোর পল বেরি প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

আল-খাওয়ারিজমির পর এই পথপরিক্রমা সমাপ্ত করেন আবু কামিল শুজা আল-মিশরি[৫৬০], আবু বকর আল-কারখি[৫৬১] ও উমর আল-খাইয়াম[৫৬২] এবং অন্যান্য প্রতিভাবান মুসলিম গণিতবিদ।

আলামা, পৃ. ৭৭; আবদুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলম ওয়া দাওরুল উলামাইল আরাব ফি তাকাদ্দুমিহি*, পৃ. ৬৫।

৫৬০. শুজা আল-মিশরি : আবু কামিল শুজা ইবনে আসলাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে শুজা (মৃ. ৩১৮ হি./৯৩০ খ্রি.)। আবু কামিল আল-হাসিব নামেও পরিচিত। মিশরীয় গণিতজ্ঞ ও প্রকৌশলী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطأين، كتاب كمال الجبر وتمامه والزيادة في أصوله ويعرف بكتاب الكامل، كتاب الوصايا بالجبر والمقابلة، كتاب الجبر والمقابلة، كتاب الوصايا بالجذور، كتاب الشامل في الجبر والمقابلة ، كتاب الطرائف في الحساب، كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطأين، كتاب الكفاية، كتاب المساحة والهندسة والطير، كتاب مفتاح الفلاح، رسالة في المخمس والمعشر، كتاب العصير، كتاب الفلاح.

দেখুন, ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৩৩৯; উমর রিদা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৪, পৃ. ২৯৫।

৫৬১. আবু বকর আল-কারখি (আল-কারজি) : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-কারখি (মৃ. ৪১০ হি./১০২০ খ্রি.)। গণিতজ্ঞ, প্রকৌশলী। ইরাকের আমির বাহাউদ দাওলার উজির ফাখরুল মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার অনুরোধে তিনি বীজগণিত বিষয়ে *কিতাবুল ফাখরি* রচনা করেন। তার আরও দুটি গ্রন্থ *আল-বাদি ফিল-হিসাব* এবং *আল-কাফি ফিল-হিসাব*। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১২৫; ফুয়াদ সেযগিন, *তারিখুত তুরাসিল আরাবি*, খ. ১, পৃ. ৫৬২।

৫৬২. উমর আল-খাইয়াম : উমর ইবনে ইবরাহিম আল-খাইয়ামি আন-নিশাপুরি (১০৪৮-১১২১ খ্রি.)। পার্সিয়ান কবি, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বীজগণিত সম্পর্কে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি তার লেখা। এই গ্রন্থে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান ও ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধানের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্পর্কে একটি টীকাও আছে তার। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি একটি মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, উন্নত জ্যোতিষ-সারণি রচনা ও মুসলিম বর্ষপঞ্জির সংস্কার সাধন (১০৭৪ খ্রি.) করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন ও অধিবিদ্যা নিয়েও লিখেছিলেন তিনি। আইন ও ইতিহাস সম্পর্কেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তুর্কি সুলতানদের দরবারে তিনি ছিলেন সম্মানিত বৈতনিক সভাসদ। সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি অবশ্য বেশি পরিচিত কবি হিসেবে, *রুবাইয়াতের* রচয়িতারূপে। বাংলা ও ইংরেজিসহ বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এই কবিতাগুচ্ছ থেকে উমর আল-খাইয়ামের শাশ্বত ভাবনা, গভীর অনুভূতি ও জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। দেখুন, আব্বাস আল-কোমি, *সাফিনাতুল বিহার*, খ. ১, পৃ. ৪৩৬; ইবনুল আসির, *আল-কামিল*, ৪৭৬ হিজরির ঘটনাবলি।

শূন্য (০) প্রবর্তন

শূন্য (০)-এর প্রবর্তন গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও মহাকীর্তি। কোনো সন্দেহ নেই যে, শূন্য (০) গাণিতিক কার্যাবলিকে সহজতর করে দিয়েছে এবং গণিতবিজ্ঞানকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। শূন্য (০) না থাকলে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক গাণিতিক সমীকরণের সমাধান ততটা সহজে করতে পারতেন না, যা এখন করতে পারছেন। গণিতের বিভিন্ন শাখায় যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এর ফলে সভ্যতার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা বিস্ময়কর।[৫৬৩]

দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান

গণিতশাস্ত্রে মুসলিমদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও কীর্তি হলো দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান। একে ঘন সমীকরণও বলে। তারা দ্বিঘাত সমীকরণের কয়েকটি সমাধানপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। গণিতের আধুনিক গ্রন্থগুলোতে এখনো এসব সমাধানপদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা জানিয়েছেন যে, এ ধরনের সমীকরণের দুটি রুট (Root) বা মূল থাকে। মূল দুটি ধনাত্মক হলে কীভাবে সেগুলোকে বের করতে হবে তাও তারা জানিয়েছেন। মুসলিমজাতি যেসব বিষয়ে অগ্রগামী এবং পূর্ববর্তী সব জাতি থেকে এগিয়ে রয়েছে তার মধ্যে গণিতশাস্ত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার অন্যতম। তারা কতিপয় সমীকরণের সমাধানের জন্য প্রকৌশলীয় পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন। আল-খাওয়ারিজমির *আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা* গ্রন্থের 'আলা-মাসাহাত' অধ্যায়ে এমন কিছু প্রকৌশলীয় প্রক্রিয়া রয়েছে যেগুলোর সমাধান করা হয়েছে বীজগণিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমরাই প্রথম প্রকৌশলীয় সমস্যার (engineering problem) সমাধানে বীজগণিতের ব্যবহার চালু করেন।[৫৬৪]

---

৫৬৩. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।
৫৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার

যদিও বলা হয়ে থাকে যে ডাচ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ সিমোন স্টেভিন[৫৬৫] প্রথম দশমিক ভগ্নাংশের ধারণা দেন এবং তিনিই প্রথম এর ব্যবহার চালু করেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। মুসলিম গণিতজ্ঞ গিয়াসুদ্দিন জামশেদ আল-কাশি[৫৬৬] মূলত প্রথম ব্যক্তি, যিনি দশমিক ভগ্নাংশের প্রতীক প্রবর্তন করেছিলেন এবং সিমোন স্টেভিনের ১৭৫ বছরেরও বেশি পূর্বে তা ব্যবহার করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহারের উপকারিতা এবং তা ব্যবহার করে অঙ্ক কষার পদ্ধতিও বলে দিয়েছিলেন। তিনি তার *'মিফতাহুল হিসাব'* গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দশমিক ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেছেন, যাতে ওইসব ব্যক্তিদের জন্য অঙ্ক কষা সহজ হয় যারা ষষ্ঠিক (sexagesimal) পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং তিনি জেনেশুনেই বলছেন যে, তিনি একটি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছেন।[৫৬৭]

গণিতে প্রতীকের ব্যবহার

আল-খাওয়ারিজমির পরবর্তীকালে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গাণিতিক ক্রিয়া-কার্যে প্রতীকের (÷ ،× ،- ،+) ব্যবহার শুরু করেন। আল-কালাসাদি

---

৫৬৫. সিমন স্টেভিন (Simon Stevin 1548-1620) : গ্যালিলিও, কেপলার ও দেকার্তের মতো তিনিও 'নতুন' বিজ্ঞানের একজন প্রতিষ্ঠাতা। নতুন পদ্ধতি ও প্রথাবিরোধী প্রতীতে তার আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের প্রাচীন পদ্ধতি ও প্রণালিসমূহকে তিনি সচেতনভাবে বাতিল করেছিলেন। জলগতিবিজ্ঞানের কলাকৌশলে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী এবং এই বিষয়ে একটি সরকারি পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বলবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, নৌপরিবহন ও রসায়নসহ বিভিন্ন শাখা তার অনুশীলনের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। পাটিগণিত ও বীজগণিত সম্পর্কে লেখা তার গ্রন্থ পরবর্তীকালের অনেক উল্লেখযোগ্য গণিতবিদকে অনুপ্রাণিত করেছে। -অনুবাদক

৫৬৬. আল-কাশি : গিয়াসুদ্দিন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাশি (১৩৮০-১৪২১ খ্রি.)। হিজরি নবম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। খুরাসানের কাশান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সমরকন্দে মৃত্যুবরণ করেন। বর্গমূল, ঘনমূলের মতো পূর্ণসংখ্যার ঘাতবিশিষ্ট মূল নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। বহু শ্রেষ্ঠ আরব বিজ্ঞানীর মতো তিনিও অনুবাদের কাজ করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب زيج الخاقاني، الأبعاد والأجرام، نزهة الحدائق، رسالة سلم السماء، رسالة المحيطية، رسالة الجيب والوتر، مفتاح الحساب। দেখুন, উমর রিদা কাহহালা, *মুজামুল মুআল্লিফিন*, খ. ৮, পৃ. ৪৩; নাসরিন মুস্তাফা, *জামশিদ গিয়াসুদ্দিন আল কাশি : জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে, ২০০৯, প্রকাশক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫৬৭. জালাল মাযহার, *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৬।

আল-আন্দালুসির[৫৬৮] রচনাবলিতে, বিশেষ করে '*কাশফুল আসরারি আন ইলমি হুরুফিল গুবার*' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তা থেকে গাণিতিক প্রতীক ব্যবহারের বিষয়টি যথার্থ প্রমাণিত হয়। গণিতের বিভিন্ন শাখার অগ্রগামিতা ও উৎকর্ষ লাভে এসব প্রতীক ব্যবহারের যে ভূমিকা ও প্রভাব তা কারও অজানা নয়। কিন্তু সত্যিকারই আফসোসের ব্যাপার যে, ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্রাঁসোয়া ভিয়েটাকে[৫৬৯] গণিতে প্রতীক ব্যবহারের প্রবর্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বলা হয় যে, তিনি এসব গাণিতিক প্রতীক ও চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন। অথচ তার জীবৎকাল ১৫৪০-১৬০৩ খ্রি.।[৫৭০]

ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান

উমর আল-খাইয়াম (৪৩৬-৫১৭ হিজরি) বীজগণিতীয় ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করেন। কনিক সেকশন বা কনিক ব্যবহার করে বহুপদী সমীকরণের সমাধানপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীরা মানবসভ্যতাকে যা-কিছু দিয়েছেন এটি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

---

৫৬৮. আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-কুরাশি আল-বাসতি (৮১৫-৮৯১ হি./১৪১২-১৪৮৬ খ্রি.)। আন্দালুসের বাজায় (বাস্তায়) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিউনিসিয়ার বাজায় মৃত্যুবরণ করেন। গণিতবিদ। মালিকি মাযহাবপন্থী ইমাম। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : شرح التبصرة الواضحة في المنطق، كشف الجلباب عن علم الحساب، الأرجوزة الياسمينية في الجبر والمقابلة أشرف كتاب النصيحة في السياسة العامة والخاصة، مسائل الأعداد، شرح أيساغوجي في اللائحة المسالك إلى مذهب مالك، । দেখুন, শামসুদ্দিন আস-সাখাবি, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, খ. ৬, পৃ. ৫; হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ১৫৩।

৫৬৯. ফ্রাঁসোয়া ভিয়েটা (François Viète 1540-1603) : ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ বীজগণিতজ্ঞ বলে পরিচিত। ত্রিকোণমিতি তার বিকাশের উন্নত পর্যায়ে এসে বীজগণিতের সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়তে লাগল তখন ভিয়েটা এই দুটি শাখা নিয়েই পাশাপাশি কাজ করেছিলেন। তার বলয়ের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতির প্রয়োগ তার বীজগাণিতিক অঙ্কপাতনকে সাহায্য করেছিল। গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আধুনিক ধারণার প্রবর্তনে তিনি উভয় শাখা থেকে উপাদান সংগ্রহ শুরু করেছিলেন। ভিয়েটা প্রাচীন গ্রিক গণিতজ্ঞ আপোলোনিয়াসের একটি মূল সমস্যারও সমাধান করেছিলেন, প্রদত্ত তিনটি বৃত্তকে স্পর্শ করে একটা বৃহদাকার বৃত্ত অঙ্কন। π (পাই)-এর মান নির্ধারণের একটি উন্নত পদ্ধতিও তিনি দেখান। জ্যোতির্বিদ্যায় অবশ্য তার মোটেও দখল ছিল না। সেজন্য তিনি ক্যালেন্ডারের গ্রেগরীয় সংস্কার ও সংশোধনের বিরোধিতা করেছিলেন।- অনুবাদক

৫৭০. জালাল মাযহার : *হাদারাতুল ইসলাম ওয়া আছারুহা ফিত-তারাক্কিল আলামি*, পৃ. ৩৫৮, আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা : *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম* পৃ. ৬৫।

কীর্তি। উমর আল-খাইয়াম যে অধিবৃত্ত (parabola) ও বৃত্তের (বৃত্তের ছেদকের) সাহায্যে ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান করেছেন তা থেকেই প্রতিভাত হয় যে তিনি (শূন্যে অবস্থিত কোনো) বিন্দুর স্থানাঙ্ক (সঠিক অবস্থান) ব্যাখ্যার জন্য আনুভূমিক স্থানাঙ্ক[৫৭১] সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। উমর আল-খাইয়াম তার এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির[৫৭২] ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রথম ইটগুলো স্থাপন করেন। অথচ রেনে দেকার্তেকে এর প্রবর্তক আখ্যায়িত করা হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির বিকাশ ও মূলনীতি স্থিরীকরণে দেকার্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা গণিতশাস্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির উদ্ভাবক উমর আল-খাইয়ামের ভূমিকার কথা ভুলে যাব।[৫৭৩]

---

৫৭১. Horizontal Coordinate/X–coordinate বা ভুজ।-অনুবাদক

৫৭২. স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বিশ্লেষণী জ্যামিতি (Analytic geometry) : গণিতশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে জ্যামিতি আলোচনা করার জন্য বীজগণিত প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় একে বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতিও বলা হয়। এটি সাধারণত কো-অর্ডিনেট জ্যামিতি বা কার্টেসিয়ান জ্যামিতি নামে পরিচিত। পদার্থবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষায় এর গুরুত্ব অসীম। স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে সমতলে অবস্থান করা একটি বিন্দুর স্থানকে একজোড়া সংখ্যার সহায়তায় উপস্থাপন করা হয়। একে সংখ্যাজোড়ক স্থানাঙ্ক বলা হয়। সমতলে একটি বিন্দুর অবস্থান জানতে একজোড়া অক্ষ ব্যবহার করা হয়। y অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর দূরত্বকে x স্থানাঙ্ক বা ভুজ বলা হয়। x অক্ষ থেকে একটি বিন্দুর দূরত্বকে y স্থানাঙ্ক বা কোটি বলা হয়। x অক্ষের উপরে থাকা একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের অবস্থান (x, 0) এবং y অক্ষের উপরে থাকা একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের অবস্থান (0, y)।-অনুবাদক

৫৭৩. আলি ইবনে আবদুল্লাহ দাফফা, *রাওয়ায়িউল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উলুম*, পৃ. ৬৫।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

যন্ত্রপ্রকৌশল

গ্রিক, রোমান, পারসিক, চৈনিক বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে যেসব ছড়ানো-ছিটানো তত্ত্ব ও নিয়ম রেখে গিয়েছিলেন তা-ই ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক অবলম্বন। পরে তারা যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং নতুন কৌশল ও যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই বিজ্ঞান তাদের নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য প্রায়োগিক বিজ্ঞানশাখায় পরিণত হয়েছে। আগে এমন কৌশলজ্ঞান কেবল বিনোদন ও জাদুবিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরব বিজ্ঞানীরা এই বিজ্ঞানশাখার নাম দিয়েছিলেন 'ইলমুল হিয়াল' বা (প্র)কৌশলবিজ্ঞান বা কৌশলবিদ্যা। এমন নামকরণ করে তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এসব কৌশল অবলম্বন করে কঠিন পরিস্থিতি ও অবস্থাকে আয়ত্তে এনে কোনো উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। অর্থাৎ, এতে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও মানবিক কর্মশক্তি পর্যাপ্ত বৃদ্ধি পায় এবং কৌশলগত শক্তি ব্যাপকতা লাভ করে। মানবশক্তি ও পশুশক্তি থেকেও বহুগুণ বেশি শক্তি আয়ত্তে চলে আসে এবং এর দ্বারা যেকোনো উপকার হাসিল করা যায়।

কৌশলবিদ্যার উদ্দেশ্য

মুসলিম বিজ্ঞানীরা কৌশলবিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছেন, শক্তির জায়গায় কৌশল এবং পেশির জায়গায় বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। দেহের জায়গায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন যন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণি ও দাসদের বন্দিদশা, বাধ্যতামূলক শ্রম ও কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বিশেষ করে যেহেতু ইসলাম অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে এমন বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করেছে। একইভাবে ইসলাম শ্রমিকশ্রেণির ওপর কষ্টদায়ক ও তীব্র ক্লান্তিকর কাজ চাপিয়ে দিতেও নিষেধ করেছে। প্রাণীদের কষ্ট দেওয়াও হারাম করেছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের দিয়ে তাদের সাধ্যাতীত বোঝা টানানো বা বহন করানো যাবে না। এ কারণে

মুসলিমদের দৃষ্টি ছিল নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করার দিকে, যাতে মানুষ ও প্রাণীর বদলে যন্ত্রপাতি দিয়েই কষ্টকর কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। এটা মূলত মানুষের সভ্যতাজনিত প্রবণতা। যেসব জাতির মধ্যে এমন প্রবণতা রয়েছে তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এই প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই নতুন কিছু আবিষ্কারের দর্শন ঘুরপাক খায়, যে আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনায় কাঠামোবদ্ধ রূপ লাভ করে। কারণ এর পেছনে সক্রিয় থাকে মানুষের জীবনকে সুন্দর করার এবং মানবজীবন থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের কষ্টকে দূরীভূত করার অভিপ্রায়।

ইসলামি সভ্যতার বিজ্ঞানজগতে উপকারী কৌশলবিজ্ঞান (ইলমুল হিয়ালিন নাফিআ) অগ্রসর প্রযুক্তিগত দিকটিই সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানবিদ্যাকে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ধর্মের সেবায় এবং সভ্যতা ও নগরায়ণের প্রতিটি দিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কল্যাণকর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন।

প্রাচীন লোকেরা কৌশলবিদ্যা কাজে লাগিয়ে তাদের ধর্মাদর্শের অনুসারীদের ওপর ধর্মীয় ও আত্মিক প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। যেমন গণকদের মাধ্যমে চলাফেরা করে বা কথা বলে এমন পুতুল ব্যবহার করত। উপাসনাগুলোতে সংগীত, অর্গান ও শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। প্রাচীন লোকদের কৌশলবিদ্যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল এগুলোই। ইসলাম আসার পর তা বান্দা ও তার রবের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করল তাতে কোনো ওসিলা বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন পড়ল না। মানুষের চোখে বিভ্রাট সৃষ্টি করারও কোনো দরকার হলো না। তখন 'উপকারী কৌশলবিদ্যার' নতুন উদ্দেশ্য হলো সক্রিয় (মেকানিক্যাল) যন্ত্র ব্যবহার করে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। সক্রিয় ও চলমান যন্ত্র বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে এমন সব যন্ত্রপাতি যাদের সক্রিয়তা ও চলমানতা বায়ুর গতি অথবা জলের গতি বা সুষম অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের প্রথমটিকে বলে এরোডাইনামিক্স (বায়ুগতিবিদ্যা)[৫৭৪] এবং দ্বিতীয়টিকে

---

৫৭৪. বায়ুগতিবিদ্যা (Aerodynamics) : এটি বায়ুবলবিদ্যার একটি শাখা। এই শাস্ত্র বাতাস ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ গতিশীল অবস্থায় যেসব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এবং বল প্রয়োগ করে তা নিয়ে আলোচনা করে। যদি কোনো বস্তু বাতাস বা কোনো গ্যাসে নিমজ্জিত অবস্থায়

বলে হাইড্রোডাইনামিক্স (জলগতিবিদ্যা)[৫৭৫] বা হাইড্রোস্ট্যাটিক্স (জলস্থিতিবিদ্যা)[৫৭৬]। এগুলোর সঙ্গে আরও ছিল ধীরগতির অপারেটিং সিস্টেমযুক্ত কপাটিকা[৫৭৭], দূরবর্তী স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণপদ্ধতিতে কার্যক্ষম ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, জলসাঁকো ও কৃত্রিম জলপ্রণালি (Aqueduct), প্রকৌশলীয় ব্যবস্থা, স্থাপত্য-কারুকার্য ও অন্যান্য বিষয়।[৫৭৮]

মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশ

আমরা যন্ত্রপ্রকৌশলের বা উপকারী কৌশলবিদ্যার শুরুর দিনগুলোতে ফিরে গেলে দেখতে পাই যে, ইসলামি বিশ্বে যন্ত্রপ্রকৌশলের প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে হিজরি তৃতীয় শতাব্দী (খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী) থেকেই এবং তা ঘটে একদল প্রতিভাবান মুসলিম বিজ্ঞানীর হাতে। শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ কর্মগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই আমরা যন্ত্রপ্রকৌশলের বিকাশের ধাপগুলো জানতে পারি। কারণ তারাই ছিলেন যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে ইসলামি প্রযুক্তিবিদ্যার পথিকৃৎ।

১. মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা (বানু মুসা ইবনে শাকির)

তারা ছিলেন তিন ভাই। বড় ভাইয়ের নাম মুহাম্মাদ (মৃ. ২৫৯ হি./৮৭৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী, ভূগোলবিদ ও

গতিশীল হয় বা এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক বেগ থাকে তবে তাও এই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। বায়ুগতিবিদ্যার বিভিন্ন শাখা রয়েছে।

৫৭৫. জলগতিবিদ্যা (Hydrodynamics) : তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান। কেবল আপেক্ষিকভাবে বর্ণনাযোগ্য অনবচ্ছিন্ন বলবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে অসংনম্য (incompressible) তরলের গতিসূত্রগুলো এবং সীমানার সঙ্গে তরলের মিথস্ক্রিয়া আলোচিত হয়।-অনুবাদক

৫৭৬. জলস্থিতিবিদ্যা (Hydrostatics) : স্থিতাবস্থায় তরলের আলোচনা। গতি অনুপস্থিতির তির্যক পীড়ন থাকে না, যেকোনো বিন্দুতে পীড়নের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নির্ধারিত হয় শুধু চাপের দ্বারাই। সুতরাং কোনো বিন্দুতে চাপের পরিমাণ সব দিকেই সমান থাকে। সব সীমাপৃষ্ঠের ওপর সচরাচর চাপ কাজ করে। অভিকর্ষের আওতায় সুস্থিতির জন্য যেকোনো আনুভূমিক প্রস্থচ্ছেদের ওপর চাপ সমান হয়, এতে (তরল) ধারণকারী পাত্রের আকার কোনো গুরুত্ব বহন করে না। উচ্চতা বা গভীরতা অনুযায়ী চাপের তারতম্য হয়।-অনুবাদক

৫৭৭. কপাটিকা (Valve) : একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র। নালি ব্যবস্থায় এবং যন্ত্রপাতির মধ্যে প্রবাহের ধারা নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্র কপাটিকা ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রপাতিতে প্রবাহী-প্রতিষঙ্গ অনেক সময় ঝলকিত অথবা সবিরাম প্রকৃতির এবং সংশ্লিষ্ট গিয়ারসহ কপাটিকা একটা সময় নির্বাচনী বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। -অনুবাদক

৫৭৮. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ২৯-৩০।

শারীরবৃত্তবিদ। দ্বিতীয় ভাই আহমাদ ছিলেন যন্ত্রপ্রকৌশলী। তৃতীয় ভাই হাসান (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি.) ছিলেন প্রকৌশলী ও ভূগোলবিদ। হিজরি তৃতীয় শতকে (খ্রিষ্টীয় নবম শতকে) তাদের জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রপ্রকৌশলে তারা ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। *'হিয়ালু বানি মুসা'* (*Book of Ingenious Devices*) গ্রন্থটির জন্য তারা সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। এটি যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি প্রধান ও মূল্যবান গ্রন্থ। ইবনে খাল্লিকান এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, কৌশলবিদ্যায় তাদের একটি বিস্ময়কর দুর্লভ গ্রন্থ রয়েছে। এতে সব ধরনের বিস্ময়কর কৌশলের বর্ণনা রয়েছে। আমি এই গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি এবং দেখেছি যে এটি একটি সমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।[৫৭৯]

বানু মুসার *'কিতাবুল হিয়াল'*-এ একশ যন্ত্র-স্থাপন (mechanical installation) কৌশল রয়েছে। প্রতিটির সঙ্গে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে এবং ব্যাখ্যামূলক চিত্রও রয়েছে। চিত্রগুলোতে যন্ত্র-স্থাপন ও যন্ত্রটি চালানোর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। বানু মুসার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার চিন্তাভাবনা ও কলাকৌশলের মধ্যে ছিল একাধিক ধরনের স্বয়ংক্রিয় কপাটিকা (ভাল্‌ভ), নির্দিষ্ট সময়ের পর সক্রিয় হয়ে ওঠা যন্ত্রব্যবস্থা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তা ছাড়া তারা উদ্ভাবন করেছিলেন মোচাকার কপাটিকা (কনিক্যাল ভাল্‌ভ), রোধনী কপাটিকা (প্লাগ ভাল্‌ভ), স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যক্ষম ক্র্যাংক-দণ্ড[৫৮০] ইত্যাদি। এসব আবিষ্কার ছিল নজিরবিহীন। ইউরোপে যে আধুনিক ক্র্যাংক চালু আছে, পাঁচশ বছর আগেই তার প্রথম যান্ত্রিক বিশ্লেষণ প্রদান করেছিলেন মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা।[৫৮১]

---

৫৭৯. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬১।

৫৮০. ক্র্যাংক বা ঘোড়া (Crank) : এটি এমন একটি যান্ত্রিক সংযোগ যা নির্দিষ্ট অক্ষের চারদিকে ঘুরতে পারে। ক্র্যাংকের ঘূর্ণনের কেন্দ্রে থাকে তার পিভট (pivot)। এই পিভট হচ্ছে ক্র্যাংকের দণ্ড (Crankshaft)। এই দণ্ড ক্র্যাংকটিকে নিকটস্থ সংযোগস্থলের সঙ্গে যুক্ত করে।- অনুবাদক

৫৮১. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩০।

বানু মুসার কয়েকটি যান্ত্রিক কাঠামোর উদাহরণ :

- হারিকেন বাতি (Hurricane lamp) : প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে রেখে দিলেও এই বাতির আলো নেভে না।
- স্ব-সজ্জিত বাতি (Self-trimming lamp) : নিজেই সলতে বের করে নেয় এবং নিজেই তেল টেনে নেয়। কেউ দেখলে মনে করে যে, আগুন কোনো তেল পোড়াচ্ছে না এবং বাতিটির মূলত কোনো সলতেই নেই।
- ফোয়ারা : এ ফোয়ারা থেকে কিছু সময় বর্শার মতো পানি বেরোয় এবং অনুরূপ সময় আইরিস ফুলের মতো পানি বেরোয়। এভাবে অনবরত চলতেই থাকে।

তাদের যান্ত্রিক আবিষ্কারগুলোর যেটি সবচেয়ে বিস্ময়কর সেটি হলো নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য বিশাল আকারের একটি যন্ত্র। যন্ত্রটি তারা তাদের মানমন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসবিদগণ এই যন্ত্র সম্পর্কে অপার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জলপ্রবাহের শক্তি প্রয়োগ করে এটিকে ঘোরানো হতো। যন্ত্রটি আকাশের নক্ষত্ররাজির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করত এবং এক বৃহদাকার আয়নায় তা প্রতিফলিত করত। আকাশে কোনো তারা ভেসে উঠলেই তা এই যন্ত্রে ধরা পড়ত এবং কোনো তারা বা উল্কা ডুবে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ত। এগুলোর রেকর্ডও লিখে রাখা হতো।[৫৮২]

মুসা ইবনে শাকিরের পুত্ররা কৃষিকাজের জন্যও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন। যেমন নির্দিষ্ট আকারের প্রাণীদের জন্য বিশেষ খাদ্যপাত্র তৈরি করেন, প্রাণীরা এসব পাত্র থেকে অন্যদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি না করে সহজেই নিজেদের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে পারত। কৃষিজমিতে স্থাপন করার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন, এসব যন্ত্র স্থাপন করা হলে কৃষিজমির পানি নষ্ট হয় না। তা ছাড়া এসব যন্ত্রের দ্বারা জমিতে জলসেচ-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তারা গোসলখানার জন্য ট্যাংকও তৈরি করেন। তরলের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাদের এসব সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা প্রযুক্তির (উপকারী কৌশলের) বা যন্ত্রপ্রকৌশলের উন্নতি ও অগ্রগামিতায় বড় ভূমিকা পালন করেছে। কারণ উর্বরতা-সমৃদ্ধ

---

৫৮২. সিগরিড হুংকে, *শামসুল আরব তাসতাউ আলাল গারব*, পৃ. ১২২।

চিন্তাভাবনা, সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যায়ন ও প্রাগ্রসর পরীক্ষামূলক পদ্ধতির কারণে তাদের প্রদত্ত ডিজাইন ও নকশাগুলো ছিল অনন্য ও অসাধারণ।[৫৮৩]

২. বদিউযযামান আল-জাযারি[৫৮৪]

উপকারী কৌশল-প্রযুক্তির ময়দানে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক উদ্ভাবনগুলোর মধ্যে রয়েছে যান্ত্রিক ঘড়ি ও উত্তোলন-যন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের নকশা। দাঁতযুক্ত গিয়ারের ওপর নির্ভরশীল ব্যবস্থার সাহায্যে রৈখিক গতিকে বৃত্তাকার গতিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই যাবতীয় আধুনিক ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে মৌলিক পথিকৃৎ গ্রন্থ হলো '*আল-জামিউ বাইনাল ইলমি ওয়াল-আমলিন নাফি ফি সানাআতিল হিয়লি*'[৫৮৫]। এটি রচনা করেছেন বদিউযযামান আবুল ইয্য ইবনে ইসমাইল ইবনে রাযযায আল-জাযারি। ডোনাল্ড আর. হিল গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। অনূদিত গ্রন্থটি *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices* নামে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের হিজরা কাউন্সিল প্রকাশনাসংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়। সমকালীন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদ জর্জ সার্টন মন্তব্য করেছেন যে, আল-জাযারির এই গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্টভাষ্য ও ব্যাখ্যামূলক। মুসলিমদের প্রযুক্তিগত অর্জন ও অবদানের ক্ষেত্রে এটি শীর্ষস্থান দখল করে আছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।[৫৮৬]

আল-জাযারির গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় হলো জলঘড়ি-সম্পর্কিত। আরেকটি অধ্যায়ে পানি উত্তোলন-যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পানি উত্তোলক যন্ত্র-সম্পর্কিত অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতে রয়েছে পাম্পের নকশা সম্পর্কে

---

৫৮৩. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩০-৩১।

৫৮৪. বদিউযযামান আল-জাযারি : বদিউযযামান আবুল ইয্য ইবনে ইসমাইল ইবনে রাযযায আল-জাযারি (৫৩০-৬০২ হি./১১৩৬-১২০৬ খ্রি.)। উদ্ভাবক, যন্ত্রপ্রকৌশলী, পণ্ডিত ও আর্টিস্ট। তিনি পানি উত্তোলন-যন্ত্র, জলঘড়ি, হস্তীঘড়ি, ফ্ল্যাশ টয়লেট ইত্যাদিসহ প্রায় একশ যন্ত্রের উদ্ভাবক। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৪, পৃ. ১৫।

৫৮৫. গ্রন্থটি كتاب في معرفة الحيل الهندسية নামেও পরিচিত।-অনুবাদক

৫৮৬. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩১।

সচিত্র বিস্তারিত বর্ণনা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদগণ একে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অধিকতর কাছাকাছি বলে বিবেচনা করেছেন। এই পাম্পে যুক্ত রয়েছে মুখোমুখি দুটি পাইপ, পাইপ দুটির প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি বাহু, বাহুতে রয়েছে সিলিন্ডার আকৃতির পিস্টন (চাপদণ্ড)। পাইপ দুটির একটি চাপ বা সংকোচনের অবস্থায় থাকলে অপরটি থাকে টান বা চোষণের অবস্থায়। এই বিপরীতমুখী শক্তিকে সুরক্ষিত করার জন্য রয়েছে দাঁতযুক্ত বৃত্তাকার চাকতি, চাকতিকে কেন্দ্র থেকে দূরে যুক্ত রয়েছে পাইপ দুটির বাহু দুটি। এই চাকতিকে ঘোরানো হয় কেন্দ্রীয় ঘূর্ণনদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত গিয়ারের সাহায্যে। প্রত্যেক পাম্পে রয়েছে তিনটি ভাল্‌ভ (কপাটিকা), এগুলোর সাহায্যে জল একমুখী হয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে ওঠে এবং বিপরীত দিকে (নিচের দিকে) ফিরে আসতে পারে না।[৫৮৭]

আল-জাযারি কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পাম্প ধাতুর তৈরি একটি যন্ত্র, যা বায়ুশক্তির সাহায্যে বা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান প্রাণীর সাহায্যে ঘোরে। এই পাম্প নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল গভীর কূপ থেকে পানি ভূপৃষ্ঠে উত্তোলন করা। নদীর পানি নিচে নেমে গেলে (বা নদীর জলস্তর নিচু হলে) তা থেকে উঁচু ভূমিতে পানি ওঠানোর কাজেও এই পাম্প ব্যবহৃত হতো। যেমন মিশরের জাবাল আল-মুকাত্তাম (মুকাত্তাম) পাহাড়ে পানি ওঠানো হতো। সংশ্লিষ্ট বরাতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রযুক্তি প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত পানি উত্তোলন করতে পারত। পাম্পকে সরাসরি জলস্তরের ওপর বসিয়ে দিয়েও পানি ওঠানো হতো, তখন পাম্পের সঙ্গে যুক্ত চোষক দণ্ডটি পানিতে নিমজ্জিত থাকত।[৫৮৮]

৩. তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকি

তাকিউদ্দিন ইবনে মারুফ আর-রাসিদ আদ-দিমাশকি আশ-শামি—যিনি হিজরি দশম শতাব্দীতে (খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে) তার জীবৎকাল অতিবাহিত করেছেন—ইসলামি প্রযুক্তির অহংকার হিসেবে বিবেচিত। তিনি '*আত-তুরুকুস-সানিয়্যাতু ফিল-আলাতির রুহানিয়্যাহ*' গ্রন্থটির রচয়িতা।

---

৫৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

৫৮৮. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৩।

এই গ্রন্থে বেশ কিছু যান্ত্রিক কলের (মেকানিক্যাল ডিভাইস) বর্ণনা রয়েছে। যেমন জলঘড়ি, যান্ত্রিক ঘড়ি, বালুঘড়ি, কপিকল ও গিয়ারের সাহায্যে উত্তোলন-যন্ত্র, জলফোয়ারা, বাষ্পীয় টারবাইনের সাহায্যে ঘূর্ণনযন্ত্র যা বর্তমানেও আমাদের কাছে পরিচিত।[৫৮৯]

তাকিউদ্দিন আদ-দিমাশকির এই গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ তা ইসলামি যুগে যন্ত্রপ্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপের পূর্ণতা দিয়েছে। তিনি বহু যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উল্লেখ পূর্ববর্তীদের কোনো কিতাবে নেই। এমনকি তখনও ইউরোপের রেনেসাঁসকালের বিখ্যাত রেফারেন্সগ্রন্থগুলোতেও এসব যন্ত্রের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাকিউদ্দিনের এ গ্রন্থটি ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। কারণ এটি যন্ত্রপাতির উপস্থাপনায়, বৈশিষ্ট্যায়ন ও বর্ণনায় ছিল প্রজেকশনযুক্ত আধুনিক প্রকৌশলীয় অঙ্কনের (engineering drawing) যে ধারণা (কনসেপ্ট) তার অধিকতর নিকটবর্তী। কিন্তু তিনি যন্ত্র-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন একই ধরনের অঙ্কনে, যেখানে প্রজেকশন-ধারণা ও অঙ্কন-ধারণার সম্মিলন ঘটেছে। অর্থাৎ, তা হলো ঘনদর্শন অঙ্কনকৌশল (stereoscopic perspective)। এ কারণে বিশেষজ্ঞদের টেক্সট পাঠ ও অঙ্কন বোঝার জন্য গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন, যাতে তারা মানসপটে যে চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন তা যথার্থ হয়।

তাকিউদ্দিন তার গ্রন্থে একাধিক জল উত্তোলন-যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ছয় সিলিন্ডারযুক্ত পাম্প। এতে তিনি প্রথমবারের মতো একই সারিতে ছয়টি সিলিন্ডার স্থাপনের জন্য সিলিন্ডার-ব্লক ব্যবহার করেছেন, একের পর এক বৃত্তাকারে সজ্জিত ছয়টি উদ্ভেদ (protrusion)-যুক্ত ক্যামশাফ্‌ট[৫৯০] ব্যবহার করেছেন, ফলে সিলিন্ডারগুলো (ক্যামশাফ্‌টের ক্যামের পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে) পর্যায়ক্রমে কাজ করতে থাকে এবং একটি শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় জলের প্রবাহ

---

৫৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৫৯০. ক্যাম ব্যবস্থা (cam mechanism) : একটা যান্ত্রিক সংযোগ যার কাজ হচ্ছে কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পথে এই সংযোগের বহির্মুখী বা ফলদায়ক অংশকে (আউটপুট লিংক) পরিচালিত করা। ফলদায়ক অংশকে বলে ফলোয়ার। বিভিন্ন ইঞ্জিনে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেখানে ক্যাম তার ক্যামশাফ্‌টসহ বৃত্তাকৃতির গতি বা চক্রগতিতে ঘুরতে থাকে। অপরদিকে ফলোয়ার এই ক্যামের পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উপর-নিচ করতে থাকে। ক্যামশাফ্‌টকে বাংলায় 'দন্তক ঈষা' বা দাঁতযুক্ত দণ্ড বলা যায়। ক্যাম মানে দাঁত, শাফ্‌ট মানে দণ্ড।-অনুবাদক

অব্যাহত থাকে। তাকিউদ্দিন পরামর্শ দিয়েছেন যে, সিলিন্ডারের সংখ্যা তিনটির কম হবে না, যাতে পানির উত্তোলন বিরতিহীনভাবে কোনো বিঘ্ন ছাড়াই চলতে থাকে। এখানে বিচ্ছিন্নতা ও কোনোরকম বাধাবিঘ্নতা এড়িয়ে চলার যে প্রাগ্রসর ধারণা (কনসেপ্ট) তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক গতিশীল সুস্থিতি (Dynamic equilibrium)-এর ধারণা। এই মূলনীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক মাল্টি-সিলিন্ডার ইঞ্জিন ও কমপ্রেসরের প্রযুক্তি।

তাকিউদ্দিন ছয় সিলিন্ডারযুক্ত পিস্টন পাম্পের যে নকশা অঙ্কন করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রতিটি পিস্টনদণ্ডের মাথায় নির্দিষ্ট ওজনের সিসা বসিয়ে দিয়েছেন, যাতে পিস্টনের ওজন ঊর্ধ্বমুখী টিউবের মধ্যে স্থাপিত জলদণ্ডের ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এই নকশা প্রস্তুতের মধ্য দিয়ে তাকিউদ্দিন স্যামুয়েল মোরউন্ডের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন। মোরল্যান্ড ১৬৭৫ সালে প্লাঞ্জার পাম্পের (Plunger pump) যে নকশা তৈরি করেন তাতে প্লাঞ্জারের ওপর সিসানির্মিত কয়েকটি চাকতি বসিয়ে দেন, তাই প্লাঞ্জারটি জলে নিমজ্জনের অবস্থায় ফিরে যায় এবং সিসার প্রভাবে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা পর্যন্ত পানি ঠেলে দেয়।[৫৯১]

এভাবেই প্রযুক্তির পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দাবি বাতিল হয়ে যায়। তাদের দাবি এই যে, যন্ত্রপ্রকৌশলের ময়দানে ইসলামি প্রযুক্তির স্বভাব হলো মজা করা, বিনোদন ও খেলাধুলা এবং অলস সময় কাটানো। এসব ঐতিহাসিক তাদের বক্তব্যে মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি ইনসাফ ও সুবিচার করেননি। তাদের দাবির অসারতা প্রমাণে ওয়াটার হুইলের সেসব সাক্ষ্যই যথেষ্ট যেগুলো আটার কল ও আখ-মাড়াই যন্ত্র ঘোরাতে, শস্য মাড়াই করতে এবং জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য জল উত্তোলনে ব্যবহৃত হতো। ব্যাপক আকারে জলশক্তি ও বায়ুশক্তিও ব্যবহৃত হতো। বাস্তব জীবনের সব ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। পৌর নকশা প্রণয়ন, জলসেচ-ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, ভবন-স্থাপনা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয় ছিল বাস্তবিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ইসলামি সভ্যতার যুগে প্রকৌশলীরা ও

---

৫৯১. ড. আহমাদ ফুয়াদ পাশা, *আত-তুরাসুল ইলমিয়্যিল ইসলামিয়্যি.. শাইউন মিনাল মাযি আম যাদুন লিল-আতি*, পৃ. ৩৬।

যন্ত্রকারিগরেরা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। জটিল ক্ষেত্রে তারা প্রথমে পরিকল্পনা তৈরি করতেন, তারপর তারা বাস্তবে যা করতে যাচ্ছেন তার ছোট একটি নমুনা প্রস্তুত করতেন। তারপর অধুনা যন্ত্রকারিগরেরা পূর্ববর্তী মুসলিম প্রযুক্তিবিদেরা তাদের রচনাবলিতে যে ব্যাখ্যা ও বিবরণ রেখে গেছেন সে অনুযায়ী সংযোজনাদি ও যন্ত্রপাতি পুনর্নির্মাণ করতেন।[৫৯২]

---

৫৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

মানবসভ্যতায় মুসলিমদের যে অবদান-পরম্পরা তাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। তা হলো আকিদা, চিন্তা ও সাহিত্য সম্পর্কিত। এটিকে ইসলামি সভ্যতার একটি মৌল বিষয় বিবেচনা করা হয় এবং এসব বিষয়ে ইসলামি সভ্যতা অনন্য। এই অধ্যায়ে আমরা এসব ক্ষেত্রে কী কী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা তুলে ধরব। নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলোতে তা আলোচিত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান

আকিদা-বিশ্বাস ও আকিদাগত ধারণার ক্ষেত্রে মুসলিমরা অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনো করছেন। পূর্ববর্তী ও সামসময়িক জাতি-গোষ্ঠী ও সভ্যতাগুলো বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও ইবাদতের উপযুক্ত ইলাহের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছে। মুসলিমরা একত্বকে এবং ইবাদতের উপযুক্ততাকে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই স্থির করেছেন। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সকল কর্তৃত্ব একমাত্র তারই। এই বিশ্বাস গোটা মানবতার জন্য এক বিরাট উপহার। বিশেষ করে, যখন আমরা জানি যে সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভে আকিদা ও বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই অধ্যায়ে আমরা আকিদাগত ধারণার সংশোধনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা কী এবং তারা কী অবদান রেখেছেন তা আলোকপাত করব। দুটি অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আমরা তা তুলে ধরব।

প্রথম অনুচ্ছেদ : পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : তাওহিদ ও আকিদাগত ধারণার সংশোধন

প্রথম অনুচ্ছেদ

পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর আকিদা-বিশ্বাস

ইসলামপূর্ব বিশ্ব ইলাহত্বের হাকিকত ও সত্য সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার বশীভূত ছিল। আল্লাহর মহত্ত্বকে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে এমন কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এ ব্যাপারে সবার ধারণা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধোঁয়াশাপূর্ণ। অজ্ঞতা ও অলিক ধ্যানধারণাই এমন দৃষ্টিভঙ্গির চারপাশ ঘিরে রেখেছিল। সত্য এই যে, অন্যান্য সভ্যতা–যেমনটা তাদের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয়–আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে চিনতে পারেনি, মহান আল্লাহর পরিচয়ই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার ব্যাপারে যথার্থ ঈমানের পথ তারা পায়নি। পরিপূর্ণ ইলাহত্বের হাকিকতও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। যে ইলাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা এবং ক্ষমাপরায়ণ ও দয়ালু। কারণ পথপ্রদর্শক নবুয়তের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না, নিষ্কলঙ্ক ওহির সঙ্গেও তাদের সরাসরি যোগাযোগ ঘটেনি। ফলে তারা 'প্রথম কার্যকারণ' বা 'প্রথম অনুঘটক' বা 'ওয়াজিবুল উজুদ' সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিজস্ব পথ অবলম্বন করেছে। তাই তারা হোঁচট খেয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে অনুমান-আন্দাজ, ভ্রান্তি এবং প্রবৃত্তিতাড়িত ধ্যানধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে।

এমনকি যেসব দার্শনিকের নাম ইতিহাস ঈশ্বরবাদী হিসেবে উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যারা মোটামুটিভাবে ইলাহত্বকে স্বীকার করেছে, যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো বিশাল বিশাল দার্শনিক, যারা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদেরও ইলাহত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল না, বরং তাদের ধারণা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সংশয়গ্রস্ত এবং অনেক অনুমান ও ভেজালমিশ্রিত। গ্রিকদের প্রথম শিক্ষক অ্যারিস্টটল যে ইলাহ বা স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে তা আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। দেখি কেমন সেই ইলাহ? তিনি কি সেই ইলাহ যাকে আমরা জানি সবকিছুর স্রষ্টা, জীবিত সবকিছুর

রিযিকদাতা, সবকিছুর নিয়ন্তা, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত, যা চান তা-ই করেন, সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান? নাকি তিনি আমরা যাকে জানি সেই ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ?[৫৯৩]

উইল ডুরান্ট '*মাবাহিজুল ফালাসাফা*' গ্রন্থে বলেছেন, অ্যারিস্টটল ঈশ্বর বা আল্লাহকে একটি আত্মারূপে কল্পনা করেছে, যা তার সত্তাকে ধারণ করে আছে। তা একটি রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় গুপ্ত আত্মা। কারণ অ্যারিস্টটলের ইলাহ বা ঈশ্বর কখনো কোনো কাজ করেন না। তার কোনো ইচ্ছা নেই, অভিপ্রায় নেই, উদ্দেশ্য নেই। তার কার্যক্ষমতা এতটাই পবিত্র ও নির্ভেজাল যে, তা তাকে কোনো কাজ করতে দেয় না। তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ, কোনো ব্যাপারে নাক গলানো তার জন্য সংগত নয়। এ কারণেই তিনি কোনো কাজ করেন না। তার একটিই দায়িত্ব, বস্তুরাশির মৌল পদার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এই যুক্তিতে যে, তিনিই সত্তাগতভাবে যাবতীয় বস্তুর মৌল পদার্থ এবং সকল বস্তুর আকৃতি। এ কারণে তার একমাত্র কাজ হলো নিজ সত্তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ইংরেজরা অ্যারিস্টটলকেই ভালোবাসবেন, কারণ তার ঈশ্বর স্পষ্টভাবে তাদের সম্রাটেরই অবিকল নকল অথবা তাদের সম্রাট অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরেরই কার্বন কপি।[৫৯৪]

অ্যারিস্টটলের ঈশ্বর ছিলেন নিঃস্ব-অপদার্থ, বিশ্বনিখিলে ক্রিয়াকর্মে তার সক্ষমতা ছিল না, কোনোকিছুর সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু প্লেটোর ঈশ্বর অ্যারিস্টটলের ঈশ্বরের চেয়েও নিঃস্ব-অপদার্থ, অর্থাৎ আধুনিক প্লেটোবাদ যে ঈশ্বরের কথা বলে থাকে। কারণ এই ঈশ্বর কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করেন না, এমনকি তার নিজের সত্তা নিয়েও নয়![৫৯৫]

---

৫৯৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ*, পৃ. ১৪।

৫৯৪. উইল ডুরান্ট, *দা স্টোরি অফ ফিলোসফি* (*The Story of Philosophy*), আরবি অনুবাদ, *মাবাহিজুল ফালসাফা*, অনুবাদক, আহমাদ ফুয়াদ আল-আহওয়ানি, পৃ. ১৬১-১৬২, ইউসুফ আল-কারযাবি, *আল-ইসলাম হাদারাতুল গাদ*, পৃ. ১৪-১৫ থেকে উদ্ধৃত।

৫৯৫. মাহমুদ আব্বাস আল-আক্কাদ, *আল্লাহ*, পৃ. ৭৮, ১৩১।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীতে পৌত্তলিকতাবাদ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শুধু ভারতে ঈশ্বরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৩০ মিলিয়ন বা ৩৩ কোটিতে। প্রতিটি বস্তু হয়ে উঠেছিল অনন্য, প্রতিটি জিনিসই ছিল আকর্ষক, জীবনের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুই ছিল দেবতা, যাদের উপাসনা করা হতো। এভাবে মূর্তি, প্রতিমা, দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে অসংখ্য হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর ও দেবতারা ঐতিহাসিক চরিত্র ও বীরের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কতিপয় দেবতা ভাস্বর হয়েছিল পাহাড়ের ওপর, কেউ কেউ উপস্থিত হয়েছিল সোনা-রুপা ইত্যাদি খনিজ পদার্থরূপে, নদীরূপেও ছিল দেবদেবী, কোনো কোনো দেবতা ছিল যুদ্ধাস্ত্ররূপে, প্রজননযন্ত্ররূপেও ছিল কেউ কেউ, চতুষ্পদ জন্তুজানোয়ারও ছিল দেবদেবী, এগুলোর প্রধান হলো গাভি। গ্রহনক্ষত্রও ছিল দেবতা, দেবতা ছিল আরও অনেককিছু। ধর্ম পরিণত হয়ে ছিল কুসংস্কার, রূপকথা ও সংগীতের রূপে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও উপাসনার ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। কোনো কালে সুস্থ বিবেকবুদ্ধিও তা মেনে নেয়নি। বর্তমান যুগে মূর্তির আকার-আকৃতি পূর্বের সব যুগকে ছাড়িয়ে গেছে। সব স্তরের মানুষ, রাজাবাদশা থেকে নিয়ে কপর্দকহীন লোক পর্যন্ত সবাই মূর্তিপূজার ওপর অটল রয়েছে।[৫৯৬]

অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মানুষের কাছেই মানবিকতার মূল্য হারিয়েছে। তারা পাথর, বৃক্ষ ও নদনদীর সিজদা করেই যাচ্ছে, তারা এমন সবকিছুর পূজা করছে যা নিজেরই কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতি প্রতিহত করতে পারে না।

রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্মের ধ্বজাধারী। তারা বড় দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের একটি ক্যাথলিক, অপরটি অর্থোডক্স। অর্থোডক্সরা তাদের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী দুটি উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, একটি হলো মুলকানিয়া, অপরটি হলো মানুফিসিয়া। এসব দল ও উপদলের মধ্যে তীব্র লড়াই জারি ছিল। প্রত্যেক দলই তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তারা সবাই আল্লাহর সঙ্গে অন্যদের শরিক

---

৫৯৬. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪০ এবং *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১।

করত, শরিক করার পদ্ধতি নিয়ে ছিল তাদের মধ্যে মতবিরোধ। আল্লাহর বদলে পুরোহিত ও ধর্মগুরুরাই হয়ে উঠেছিল ঈশ্বর।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস হলো ধর্মীয় (পোপীয়) কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে বিরোধ ও লড়াইয়ের ইতিহাস। পোপীয় কর্তৃত্ব আল্লাহর নামে কথা বলার অধিকার কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। তারা ছিল সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে, তাদের জবাবদিহি আদায় করার বা তাদের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার অধিকার কারও ছিল না। রাজাবাদশাদের ওপরও কর্তৃত্ব ফলাত তারা, ধর্মের নামে রাজাবাদশাদেরও চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে হতো। এই পোপীয় কর্তৃত্বের সঙ্গে লড়াই জারি ছিল শাসকগোষ্ঠীর, সম্রাট, বিশপ ও আমিরদের, যারা জনগণের ওপর তাদের ক্ষমতা চর্চা করতে চাইত, তাদের উপযুক্ততা প্রমাণ করতে চাইত এবং প্রজাদের ওপর তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখত। তারা চাইত না কোনো শক্তি তাদের চ্যালেঞ্জ করুক, সেটা যে নামেই হোক, যে কারণেই হোক, এমনকি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত পোপীয় শক্তিও নয়।

১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পোপ সপ্তম গ্রেগরি[৫৯৭] ঘোষণা দিলেন যে গোটা পৃথিবীতে কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র গির্জা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা সরাসরি কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করবে। গির্জার এই ভূমিকা পালনের ফলে পৃথিবীর সব সম্রাট ও শাসকদেরকে পোপের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পোপ হবেন একচ্ছত্র কর্তৃত্বপরায়ণ। তিনিই বিশপ ও যাজকদের নিয়োগ দেবেন এবং তাদের বরখাস্ত করবেন। এমনকি তিনি প্রধান বিশপদের বা গির্জাপ্রধানদেরও পদচ্যুত করার ক্ষমতা রাখেন। কারণ পোপই তাদের নেতা, অন্যরা সবাই তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করবে, তিনি যা করবেন তার জন্য কোনো জবাবদিহি করবেন না। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে পোপেরা যেসব বিশপ ও সম্রাটদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকত তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন। ইংল্যান্ডের সম্রাট চতুর্থ হেনরির[৫৯৮] সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। ১১০৭ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে তিনি পোপের ফটকের সামনে খালি পায়ে ও খালি মাথায় বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে তিন দিন অবস্থান করতে বাধ্য হন। আরও ঘটনা আছে। পোপ

৫৯৭. Pope Gregory VII, 1015-1085.

৫৯৮. Henry IV of England (Henry Bolingbroke).

তৃতীয় ইনোসেন্ট[৫৯৯] ইংল্যান্ডের রাজা জনের ওপর ক্রুদ্ধ হন। গোটা ইংল্যান্ডের ওপর তার ক্রোধের অভিশাপ নেমে আসে। তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। ফরাসি সম্রাটকে তিনি ইংল্যান্ডে আক্রমণ করতে ও তা দখল করে নিয়ে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে উসকানি দেন। ফলে ইংল্যান্ডের রাজা পোপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। রাজা জন পোপের আনুগত্য করার ঘোষণা দেন এবং তার কর্তৃত্বাধীন থাকবেন বলে শপথ গ্রহণ করেন। পোপের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তারপর পোপ তাকে ক্ষমা করেন।

১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট তার শীর্ষস্থানীয় লোকদের কাছে একটি নির্দেশনা পাঠান। তাতে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনিই ঈসা মাসিহের স্থলাভিষিক্ত, তার অবস্থান আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যবর্তী স্থানে, রবের নিচে ও মানুষের ওপরে। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করবেন, তার ওপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারবে না।[৬০০]

কোনো সন্দেহ নেই যে, খ্রিষ্টধর্মের গুরুদের এমন বিকৃতি, কর্তৃত্বপরায়ণতা, জোর-জুলুম-জবরদস্তি মানুষকে গির্জা বিমুখ করে দিয়েছিল। এসব কারণেই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ গির্জা কর্তৃপক্ষের হম্বিতম্বি ও ঔদ্ধত্য থেকে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করছে, ধর্মের লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতায় মনোযোগী হচ্ছে এবং ধর্মকে পার্থিব যাবতীয় বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

আরবরা শুরুর দিকে—ইতিপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি—আল্লাহর ইবাদত করত, আল্লাহর একত্ব স্বীকার করত এবং বিশ্বাস করত যে তিনি সবচেয়ে বড় ইলাহ, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, আকাশ ও জমিনের নিয়ন্ত্রক, সবকিছুর কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

---

৫৯৯. Pope Innocent III, 1160-1216.

৬০০. আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাতি ফিল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৩৮-৩৯।

তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।[৬০১]

কিন্তু বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের যা-কিছু স্মরণ রাখতে বলা হয়েছিল তার অধিকাংশই তারা ভুলে গেল এবং আল্লাহর সঙ্গে শরিক করতে শুরু করল। আল্লাহ ও তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে নিলো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাদের উসিলা মানত এবং তাদের নাম উল্লেখ করে তাদের কাছেও প্রার্থনা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

আমরা তো এদের পূজা এই জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।[৬০২]

তারা এগুলোর নানা ধরনের পূজায় লিপ্ত হলো এবং তাদের মগজে এদের সুপারিশের চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে গেল এবং তারা এই বিশ্বাসে উপনীত হলো যে এগুলো তাদের জন্য কল্যাণের বা অকল্যাণের সুপারিশ করতে সক্ষম। এভাবে তারা শিরকে উপনীত হলো এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করল। তারা এ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করল যে এগুলো পৃথিবীর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং সত্তাগতভাবেই উপকার ও অপকার, কল্যাণ ও অকল্যাণ, দেওয়া ও না দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।[৬০৩]

জাযিরাতুল আরবে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি প্রতি গোত্রে মূর্তি স্থাপিত হলো, তারপর ঘরে ঘরে মূর্তি তৈরি হলো। ইবনুস সায়িব আল-কালবি[৬০৪] বলেছেন, মক্কার প্রত্যেক গৃহকর্তার বাড়িতে একটি করে মূর্তি ছিল, বাড়ির সবাই সেই মূর্তির উপাসনা করত। তাদের কেউ সফর

---

৬০১. সুরা আনকাবুত : আয়াত ৬১।

৬০২. সুরা যুমার : আয়াত ৩।

৬০৩. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৪৫।

৬০৪. ইবনুস সায়িব আল-কালবি : আবুন নদর মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব ইবনে বিশর ইবনে আমর (মৃ. ১৪৬ হি./৭৬৩ খ্রি.)। আরবদের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। কথক ইতিহাসবিদ। কুফার অধিবাসী, এখানেই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিয়া মতাবলম্বী। ইতিহাস বিষয়ে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

করতে চাইলে বাড়িতে সর্বশেষ যে কাজটি করত তা হলো মূর্তিটির গায়ে হাত বুলানো। সফর থেকে ফিরে এসে বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথম যে কাজটি করত তা হলো ওই মূর্তির গায়েই হাত বুলানো। আরবরা মূর্তিপূজায় এতটা মগ্ন হলো যে তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ মূর্তিঘর নির্মাণ করল, কেউ মূর্তি নির্মাণ করল। যাদের এসব করার সামর্থ্য ছিল না তারা হারামের সামনে একটি পাথর স্থাপন করল অথবা যেখানে ভালো মনে করল সেখানে পাথর স্থাপন করল। তারপর কাবাঘরের মতো এটির চারপাশে তাওয়াফ করতে লাগল। তারা এগুলোর নাম দিলো 'আনসাব'। কেউ সফরে বেরুতে চাইলে হাতে চারটি পাথর নিত, যে পাথরটিকে সবচেয়ে সুন্দর মনে হতো সেটিকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে সঙ্গে নিয়ে যেত এবং বাকি তিনটিকে চুলার ঝিঁক[৬০৫] হিসেবে রেখে দিত। সফর থেকে ফিরে এসে ওই সুন্দর পাথরটিকে ফেলে দিত।[৬০৬] আবু রাজা আল-আতারিদি বলেন,

«كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ»

> আমরা পাথরের পূজা করতাম। যখন এটির চেয়ে ভালো কোনো পাথর পেতাম তখন এটি ফেলে দিয়ে ওই ভালোটিকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতাম। পাথর না পেলে আমরা মাটির ঢিবি বানিয়ে নিতাম, দুগ্ধবতী ছাগী নিয়ে এসে ওই ঢিবির ওপর দোহন করাতাম, তারপর ঢিবিটির চারপাশে তাওয়াফ করতাম।[৬০৭]

কাবাঘরের ভেতরে ও তার আঙিনায় তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল, যে ঘরটি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।[৬০৮]

---

৬০৫. চুলার ওপর বসানো পাথরের তিনটি টুকরো, যেগুলোয় রান্নার হাঁড়ি বসানো হয়।

৬০৬. আবুল মুনযির হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুস সায়িব আল-কালবি, *কিতাবুল আসনাম*, তাহকিক, আহমাদ যাকি পাশা, পৃ. ৩৩।

৬০৭. *বুখারি*, কিতাব : আল-মাগাযি, বাব : ওয়াফদু বানি হানিফাহ ওয়া হাদিসু সুমামাহ ইবনে আসাল, হাদিস নং ৪১১৭।

৬০৮. *বুখারি*, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব : আল-মাযালিম, বাব : হাল তুকসারুদ দিনান আল্লাতি ফিহাল খাম্‌র আও তুখাররাকুয যিকাক, হাদিস নং ২৩৪৬; *মুসলিম*,

দ্বীন-ধর্ম, আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের উপযুক্ত উপাস্যের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্যানধারণা ছিল এমনই। তাওহিদের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে সেখানে পৌত্তলিকতা স্থান করে নিয়েছিল। কুদরত, রবুবিয়্যাত ও স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যাবলি তিরোহিত হয়েছিল। একইসঙ্গে মানবতার বিপর্যয় ঘটেছিল, সভ্যতাকেন্দ্রিক সব ধরনের মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটেছিল।

কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : ইযালাতুল আসনাম মিন হাওলিল কাবা, হাদিস নং ১৭৮১।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তাওহিদ ও আকিদাগত চিন্তাধারণার সংশোধন

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অলিক ধ্যানধারণা, কুসংস্কার ও আকিদাগত ভ্রান্তির মোকাবিলায় এবং গোটা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার সামনে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটল, সেদিন থেকেই তাওহিদের আকিদার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান শুরু হয়েছে। এই আকিদা মানবতার জন্য ইসলামের সবচেয়ে বড় উপহার, মানবতা এমন উপহার কখনো পায়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কখনো পাবেও না।

ইসলামের আকিদায় এই বিশ্ব মালিকহীন নয়, বরং তার একজন মালিক রয়েছে। তিনি হলেন তার স্রষ্টা, তার রূপকার, তার শাসনকর্তা, তার নিয়ন্ত্রক, সকল সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তাঁরই। শাসন চলবে তাঁরই।

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই।[৬০৯]

এই পৃথিবীতে তাঁর আদেশ ও ক্ষমতার বাইরে কিছুই ঘটে না। পৃথিবীর অস্তিত্বের মূল কারণ হলো তাঁর অভিপ্রায় ও সক্ষমতা। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাঁর বশীভূত ও তাঁর অনুগত এবং তাঁর কাছে সমর্পিত।

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

আকাশে ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে তার সবই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।[৬১০]

ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অধিকারী সকল সৃষ্টির উচিত তাঁর আনুগত্য করে নেওয়া।

---

৬০৯. সুরা আরাফ : আয়াত ৫৪।

৬১০. সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮৩।

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।[৬১১], [৬১২]

কারণ আল্লাহ তাআলাই গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য, সকল সৃষ্টির তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদত করা আবশ্যক।

ইসলাম এ ব্যাপারে চূড়ান্ত দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ ব্যাপারেও চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল পেশের আঙ্গিকে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾

যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।[৬১৩]

আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

বলো, তোমরা আমাকে দেখাও যাদের শরিকরূপে তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছ তাদের। না, কখনো না,[৬১৪] বরং তিনি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬১৫]

সত্য এই যে, এই যুক্তি অত্যন্ত সন্তোষজনক, বিশ্ববাসী সবাই এই যুক্তি গ্রহণ করেছে ও সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করেছে।

---

৬১১. সুরা যুমার : আয়াত ৩।

৬১২ আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১।

৬১৩. সুরা আম্বিয়া : আয়াত ২২।

৬১৪. যাদেরকে শরিক করা হয়েছে তাদেরকে শরিক হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করতে পারোনি এবং কখনো পারবেও না।-অনুবাদক

৬১৫. সুরা সাবা : আয়াত ২৭।

এখানে কারও কারও ভুল হয়ে থাকে, যারা এই ধারণা করেন যে, আরব মুসলিমরা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে ইসলামও ছড়িয়ে পড়েছে এবং আরবদের সংখ্যাধিক্যের ফলে তাওহিদি বিশ্বাসের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং ভুল করে থাকে যারা এই ধারণা করে যে, আরব মুসলিমরা তরবারি ও অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে ও তাওহিদি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করেছে। আমরা পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পারি।

আরব মুসলিমরা ছিল সংখ্যায় অল্প। সংখ্যায় ও গুণগত দিক থেকে তাদের অস্ত্রবল ছিল দুর্বল। তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনাও ছিল অতি নগণ্য। তারপরও ওই সময় বিশ্বের মানুষ দেশ ও জাতির ধর্মাদর্শ এবং শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতা ত্যাগ করে এই নগণ্য মানুষের ধর্মাদর্শে প্রবেশ করেছে!

স্বাভাবিকভাবেই মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, বিশ্বের মানুষ এই কাজ কেন করেছিল? কেন তারা এই ধর্মাদর্শে প্রবেশ করেছিল?

এই প্রশ্নের জবাব এইভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এই ধর্মাদর্শ ছিল সন্তোষজনক, এই ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস ছিল যৌক্তিক ও মানুষের স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই আকিদা-বিশ্বাসের ফিতরাত দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারা এক সত্তার ইবাদত করবে, যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কোনো শরিক নেই।

এখন আমরা কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করব :

- আরবদের মূলত কে বাধ্য করেছিল ইসলামে প্রবেশ করতে, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিরা ছিলেন সংখ্যায় ও শক্তিতে নগণ্য ও দুর্বল?
- ইসলামে প্রবেশ করতে মিশরীয়দের বাধ্য করেছিল কে? কে তাদের জবরদস্তি করেছিল? এটা কি বোধগম্য যে, মাত্র আট হাজার সৈনিক মিশরীয়দের মতো একটি প্রাচীন জাতিকে বাধ্য করেছিল? বিজয়কালীন যাদের সংখ্যা ছিল ৮০ লাখেরও বেশি তা ছাড়া এটাও জানা কথা যে, মিশর ছিল কার্যতভাবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন এবং তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী।

- কে পারস্যবাসীকে শত শত বছরের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করতে এবং ইসলামকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য করেছে? অথচ তারা সংখ্যায় বিপুল এবং তাদের রয়েছে দীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস!
- কে দক্ষিণ আফ্রিকা, আন্দালুস, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কি ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে?
- বরং কে বর্তমান বিশ্বকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছে? অথচ সবাই স্বীকার করছে যে মুসলিমরা অন্যদের তুলনায় অত্যন্ত নাজুক ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। কেবল যে ইসলামে প্রবেশের ঘটনা ঘটছে তা নয়, ইসলাম বরং বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে সম্প্রসারণশীল ধর্ম!

যে সত্যে কোনো সন্দেহ নেই তা এই যে, আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব পূর্ণাঙ্গ এবং আল্লাহর দ্বীনে কোনো ত্রুটি নেই, কোনো ভ্রান্তি নেই। এ কারণেই যে-কেউ ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করবে, ইসলামকে ভালোভাবে জানবে, তাকে স্বীকার করতেই হবে যে এটি সত্য ধর্ম। চাই সে এই ধর্মের অনুসরণ করুক বা না করুক।

আরেকটি সত্য এই যে, আকিদা ও বিশ্বাসগত ধারণার ক্ষেত্রে মুসলিমদের যে অবদান তার প্রভাব কেবল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ওপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অমুসলিমরাও এতে উপকৃত হয়েছে। (যার আলোচনা সামনে আসব)। তাদের কাছে আকিদা ও বিশ্বাসের বাস্তবিক দিকগুলো উন্মোচিত হয়েছে, একত্ববাদ (তাওহিদ) কী এবং কেন তা-ও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ফলস্বরূপ মানুষের ওপর প্রথম যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব তাতে তারা উপলব্ধি করেছে যে গোটা বিশ্ব একটি কেন্দ্রের ও একই ব্যবস্থার অনুসারী, বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে স্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তাদের নীতি-বিধানের মধ্যেও ঐক্য রয়েছে। এই বিশ্বাস ও উপলব্ধির পর মানুষ জীবনের পূর্ণাঙ্গ

ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে এবং নিজেদের চিন্তা ও কর্মাবলিকে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।[৬১৬]

কোনো সন্দেহ নেই যে, সর্বশক্তিমান এক ইলাহের প্রতি ঈমান মানুষের চিন্তাকে বহু-ঈশ্বরবাদের খপ্পর থেকে মুক্তি দিয়েছে, বিশুদ্ধ স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে বহু-ঈশ্বরবাদ কখনো মেলে না। জীবন ও জগতের সকল গতিপথের নিয়ন্তা মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী আত্মশক্তি ও দেহশক্তির মুক্তি ঘটেছে, আল্লাহর হাতেই রয়েছে সৃষ্টি সকলের ভাগ্যলিপি, সৃষ্টির সবাই কাজেকর্মে তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। সকলের অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে বিশ্বজগতের একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি চতুষ্পার্শ্বে চলমান সবকিছু দেখেন, যিনি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করেন এবং অপরাধী-পাপীদের শাস্তি দেন, দুনিয়াতে না হলে আখিরাতে দেন। তিনি কারও সৎকর্মকে বাতিল করেন না এবং তাঁর কাছে কারও অধিকার খর্ব হয় না।[৬১৭]

কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজব্যবস্থার ওপরও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। যখন আমরা একটি পরিচ্ছন্ন সমাজ গঠন করতে চাই, যে সমাজের নেতৃত্ব ন্যায়পরায়ণ ও চালিকাশক্তি প্রজ্ঞাপূর্ণ, যে সমাজ অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ, সদস্যরা ভ্রাতৃত্বকামী ও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগী, তখন ইসলামি বিশ্বাসের প্রভাবের বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন একটি সমাজই যখন আমাদের কাম্য, আমাদের উচিত ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ওপরই সেই সমাজকে গড়ে তোলা। তার কারণ ইসলামি বিশ্বাসই এমন সমাজনির্মাণের ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপরই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একটি উন্নত সভ্য শ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাণ করেছেন। ফলে যে ইসলামি উম্মাহ গঠিত হয়েছে তার কাছে পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত গোটা বিশ্ব নতি স্বীকার করেছে।

উস্তাদ আবুল হাসান আলি নদবি বলেন, সবচেয়ে বড় জট খুলে গেল। সেটা হলো শিরক ও কুফরির জট। এই জট খোলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছোট-বড় সব জটও খুলে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৬১৬. আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২২।

৬১৭. জামাল ফাওযি, *মাআলিমুল হাদারাতিল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ১৬।

তাদের সঙ্গে তার প্রথম জিহাদই করেছেন, ঈমান ও আকিদার জিহাদ। তাই তার প্রতিটি আদেশ ও প্রতিটি নিষেধের জন্য নতুন নতুন জিহাদের প্রয়োজন পড়েনি। প্রথম লড়াইয়েই ইসলাম জাহিলিয়াতের ওপর বিজয়ী হয়েছে। পরবর্তী প্রতিটি লড়াইয়ে বিজয়ই ছিল ইসলামের মিত্র।... যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলো তখন উপচে পড়া পানপাত্র ছিল তাদের হাতে, কিন্তু মুহূর্তেই আল্লাহর নির্দেশ মদের পেয়ালা এবং উন্মুক্ত ঠোঁট ও উত্তেজিত চিত্তের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। মদের মটকাগুলো ভেঙে ফেলা হলো, ফলে মদিনার অলিতে-গলিতে বয়ে গেল মদের প্রবাহ![৬১৮]

একটিমাত্র কথাই জাতির মধ্যে দৃঢ়মূল অভ্যাসের মূলোৎপাটন করেছিল, যে অভ্যাস তারা কয়েক পুরুষ ধরে লালন করছিল।

﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

তোমরা নিবৃত্ত হবে না?

তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিবৃত্ত হলাম; আমরা নিবৃত্ত হলাম, হে আমাদের প্রতিপালক...।

আমেরিকাও মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ তারা এই কাজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন-সাময়িকী, ভাষণ-বক্তৃতা, ছবি, সিনেমা সবই তারা মদের অপকারিতা বর্ণনা করতে ব্যবহার করেছে। মদ-বিরোধী যুদ্ধে ৬০ মিলিয়ন[৬১৯] ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছে তারা। মদের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করে প্রায় দুই বিলিয়ন (দুইশ কোটি) পৃষ্ঠা ছেপেছে। মদ-বিরোধী আইন প্রয়োগে ২৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেছে। তিনশ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। অর্ধ-মিলিয়নেরও বেশি লোককে কারাগারে পুরেছে। প্রায় চারশ চার মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু এতকিছুর পরও মদের প্রতি মার্কিন জাতির আসক্তিই বেড়েছে। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৩৩ সালে মদ বৈধ

---

৬১৮. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৯০।

৬১৯. ১ মিলিয়ন = ১০ লাখ।

ঘোষণা করেছে। কারণটা খুব সহজ। তাদের মদ-বিরোধী নির্দেশ বাস্তবায়ন বিশ্বাসজাত বা আকিদাজাত কিছু ছিল না।[৬২০]

এই ভিত্তির ওপরই ইসলামের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে বিশুদ্ধ, সুন্দর ও সহজ আকিদা-বিশ্বাস প্রদান করে অন্যান্য বিশ্বাস থেকে তাদের অমুখাপেক্ষী করেছে। এই বিশ্বাস প্রশান্তিদায়ক, স্বস্তিকারক, দুশ্চিন্তাবিদারক এবং সঞ্জীবনী। তাই এই বিশ্বাসের আশ্রয়ে মানুষ ভীতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় না করার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনকারী, তিনিই দাতা এবং তিনিই বারণকারী। একমাত্র তিনিই মানুষের সকল প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক। এই নতুন জ্ঞান ও চৈতন্যের আলোকে মানুষ পৃথিবীকে নতুনভাবে ও নতুনরূপে দেখতে পায়। পৃথিবী তার কাছে নবরূপে উন্মোচিত হয়। সব ধরনের দাসত্ব ও গোলামি থেকে সে সুরক্ষিত থাকে। সৃষ্টিজীবের (মানুষের) থেকে সে কিছু আশা করে না এবং ভয়ও করে না। চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে এবং চিন্তাকে এলোমেলো করে দেয় এমন সবকিছু থেকে সে দূরে থাকে। এই বহুত্বের মধ্যেও সে একত্ব অনুভব করে এবং নিজেকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে বিবেচনা করে। উপলব্ধি করে যে, সেই এই পৃথিবীর নেতা এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলার খলিফা বা প্রতিনিধি। সে তার রব ও স্রষ্টার আনুগত্য করে এবং তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে। এভাবেই তার মানবিক মহান মর্যাদা প্রমাণিত হয়, মানুষের চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শ্রেষ্ঠত্ব থেকে পৃথিবী তাকে দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত করে আসছে।

ইসলামি সভ্যতাই মানবতাকে এই দুর্লভ উপহারে ভূষিত করেছে, তা হলো তাওহিদি আকিদা-বিশ্বাসের উপহার। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্বাসের চেয়ে এই আকিদা-বিশ্বাস ছিল অধিক অজ্ঞাত, অপরিচিত, নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত। কিন্তু তারপরই গোটা বিশ্বে এই বিশ্বাসের ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বের সব ধরনের দর্শন ও দাওয়াতি কার্যক্রম এই বিশ্বাসের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে। ফলে বড় বড় কিছু ধর্ম—যাদের ভিত্তি ও বেড়ে ওঠা ছিল শিরক ও বহু-ঈশ্বরবাদের ওপর এবং যাদের রক্তে-মাংসে

---

৬২০. আবুল হাসান আলি নদবি, *মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন*, পৃ. ৬৮।

ছিল শিরক—ক্ষীণ আওয়াজে ও ফিসফিসিয়ে হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তাদের শিরকপূর্ণ বিশ্বাসরাশির দার্শনিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতেও বাধ্য হয়েছে এবং সেগুলোকে শিরক ও বিদআতের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। ইসলামের তাওহিদি আকিদার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই বড় বড় ধর্মের গুরুরা ও নেতৃস্থানীয়রা শিরকের ব্যাপারটা স্বীকার করতে এবং মানুষের সামনে তা উল্লেখ করতে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করতে শুরু করেছে। এসব শিরকপন্থী ব্যবস্থা ও ধর্মাদর্শের সবগুলোই হীনম্মন্যতাবোধে ও তুচ্ছতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। তাই তাওহিদি আকিদার উপহারই সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান উপহার, যা পেয়ে মনুষ্যজাতি সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েছে। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও ইসলামি সভ্যতার অবদানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।[৬২১]

---

[৬২১]. আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল-হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু আলাল ইনসানিয়্যাহ*, পৃ. ২১-২৪।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও বিকাশ

মানববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার বেশ কিছু শাখা মুসলিম সভ্যতার পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। বিজিত জাতি-গোষ্ঠী ও অন্যদের মধ্যে এসব বিজ্ঞানের চর্চা ও পঠনপাঠন ছিল। এসব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর ভালো ভালো কীর্তি ও অবদান রয়েছে। মুসলিমরা এগুলো থেকে উপকৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে যা-কিছু তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তারা গ্রহণ করেছে। তারপর তারা এসব বিজ্ঞানে উজ্জ্বল ও গৌরবপূর্ণ সংযোজন ঘটিয়েছে, যা এখনো পর্যন্ত তাদের স্বকীয়তা ও প্রাতিস্বিকতার চিহ্ন বহন করে চলেছে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এসব বিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : দর্শনবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইতিহাসবিজ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সাহিত্য

প্রথম অনুচ্ছেদ

দর্শনবিজ্ঞান

আরবি 'ফালসাফা' (দর্শন) শব্দটি মূলত গ্রিক শব্দ। দুটি গ্রিক শব্দখণ্ড থেকে এ শব্দটি তৈরি হয়েছে, philien (এর অর্থ ভালোবাসা, প্রেম) এবং sophia (এর অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা)। এভাবে 'ফাইলাসুফ' (দার্শনিক) বা philosopher শব্দটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞাকে ভালোবাসেন বা প্রজ্ঞাপ্রেমী।[৬২২]

মুসলিম দার্শনিকরা দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ইউসুফ আল-কিন্দি দর্শনের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,

«إِنَّهَا عِلْمُ الْأَشْيَاءِ بِحَقَائِقِهَا بِقَدْرِ طَاقَةِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْفَيْلَسُوْفِ فِيْ عِلْمِهِ إِصَابَةُ الْحَقِّ، وَفِيْ عَمَلِهِ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ»

> দর্শন হলো মানবিক সাধ্যের মধ্যে বস্তুরাশির হাকিকত বা মূল বিষয় জানা, কারণ দার্শনিকের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যে উপনীত হওয়া এবং কর্মের ক্ষেত্রে সত্য অনুযায়ী তা সম্পাদন করা।[৬২৩]

অনুবাদ-আন্দোলন শুরু হওয়ার পরই মুসলিমরা দর্শনবিদ্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক আব্বাসি যুগে। গ্রিক দর্শনের গ্রন্থরাজির জন্য আরবের পথ সুগম হয়ে ওঠে, ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে—আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আন্তাকিয়া ও হাররান পর্যন্ত এসব গ্রন্থের সয়লাব ঘটে। শুধু তাই নয়, খলিফা আল-মামুন গ্রন্থাবলি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য রোমান, অর্থাৎ বাইজান্টাইন সম্রাটদের কাছে লোক পাঠাতেন। তিনি বিশেষভাবে দর্শনের গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করতেন। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জ্ঞানের শহর হিসেবে

---

৬২২. ইয়াহইয়া হুওয়াইদি, *মুকাদ্দামা ফিল-ফালসাফা*, পৃ. ২২।

৬২৩. *রাসায়িলুল কিন্দি আল-ফালসাফিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ১৭২।

বিখ্যাত ছিল।[৬২৪] রোমানরা তার কাছে দর্শনের ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাবলি পাঠান। একইভাবে দক্ষ অনুবাদকেরাও আল-মামুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

তারা গ্রিক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। সুরয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত গ্রিক গ্রন্থাবলিও তারা হুবহু অনুবাদ করেন। কারণ, মুসলিমদের আবির্ভাবের পূর্বে গ্রিক দর্শনের অসংখ্য গ্রন্থ সুরয়ানি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এ সকল অনুবাদকের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : সারগিউস, সফরানিউস, সাওয়িরিস।[৬২৫]

অন্যান্য গ্রিক (ইউনানীয়) জ্ঞানের সঙ্গে গ্রিক দর্শনেরও অনুবাদ হলো এবং তা মুসলিম ভূখণ্ডে স্থান করে নিলো বটে, কিন্তু অব্যবহিত পরই গ্রিক দর্শন নিয়ে মুসলিম জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। কেউ কেউ গ্রিক দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন এবং একে ভ্রান্তি, গোমরাহি ও নৈরাজ্যের ফটক বলে আখ্যায়িত করলেন। এই অবস্থান ছিল কট্টরপন্থী ফকিহদের। কেউ কেউ মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করলেন। তারা গ্রিক দর্শনের সমালোচনা ও পরিশুদ্ধির পক্ষে অবস্থান নিলেন। গ্রিক দর্শনের যা-কিছু সত্য ও ভালো তা গ্রহণ করা হবে এবং যা-কিছু অসত্য ও ভ্রান্তিপূর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মুতাযিলা সম্প্রদায় ও বহু আশআরি মতাবলম্বীর অবস্থান ছিল এটিই। যেমন ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালি। তিনি গ্রিক দর্শনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন : প্রথম ভাগ, যেটাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করা আবশ্যক; দ্বিতীয় ভাগ, যেটাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করা আবশ্যক; তৃতীয় ভাগ, যেটাকে মৌলিকভাবে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।[৬২৬]

কেউ কেউ গ্রিক দর্শনকে বিস্ময়কর ও অভাবিত জ্ঞান হিসেবে আলিঙ্গন করেছেন, তারা এর পঠনপাঠন ও চর্চায় নিয়োজিত হয়েছেন, সেগুলোর অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। তারা গ্রিক দর্শনের রীতি ও আদলে লেখালেখি করেছেন। এই অবস্থানে রয়েছেন আল-কিন্দি ও তার অনুসারীরা।[৬২৭]

---

৬২৪. ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল বুলদান*, খ. ৭, পৃ. ৮৭।

৬২৫. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২০-২২১।

৬২৬. আল-গাযালি, *আল-মুনকিযু মিনাদ দালাল*, পৃ. ১০১।

৬২৭. আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২২, ২৩।

আরব প্রাচ্যে বা মরক্কো ও আন্দালুসে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একটি শ্রেণি গ্রিক দর্শনের সেবা করতে চেয়েছেন এবং গ্রিক দর্শনের প্রতি বিমুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। যেমন শেষ দৃষ্টান্তে আমরা উল্লেখ করেছি তা সত্ত্বেও তারা যে কেবল গ্রিক জ্ঞান-ঐতিহ্যের সংরক্ষক ছিলেন অথবা মধ্যযুগে ও পরবর্তী সময়ে প্রাচীন গ্রিস (ইউনান) থেকে ইউরোপে এই জ্ঞান আমদানির বাহক ছিলেন তা নয়, যদিও কতিপয় প্রাচ্যবিদ তাদেরকে এভাবেই চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আল-কিন্দি বা আল-ফারাবি বা ইবনে সিনা বা ইবনে রুশদ প্রমুখ মনীষীর উত্তরাধিকার-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির কাছে এটা স্পষ্ট যে, তারা দর্শনশাস্ত্রে, এমনকি গ্রিক দর্শনের বিশ্লেষণে ও সংক্ষেপণে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করেছেন, যা থেকে তাদের মৌলিকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারও পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে তাদের কারও কারও মধ্যে ঘৃণ্য পক্ষপাত এবং যাবতীয় ইসলামি ও প্রাচ্যীয় দর্শন ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষভাব শেকড় বিস্তার করেছিল। তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। এই ঘরানার দার্শনিকদের মৌলিকত্ব ও প্রাতিস্বিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সম্ভবত দর্শন ও ধর্ম অথবা যুক্তি ও ওহির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তাদের যে প্রয়াস তার ফলাফলেই ঘটেছে। এসব প্রয়াসের আগে তারা এ ধরনের আরও কিছু প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। সেটা হলো সুফিতাত্ত্বিক আদর্শবাদী প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)—যেমনটা তারা বুঝেছেন—এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।[৬২৮]

দর্শনবিজ্ঞানে মুসলিমদের সেরা অবদান এই যে, তারা প্রাচীন গ্রিসের (ইউনানের) দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থাবলি ও রচনারাশির তথ্যসমূহকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সেগুলোতে যেসব ত্রুটি ছিল সেগুলোকে সংশোধন করেছেন। তারা সেসব গ্রন্থের কোনায়-কানায় থাকা জ্ঞানের ছিটেফোঁটা এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মুক্তাদানাকে সন্নিবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলোর সঙ্গে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। তা ছাড়া নতুন নতুন বিষয়, তথ্য ও তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এগুলো কেবল মুসলিম মনীষীদের উদ্ভাবন, তারা ছাড়া পূর্ববর্তীদের কেউ এগুলো জানত না।

---

৬২৮. হামিদ তাহির, *মাদখাল লি-দিরাসাতিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২১।

তাই ইসলামে দর্শন-চিন্তার নানা দিক ও বিভিন্ন শাখার সূচনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব), তাসাউফ (সুফিতত্ত্ব), অবিমিশ্র ইসলামি দর্শন ইত্যাদি।

এসব শাখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

১. ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব)

ইসলামি যুক্তিবাদের অন্যতম সূচনা হলো দর্শনবিজ্ঞানের এই শাখা। ইবনে খালদুন ইলমুল কালামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, এটা এমন জ্ঞান যা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলাদির দ্বারা ঈমানি আকিদা-বিশ্বাসের সুরক্ষা প্রদান করে এবং বিদআতি ও বিকৃতিকারীদের যুক্তি খণ্ডন করে।[৬২৯]

এই বিজ্ঞানশাখাটি অবিমিশ্রভাবে মুসলিমদের বলে বিবেচিত, সূচনাকালে তো বটেই। ধর্মত্যাগ ও ভ্রষ্টতা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখনই দ্বীনি আকিদা-বিশ্বাস এবং এগুলোর বিশ্লেষণ বা যৌক্তিক ব্যাখ্যার সুরক্ষার জন্য ইলমুল কালামের উদ্ভব ঘটে। ইলমুল কালামকে কেন্দ্র করেই বড় বড় দার্শনিক মতবাদের জন্ম হয়েছে। বিশ্বজগতের (বস্তুরাশির) ব্যাখ্যা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম উদ্ভাবনে মুসলিমদের উজ্জ্বল কীর্তিরও প্রকাশ ঘটে এ সময়। তারা অস্তিত্ব, জীবন ও কার্যকারণ ইত্যাদির তাৎপর্য নিরূপণ করেন, যা ছিল গ্রিক দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিকরা ইউরোপের আধুনিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন।[৬৩০]

মুতাকাল্লিমিন বা ধর্মতাত্ত্বিকরা তাদের কার্যক্রমে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে বেশ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এর ফলেই সম্ভবত কতিপয় প্রাচ্যবিদ ইলমুল কালামকে ইসলামি দর্শন-চিন্তার উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তারা এটিকে মুসলিমদের চিন্তার মৌলিকত্বের দলিল হিসেবেও দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসি প্রাচ্যবিদ আর্নেস্ট রেনান (Joseph Ernest Renan) বলেছেন, ইসলামে প্রকৃত দর্শন-আন্দোলন মুতাকাল্লিমদের মতবাদগুলোতেই খুঁজে দেখা উচিত।[৬৩১]

---

৬২৯. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫৮।

৬৩০. আলি সামি নাশশার, *নাশআতুল ফিকরিল ফালসাফি ফিল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৩১ এবং আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৪।

৬৩১. আবুল ওয়াফা তাফতাযানি, *দিরাসাত ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮।

২. তাসাউফ

তাসাউফকে ইসলামি দর্শন-চিন্তার অন্যতম ময়দান বলে বিবেচনা করা হয়। যদিও তাসাউফের মূল উপাদান হলো সুফিদের যাপিত আত্মিক অভিজ্ঞতা, তারপরও এই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটে চিন্তার এবং কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের। এ কারণে তাসাউফ কেবল অবিমিশ্র দর্শন নয় যে তা বৈপরীত্যমুক্ত ও পরিপূর্ণ অধিবিদ্যামূলক[৬৩২] তত্ত্বে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিতর্কমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ-আলোচনায় গুরুত্বারোপ করবে, বরং তা বিশেষ জীবনঘনিষ্ঠ দর্শন, যেখানে চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবেগ এবং চিত্তের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা, যা সত্যিকার অস্তিত্ব অনুভব করতে সাহায্য করে। এসব কারণে তাসাউফে বিভিন্ন মত, বিভিন্ন ঘরানা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে তিনটি মানবশক্তি তথা বুদ্ধি, অস্তিত্ব ও আচরণের পরিপূর্ণতার ফল বিবেচনা করা হয়।[৬৩৩]

আমরা এখানে একটি ইঙ্গিত দেওয়া সংগত মনে করি। তাসাউফ হলো যেকোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলিত অন্তর্বীক্ষণ, যে ব্যক্তি ধর্মীয় অভিজ্ঞতা যাপন করে তার অন্তরে এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাসাউফ একটি মানবতাবাদী প্রপঞ্চ, যার প্রকৃতিটি আত্মিক, সময়ের বা স্থানের সীমারেখা দিয়ে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তা ছাড়া তাসাউফ কোনো জাতি বা গোষ্ঠী বা মানবশ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট নয়।[৬৩৪]

৩. অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ দর্শন

যে-সকল মুসলিম দার্শনিক অভিভূত হয়ে গ্রিক দর্শনকে আলিঙ্গন করেছিলেন, গ্রিক দর্শনের পড়াশোনায় এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচনাবলি লিখেছিলেন তাদের

---

৬৩২. অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স (Metaphysics) হলো দর্শনের একটি শাখা। এতে বিশ্বের অস্তিত্ব, আমাদের অস্তিত্ব, সত্যের ধারণা, বস্তুর গুণাবলি, সময়, স্থান, সম্ভাবনা ইত্যাদির দার্শনিক আলোচনা করা হয়। এই চিন্তাধারার জনক অ্যারিস্টটল। মেটাফিজিক্স শব্দটি গ্রিক 'মেটা' (μετά) এবং 'ফিজিকা' (φυσικά) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অধিবিদ্যায় দুটি মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় : ১. সর্বশেষ পরিণাম কী? ২. কীসের মতো? অধিবিদ্যার দুটি মৌলিক শাখা হলো সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology) এবং তত্ত্ববিদ্যা (ontology)।-অনুবাদক

৬৩৩. আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ২৫।

৬৩৪. আবুল আলা আফিফি, *আত-তাসাউফ আস-সাওরাতুর রুহিয়্যা ফিল-ইসলাম*, পৃ. ৫৬।

দর্শনই বিশুদ্ধ দর্শন। যেমন আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে বাজাহ[৬৩৫], ইবনে তুফাইল[৬৩৬] প্রমুখ। মুসলিম দার্শনিকদের এই দলটি ছিল এক বিশাল মিনারের মতো, এর আলোয় আলোকিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা। নিচে এ সকল দার্শনিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হলো।

---

৬৩৫. ইবনে বাজাহ আন্দালুসি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বাজাহ (৪৮৭-৫৩৩ হি./১০৮৫-১১৩৯ খ্রি.)। ল্যাটিনকৃত 'আভেমপেস' বলেও পরিচিত। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের আন্দালুসের একজন পলিমেথ (বহুশাস্ত্রবিদ)। ইবনে বাজাহ জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সংগীত, যুক্তি, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কাব্য নিয়ে লিখেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'ইত্তিসালুল আকল'*। ইবনে বাজাহ বর্তমান স্পেনের অ্যারাগনের জারাগোজায় ১০৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৩৯ সালে মরক্কোর ফেজে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে বাজাজ কবি তুতিলির সঙ্গে কবিতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় ২০ বছর তিনি মরক্কোর মুরাবিত সুলতান ইউসুফ ইবনে তাশফিনের উজির হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি *কিতাবুন নাবাত* নামক উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। এতে উদ্ভিদের লিঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সেভিলের চিকিৎসক আবু জাফর ইবনে হারুন তুরজালি। তার দার্শনিক মতামত ইবনে রুশদ ও আলবার্টাস মেগনাসের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। অল্প বয়সে মৃত্যুর কারণে তার অধিকাংশ লেখা ও বই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। ওষুধ, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইসলামি দর্শনে আত্মা বিষয়ে তার অবদান কম নয়। তার সময়ে দর্শন ছাড়াও সংগীত ও কবিতার একজন প্রখ্যাত সমঝদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৫১ সালে তার দিওয়ান আবিষ্কৃত হয়। ইবনে বাজাহর অধিকাংশ কর্ম টিকে না থাকলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে তার তত্ত্ব মাইমোনিডস ও ইবনে রুশদের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এ সকল তত্ত্ব পরবর্তী সময়ে ইসলামি সভ্যতা ও গ্যালিলিও গ্যালিলিসহ ইউরোপের রেনেসাঁসকে প্রভাবিত করেছে।-অনুবাদক।

৬৩৬. ইবনে তুফাইল : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তুফাইল কাইসি আন্দালুসি (৪৯৪-৫৮১ হি./১১০০-১১৮৫ খ্রি.) ছিলেন একাধারে একজন চিকিৎসক, লেখক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, কবি, ধর্মতাত্ত্বিক, উজির ও দরবারের কর্মকর্তা। মুওয়াহহিদি খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফের দরবারে কাজ করেছেন। প্রথম দার্শনিক উপন্যাস *'হাই ইবনে ইয়াকযান'* রচনার জন্য তিনি অধিক সমাদৃত। পাশ্চাত্যজগতে এটি ফিলোসফিকাল অটোডিডাকটাস নামে পরিচিত। মরদেহ ব্যবচ্ছেদের সমর্থক প্রথমদিককার চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৬, পৃ. ২৪৯।

১. আল-কিন্দি

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দি আল-কুফি (১৮৫-২৫৬ হি./৮০৫-৮৭৩ খ্রি.)। অধিকাংশ বিশ্লেষক তাকে ইসলামি আরব দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচনা করেছেন। তাই তিনিই 'ফাইলাসুফুল আরব' (আরবের দার্শনিক) উপাধির সত্যিকার হকদার ছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি দুইশরও বেশি রচনা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দর্শন বিষয়ে তার মূল্যবান গ্রন্থ '*আল-ফালসাফাতুল উলা ফি-মা দুনাত তবিইয়্যাত ওয়াত-তাওহিদ*'।

আল-কিন্দি মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা-বিষয়ক জটিলতার দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রথম ইটটি স্থাপন করেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, প্রকৃত কর্ম ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ফসল নয়। তা ছাড়া মানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় একপ্রকার মানসিক শক্তি, আবেগ ও চিন্তাই এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। আল-কিন্দি ছিলেন কার্যকারণে বিশ্বাসীদের একজন। ঐশী প্রযত্ন (Divine Providence)[৬৩৭]-এর চিন্তাকে তিনি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন, কতিপয় প্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে ঐশী প্রযত্নের দাবির কাছেই সৃষ্টিজগৎ নতি স্বীকার করে।[৬৩৮]

আল-কিন্দি একইভাবে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভূগোল, রসায়ন, যন্ত্রপ্রকৌশল ও সংগীতবিদ্যায়ও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কতিপয় প্রাচ্যবিদ তাকে বারোজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অন্যতম মনে করেন, যাদেরকে মানব-চিন্তার চূড়া বিবেচনা করা হয়।[৬৩৯]

২. আল-ফারাবি

তিনি হলেন আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে তারহান আল-ফারাবি (২৫৯-৩৩৯ হি./৮৭২-৯৫০ খ্রি.)। তাকে সবচেয়ে বড় মাপের মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে বিবেচনা করা হয়। আল-ফারাবি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলির পঠনপাঠন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শিক্ষক

---

৬৩৭. মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর প্রযত্ন বা দেখভাল।-অনুবাদক।

৬৩৮. ইবরাহিম মাদকুর, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, খ. ২, পৃ. ১৪৪।

৬৩৯. কাদরি হাফিজ তাওকান, *তুরাসুল আরাবিল ইলমি*, পৃ. ২৭ এবং ফাওকিয়া মাহমুদ, *মাকালাত ফি আসালাতিল মুফাককিরিল মুসলিম*, পৃ. ৪৯।

হিসেবে পরিচিত, যেখানে প্রথম শিক্ষক অ্যারিস্টটল নিজে। তার হাতেই অ্যারিস্টটলীয় দর্শন চূড়ান্ত মার্গে পৌছে, অ্যারিস্টটলের দর্শন কোথাও এর চেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেনি। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি আলফারাবিয়াস (Alpharabius) নামে বিখ্যাত। আল-ফারাবি তার ব্যাখ্যা, চিন্তা ও শৈলীর কল্যাণে গ্রিক দর্শনকে ইসলামি চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-কিন্দির হাতে এই কীর্তি সাধন সম্ভব হয়নি।[৬৪০]

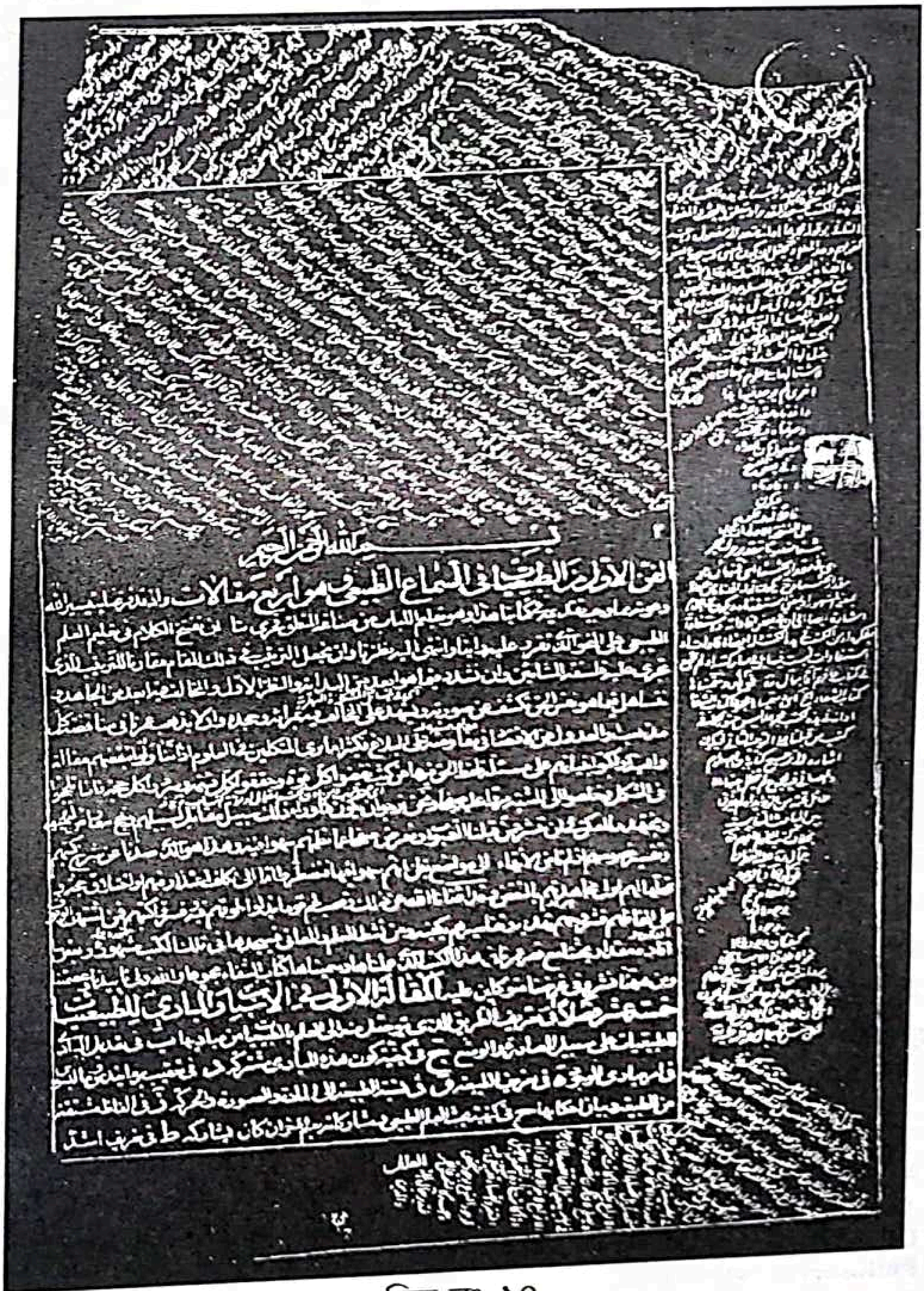
আল-ফারাবির সবচেয়ে বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *আরাউ আহলিল মাদিনাতিল ফাদিলাহ ওয়া মুদাদ্দাতুহা*। এই গ্রন্থে তিনি অভিজাত আদর্শ মানবসমাজের নীতি-ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও ইসলামি আরব সংস্কৃতির কিছু অনুষঙ্গ তার বিশেষ দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইলমুল কালাম, আকিদা, ফিকহ ও শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগেই আল-ফারাবির গ্রন্থাবলি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্যারিস থেকে ১৬৩৮ সালে মুদ্রিত হয়েছে। তাই ইউরোপের ওপর এসব গ্রন্থের বিরাট দার্শনিক প্রভাব রয়েছে।[৬৪১]

৩. ইবনে সিনা

তিনি হলেন আবু আলি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা (৩৭০-৪২৮ হি./৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)। ইবনে সিনা 'আশ-শাইখুর রয়িস' (প্রধান শাইখ) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অ্যারিস্টটল ও আল-ফারাবির পর তিনি 'তৃতীয় শিক্ষক' হিসেবে পরিচিত হন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে তার যতটা খ্যাতি, দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি তার চেয়ে কম নয়। আমেরিকান ঐতিহাসিক ও রসায়নবিদ জর্জ সার্টন ইবনে সিনাকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অন্যতম এবং পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের একজন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[৬৪০]. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৪।
[৬৪১]. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৮।



চিত্র নং-১৭
ইবনে সিনা রচিত 'আশ-শিফা'

দর্শন বিষয়ে ইবনে সিনার বহু রচনা রয়েছে। এসব রচনা তার হাতে দর্শন নির্মাণ ও দর্শনের বিকাশে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। তার কিছু দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ হলো '*আশ-শিফা*'। এই গ্রন্থে দর্শনবিদ্যার সমাবেশ ঘটেছে। এর পরে রয়েছে '*আন-নাজাত*'। যা *আশ-শিফার* সংক্ষিপ্ত রূপ। আরও রয়েছে '*আল-ইশারাত ওয়াত-তানবিহ*' এবং হিকমাহ বিষয়ে সাতটি পুস্তিকা এবং অন্যান্য বই।[৬৪২]

৪. ইবনে রুশদ

আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ কুরতুবি আন্দালুসি (৫৯৫ হি./১১৯৮ খ্রি.)। তিনি আন্দালুসে (মুসলিম স্পেনে) শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ছিলেন। তাকে অ্যারিস্টটলের দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারও বিবেচনা করা হয়। এমনকি তিনি 'আশ-শারিহ' (ব্যাখ্যাকার) নামে পরিচিতি পান। ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর শিক্ষারাশির মধ্যে বৈশিষ্ট্যসূচক পার্থক্য নিরূপণ করেন। তা ছাড়া তিনি সেগুলোর পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংশোধনও করেন। এমনকি তিনি অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মত ও সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, যেগুলো ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

পাশ্চাত্য ইবনে রুশদের দর্শনের পুরোটাই গ্রহণ করেছে। তার দর্শন মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন-চিন্তার সামনে তর্কবিতর্ক ও গবেষণার ফটক উন্মোচন করে দেয়। গবেষণার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক মত গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে 'রুশদিয়া মতবাদ' (Averroism)-এর উদ্ভব ঘটে। ইবনে রুশদের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : *ফাসলুল মাকাল ফি-মা বাইনাল হিকমাতি ওয়াশ-শারিআতি মিনাল ইত্তিসাল*[৬৪৩] এবং *মানাহিজিল আদিল্লাহ ফি আকায়িদিল মিল্লাহ*।[৬৪৪]

---

৬৪২. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৫।

৬৪৩. On the Harmony of Religions and Philosophy or The Decisive Treatise, Determining the Nature of the Connection between Religion and Philosophy.-অনুবাদক।

৬৪৪. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২২৭ এবং রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৮৮।

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ইসলামি দর্শন মানব-চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা হিসেবে পরিগণিত। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানব-চিন্তার উৎকর্ষ বলতে ইসলামি দর্শনকেই বোঝায়। পূর্ববর্তী দর্শন থেকে যা-কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তা তো হয়েছেই, তা সত্ত্বেও দর্শনের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এবং নতুন নতুন বিষয় সংযোজনে ইসলামি দর্শন-স্কুলের অবদান অনেক। ইসলামি দর্শন পরবর্তীকালের অন্যান্য দর্শনের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছে। ইসলামি দর্শনই খ্রিষ্টবাদী দর্শনকে প্রচণ্ড ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং আধুনিক যুগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে রসদ জুগিয়েছে।

বাস্তবিক দিক থেকেও ইসলামি দর্শনের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব। ইসলামি দর্শন ইউরোপে বেশ কিছু বিষয়কে ও সমস্যাকে জাগিয়ে দিয়েছে। যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইনস্টিটিউটে গুরুত্ব পেয়েছে। এসব সমস্যা ও বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচুর গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও পঠনপাঠন হয়েছে। বহু গ্রন্থ ও রচনায় এগুলোর প্রতিবিধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশেও এসব বিষয়ের ভিন্নতা প্রভাব ফেলেছিল। এসব বিষয় ও সমস্যার মধ্যে রয়েছে আত্মা ও আত্মার রহস্য, জ্ঞান-তত্ত্ব, পৃথিবীর প্রাচীনত্বের সমস্যা, পরিবর্তনপরম্পরা-তত্ত্ব, স্রষ্টার গুণাবলি, ঐশী প্রযত্ন-সমস্যা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, অস্তিত্ব ও উপাদান-সমস্যা, সম্ভব ও আবশ্যক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়।[৬৪৫]

---

৬৪৫ আবদুল মাকসুদ আবদুল গনি, *ফিল-ফালসাফাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৮৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইতিহাসবিজ্ঞান

কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং মানবসমাজের অস্তিত্বের সূচনালগ্নের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসবিদ্যার সূচনা ঘটেছে। যখন থেকে মানুষ চিহ্ন বা প্রতীক বা অন্যকিছুর দ্বারা তার জীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে শুরু করেছে তখন থেকেই ইতিহাসবিদ্যার ভিত রচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই মানুষকে জানার একটি নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সামাজিক প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তেই এই জ্ঞানপদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। সূচনাকাল থেকেই মানবগোষ্ঠীগুলোর ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্রয়োজন আবশ্যক হয়ে উঠেছে, সুতরাং আমাদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া সংগতই হবে যে, ইতিহাসের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। মানবসত্তা ও মানবসমাজকে জানার যে প্রয়োজন, ইতিহাসই তা পূরণ করে।[৬৪৬]

ইবনে খালদুন বলছেন, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠী ইতিহাসশাস্ত্রের চর্চা করেছে। ভ্রাম্যমাণ কাফেলা ও যাযাবররাও ইতিহাসের প্রতি ধাবিত হয়েছে। ইতিহাসবিদ্যার কাছে ধরনা দিয়েছে সচেতন গোষ্ঠী যেমন, তেমনই কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে উদাসীন গোষ্ঠীও। জ্ঞানী ও নির্বোধ উভয় শ্রেণিই ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে সমরেখায় অবস্থান করেছে। যেহেতু ইতিহাস বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পূর্ববর্তী যুগ সম্বন্ধে কেবল সংবাদই পরিবেশন করেছে। এতে বক্তব্যের বাড়াবাড়ি আছে, দৃষ্টান্তের ছড়াছড়ি আছে। বিভিন্ন জনসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রান্তিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব সংবাদ আমাদের জানায় যে যুগ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে পালটে যায় মানবমণ্ডলীর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্র, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও ছোট-বড় সব দিক উঠে এসেছে এসব সংবাদে। তারা এক সময় পৃথিবী আবাদ করেছিল, পরে তাদের চলে যাওয়ার ডাক আসে এবং পতনের সময় এসে উপস্থিত

---

৬৪৬. কাসিম আবদুহু কাসিম, *আর-রুয়াতুল হাযারিয়্যাহ লিত-তারিখ*, পৃ. ৯।

হয়। তার অভ্যন্তরীণ দিকে (ইতিহাসবিদ্যার অভ্যন্তরে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য) রয়েছে চিন্তাভাবনার অনেক বিষয়, মানবমণ্ডলী ও তাদের নীতি-আদর্শের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, ঘটনাবলির অবস্থা ও কার্যকারণ সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব। এ কারণেই জ্ঞানের ময়দানে ইতিহাসশাস্ত্রের রয়েছে মৌলিক ও দৃঢ়মূল অবস্থান এবং এটি জ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শাখা।[৬৪৭]

ইতিহাসবিদ্যার সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

ইতিহাস হলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, তাদের দেশ ও অঞ্চল, আচার-অভ্যাস-সংস্কৃতি, ব্যক্তিবর্গের কীর্তিকলাপ, তাদের বংশধারা, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো অতীতকালের নবী-রাসুল, বুযুর্গ-আওলিয়া, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, রাজাবাদশা ও অন্যদের অবস্থাবলি। ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য হলো অতীত কালের অবস্থাবলি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসবিদ্যার উপকারিতা হলো ওইসব ঘটনা ও অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, নসিহত হাসিল করা এবং যুগের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করা, যাতে অনুরূপ ক্ষতিকর ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং অনুরূপ কল্যাণকর ঘটনা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। এই বিদ্যায় যারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তাদের জন্য তা অন্য জীবন এবং এই বিদ্যার ভূমিতে যারা ভ্রমণ করবে তারা অনন্য উপকারিতায় সমৃদ্ধ হবে।[৬৪৮]

ইসলামি ইতিহাসবিদ্যা মৌলিকতা ও অনন্যতার ভূষণে ভূষিত। ইসলামি সমাজের অভ্যন্তর থেকেই এই সমাজের প্রয়োজন পূরণ ও উদ্দেশ্য সাধনে সাড়া দিয়ে এই বিদ্যার উদ্ভব ঘটেছে। ইসলামি ইতিহাস অন্যদের কাছে যা ছিল তার কোনো ছায়া নয় অথবা তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তাবলি থেকে সংগৃহীতও কিছু নয়। ইসলামি ইতিহাস মূলত ঐতিহাসিকদের ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এবং ধর্মীয় জ্ঞানরাশির

---

৬৪৭. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৩-৪।

৬৪৮. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

পরিপূরক। ইসলামি ইতিহাস হিজরি বর্ষপঞ্জিকেই যুগপরম্পরা নির্ধারণ ও ঘটনার বর্ণনায় ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।(৬৪৯)

আরবরা জাহিলি যুগে এবং ইসলামের শুরুর দিকে ইতিহাসকে তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করত। তারা ইতিহাসের ঘটনাবলি সংকলন বা লিপিবদ্ধকরণে কোনো প্রচেষ্টা ব্যয় করেনি। তা এ কারণে নয় যে তারা লিখতে জানত না, বরং তারা লেখার চেয়ে স্মৃতিতে সংরক্ষণকেই অধিক সমর্থন দিয়েছে। সেই সময়ে লেখার যোগ্যতা মানুষকে ততটা সামাজিক মর্যাদা এনে দিত না, যতটা মর্যাদা এনে দিত স্মৃতিতে সংরক্ষণের যোগ্যতা। তাই আরবদের প্রাথমিক ইতিহাস, অর্থাৎ ঘটনাবলি ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ তাদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত ছিল, যা তারা মুখে মুখে আওড়াত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরব মুসলিমরা তাদের পরিবেশ থেকে দূরে সরে গেল, যুদ্ধ ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে গেল, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশে গেল যারা তাদের (আরবি) ভাষায় কথা বলত না। তখন তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণের যোগ্যতা হ্রাস পেল এবং সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুসলিমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ, ঘটনাবলি ও অবস্থাবলি বর্ণনা ও সংরক্ষণের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলো। এটাই ছিল ইসলামি ইতিহাস সংকলনের সূচনা। তবে ইসলামি ইতিহাসের সংকলন-কর্মের বিস্তৃতি ঘটল তখনই যখন বিজিত অঞ্চলগুলোর মানুষ ইসলামের প্রতি ধাবিত হলো এবং আরবি ভাষা শিখতে উঠেপড়ে লাগল। তাদের পূর্ববর্তী সভ্যতা তাদেরকে ইতিহাসের স্বাদ আস্বাদনে সহায়তা করল। এসব কারণে ইসলামের প্রাথমিক ঐতিহাসিকরা ছিলেন অনারব আরবি ভাষাবিদ।(৬৫০)

এটা বলা যায় যে, ইসলামি ইতিহাসের পড়াশোনা ও লেখালেখি শুরুর দিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত এবং তার যুদ্ধবিগ্রহ ও যে-সকল সাহাবি এগুলোতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সংবাদ, প্রাথমিক মুসলিমদের হাবশায় হিজরতের তথ্যাবলি, তারপর

---

৬৪৯. ফ্রান্‌জ রোসানথাল (Franz Rosenthal), *A History of Muslim Historiography*, পৃ. ২৬৭; আরবি অনুবাদ, علم التاريخ عند المسلمين, অনুবাদক, সালেহ আহমাদ আলি, পৃ. ১৫৬-১৬২।

৬৫০. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২১১-২১২।

আহমাদ আমিন, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ১৫৬-১৬২।

মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরতের ঘটনা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের উদ্যোগের জন্য মক্কা ও মদিনা ছিল প্রধান কেন্দ্র। ঐতিহাসিকগণ মৌখিক বর্ণনার ওপর নির্ভর করতেন, যেমন মুহাদ্দিসগণ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি ইতিহাস সূচনালগ্নে সেই পথেই এগিয়েছে যে পথে এগিয়েছে ইলমুল হাদিস (হাদিসশাস্ত্র)। সংবাদ ও তথ্য পরিবেশকদের থেকে এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঐতিহাসিক সংবাদ ও তথ্য লিপিবদ্ধ করা হতো। এটি সনদ বা ইসনাদ নামে পরিচিত ছিল। এসব সংবাদ ও তথ্য ভাষ্য আকারে পরিবেশিত হলো এবং এর নাম হলো মতন। এই কারণে যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ-সংবলিত গ্রন্থাবলিকে (কুতুবুল মাগাযি ওয়াস-সিয়ার) সবচেয়ে প্রাচীন ও সূচনালগ্নের ইতিহাসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এসব গ্রন্থে হাদিস ও ইতিহাসের সমাবেশ ঘটেছিল। এসব গ্রন্থ সংকলনে গুরুত্ব প্রদানের কারণ ছিল এই যে, মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কাজের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন, যেহেতু তারা এগুলোর দ্বারা পথের দিশা পেতেন এবং এগুলোরই ওপর নির্ভর করতেন।

ফলে মুসলিমদের ইতিহাস সংকলনে দুটি পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে : ১. মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি। মদিনা মুনাওয়ারায় যাপিত নববি জীবনচরিতের ইতিহাস রচনায় এই পদ্ধতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে, এটি সনদ বা সূত্রের সঙ্গে সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। ২. এটি হলো ইতিহাসবিদদের পদ্ধতি। বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ, কবিতা ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ চিত্র প্রদান করা এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতির প্রকাশ ঘটে কুফায়। তারপর উভয় পদ্ধতির মধ্যে মিলনপ্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। একইভাবে ইতিহাসবিদ্যার অন্যান্য ঘরানার প্রকাশ ঘটে। এসব ঘরানার বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ, ইসলামি বিজয়, বংশপরম্পরার বর্ণনা ইত্যাকার কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করা।

ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন ছিলেন তারা হলেন : আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান[৬৫১], মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব যুহরি, ইবনে ইসহাক[৬৫২], আওয়ানা ইবনুল হাকাম কালবি[৬৫৩], সাইফ ইবনে উমর কুফি[৬৫৪], আল-মাদায়িনি[৬৫৫] প্রমুখ। আল-মাদায়িনি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদদের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতেন। কারণ, তিনি সনদ ও সূত্রের ওপর অন্যদের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তা ছাড়া তিনি তথ্য ও সংবাদ পরীক্ষানিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও শৃঙ্খলাবদ্ধকরণে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

মুসলিমদের নিকট ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ ধরণগুলো নিম্নরূপ :

ক. সিরাতে নববি ও নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহ-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

মুসলিমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ ও কার্যাবলির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ, তারা এগুলোর দ্বারা পথের দিশা পেতেন এবং ইসলামি বিধান প্রণয়নে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ও জীবনযাপনে এগুলোরই ওপর নির্ভর করতেন। এ ব্যাপারটিই

---

৬৫১. আবান ইবনে উসমান : আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান আল-উমাবি আল-কুরাশি (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.)। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির, ইতিহাসবিদ। সিরাতে নববি বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত বিষয়ে রচনা তিনিই প্রথম লেখেন। তিনি খলিফা উসমান রা.-এর পুত্র। তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ১, পৃ. ৮৪।

৬৫২. ইবনে ইসহাক : মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-মুত্তালিবি (মৃত্যু: ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.)। আরবের প্রাথমিক ইতিহাসবিদদের অন্যতম। মদিনার অধিবাসী ছিলেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো '*আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*'। গ্রন্থটির পরিমার্জন করেছেন ইবনে হিশাম। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

৬৫৩. আওয়ানা আল-কালবি : আবুল হাকাম আওয়ানা ইবনুল হাকাম ইবনে আওয়ানা ইবনে ইয়ায (মৃ. ১৪৭ হি./৭৬৪ খ্রি.)। বড় মাপের আলেম ও ইতিহাসবিদ, বাগ্মী ও বিশুদ্ধভাষী। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আত-তারিখ*', '*সিয়ারু মুআবিয়া ওয়া বানি উমাইয়া*'। তার অন্যান্য গ্রন্থও রয়েছে। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৭, পৃ. ২০১।

৬৫৪. সাইফ ইবনে উমর : সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদি আল-কুফি (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.)। প্রখ্যাত জীবনচরিতকার। বাগদাদে খ্যাতিমান ছিলেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আল-জামাল*', '*আল-ফুতুহুল কাবির*'। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৪, পৃ. ২৫৯।

৬৫৫. আল-মাদায়িনি : আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (১৩৫-২২৫ হি./৭৫২-৮৪০ খ্রি.)। বর্ণনাধর্মী ঐতিহাসিক। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বসরার অধিবাসী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : '*আখবারু কুরাইশ*'। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ৪০০-৪০২।

লেখকদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। কালিক অগ্রগামিতার বিবেচনায় জীবনচরিত বর্ণনাকারীদের ও তাদের গ্রন্থাবলিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম স্তর : এই স্তরে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন, ১. উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম। তিনি তাবিয়ি। ৯২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ২. আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান। তিনি বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের মণি-মুক্তা ধারণ করে আছে। ৩. শুরাহবিল ইবনে সাদ। দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরি। তাকে জীবনচরিত ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বিবেচনা করা হয়। তৃতীয় স্তর : এ স্তরের বিখ্যাতদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। আমরা যত সিরাতগ্রন্থ পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সিরাতগ্রন্থের রচয়িতা তিনি।

খ. তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি

ইসলামি ইতিহাসের সংস্কৃতি সূচনালগ্ন থেকেই তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলির সঙ্গে পরিচিত। হাদিস সংকলন ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলিই হলো তবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি। হাদিসের সনদ যাচাই-বাছাই, রাবিদের অবস্থাবলি নিরীক্ষণ ইত্যাদিও এসব গ্রন্থের বিষয়। এসব বিষয় থেকেই তবাকাত-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বক্তব্য বিশুদ্ধীকরণ ও গ্রহণযোগ্যতার অনুমোদনে কতিপয় মানদণ্ড নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হাদিস-বিশেষজ্ঞদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। রাবির চারিত্রিক দিক, তার সত্যবাদিতা ও তাকওয়াই ছিল সেসব মানদণ্ডের মৌলিক বিষয়। হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ রাবিগণের পারিবারিক অবস্থা, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার হাল-হাকিকত ও তাঁর সঙ্গে তাদের সাহচর্যের সময়সীমা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের সঙ্গে বা খুলাফায়ে রাশেদিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খতিয়ে দেখার বিষয়টিও মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। যাদের থেকে রাবিগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের সঙ্গে বাস্তবিক অর্থেই তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, নাকি সাক্ষাৎ সম্ভাব্য বিষয় ছিল, এ ব্যাপারেও তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। সনদে বর্ণিত প্রত্যেক

মনীষীর জন্মতারিখ ও মৃত্যুতারিখ জানতেও তারা বেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ফলে হাদিসের সনদ বা ইসনাদ ছিল জীবনচরিত রচনার অন্যতম কারণ। এসব জীবনচরিতের সনদে বর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকত। জীবনচরিত রচনায় হাদিসের মূল উৎস অর্থাৎ নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা জানার চেষ্টায় সনদে বর্ণিত ব্যক্তিদের ধারাবাহিক স্তরে বিন্যস্ত করা, সামসময়িকতার দিকটি বিবেচনায় আনা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সেই সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়াই ছিল সংগত কাজ। এসব বিষয়েই তবাকাত (স্তরবিন্যাস)-চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। সনদে বর্ণিত ব্যক্তিদের তথ্যাবলি বেশ কিছু রচনায় পরিবেশিত হয়েছিল।[৬৫৬]

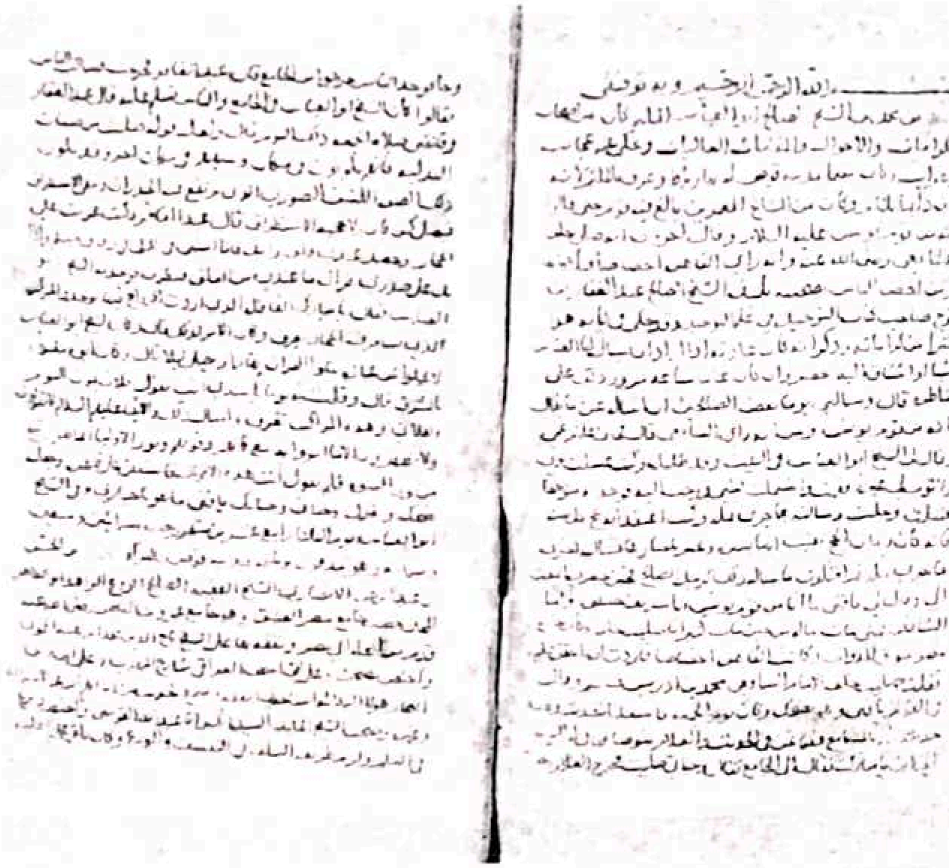
তাবাকাত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে তাবাকাতুল মুহাদ্দিসিন (মুহাদ্দিসগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল হুফফায (হাফিযে হাদিসগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল ফুকাহা (ফকিহগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ (শাফিয়ি মাযহাবপন্থী আলেমগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল হানাবিলাহ (হাম্বলি মাযহাবপন্থী আলেমগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল কুররা (কুরআনের কারিদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল মুফাসসিরিন (মুফাসসিরগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুস সুফিয়্যাহ (সুফিগণের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুশ শুআরা (কবিদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুন নাহবিয়্যিন (ব্যাকরণবিদদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি, তাবাকাতুল আতিব্বা (চিকিৎসকদের স্তরবিন্যাস)-সংবলিত গ্রন্থাবলি। তাবাকাত-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে : ১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ আল-যুহরি[৬৫৭] ২. *তাবাকাতুশ শুআরা*, মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-

---

৬৫৬. মুহাম্মাদ খায়ের মাহমুদ আল-বুকায়ি, *আত-তালিফ ফি তাবাকাতিল মালিকিয়্যা ফিত-তুরাসিল আরাবিয়্যা : দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়াসফিয়্যাতুন*, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৬৫৭. ইবনে সাদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ইবনে মানি আয-যুহরি (১৬৮-২৩০ হি./৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.)। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, হাফিযে হাদিস। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ '*আত-তাবাকাতুল কুবরা*'। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *তাহযিবুত তাহযিব*, খ. ৯, পৃ. ১৬১।

জুমাহি[৬৫৮] ৩. *তাবাকাতুল আতিব্বা*, আহমাদ ইবনে আবি উসাইবিআ (মৃ. ৬৬৮ হি.) এবং অন্যান্য গ্রন্থ।



চিত্র নং-১৮

সুবকি রচিত 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ'

---

৬৫৮. আল-জুমাহি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহি (১৫০-২৩২ হি./৭৬৭-৮৪৬ খ্রি.)। আরবি সাহিত্যের ইমাম। বসরার অধিবাসী। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'তাবাকাতু ফুহুলিশ শুআরা'*। দেখুন, ইয়াকুত হামাবি, *মুজামুল উদাবা*, পৃ. ২৫৪১।

গ. জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পরিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের বিশেষ শাখায় তাদের খ্যাতিই তাদের একত্র করেছে। বিশ্বকোষ আকারে তাদের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে। আলেম, জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যিক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, খলিফা ও অন্যান্য শ্রেণির মানুষ জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে স্থান পেয়েছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি নিম্নরূপ : ১. *মুজামুল উদাবা*, ইয়াকুত হামাবি (মৃ. ৬২৬ হি) ২. *উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা*, ইবনুল আসির ৩. *ওয়াফাতুল আ'য়ান*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১ হি)। জীবনচরিত বিষয়ে এটি অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ, এটির বিন্যাস উৎকৃষ্ট ও যথাযথ। ৪. *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, ইবনে শাকির কুতুবি[৬৫৯] ৫. *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, সালাহুদ্দিন খলিল সাফাদি[৬৬০]।

ঘ. বিজয়-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে ভূখণ্ড, দেশ ও শহর বিজয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : ১. *ফুতুহু মিস্‌র ওয়াল-মাগরিব ওয়াল-আন্দালুস*, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম (মৃ. ২৫৭ হি.) ২. *ফুতুহুল বুলদান*, আল-বালাযুরি[৬৬১] ৩. *ফুতুহুশ শাম*, আল-ওয়াকিদি[৬৬২]।

---

৬৫৯. ইবনে শাকির কুতুবি : সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে শাকির আদ-দিমাশকি (মৃ. ৭৬৪ হি./১৩৬৩ খ্রি.)। গবেষক ঐতিহাসিক, সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ। দামেশকেই জন্ম ও মৃত্যু। '*ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*' তার বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২০৩-২০৫।

৬৬০. সাফাদি : সালাহুদ্দিন খলিল ইবনে আইবেক ইবনে আবদুল্লাহ (৬৯৬-৭৬৪ হি./১২৯৬-১৩৬৩ খ্রি.)। সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনের সাফাদে জন্মগ্রহণ করেন। (বর্তমানে এটি ইসরাইলের একটি শহর।) তিনি সাফাদে, মিশরে ও আলেপ্পোয় দিওয়ানুল ইনশার প্রধান (খলিফা ও আমিরদের চিঠিপত্র বিভাগের সম্পাদক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর দামেশকে বাইতুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। দামেশকেই মৃত্যুবরণ করেন। '*আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২০০-২০৩।

৬৬১. আল-বালাযুরি : আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবির ইবনে দাউদ (জন্ম : ৮০৬ খ্রি., মৃ. ৮৯২ খ্রি./২৭৯ হি.)। ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, বংশধারাবিশেষজ্ঞ। বাগদাদের অধিবাসী।

ঙ. বংশধারা-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি

এসব গ্রন্থে আরবদের বংশধারা ও তাদের উৎপত্তি-সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। বংশবিদ্যায় আরবদের বিশেষ পারঙ্গমতা ছিল, যা অন্যকোনো জাতির মধ্যে ছিল না। কারণ ইসলামের পূর্বে গোত্রগত উপজাতীয়তা (tribalism) তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। যারা বংশবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন নিম্নরূপ : ১. মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল-কালবি, তার রচিত গ্রন্থ '*জামহারাতুন নাসাব*'। ২. মুসআব যুবাইরি[৬৬৩], তার রচিত গ্রন্থ '*নাসাবু কুরাইশ*'। ৩. ইবনে হাযম আল-আন্দালুসি, তার রচিত গ্রন্থ '*জামহারাতু আনসাবিল আরাব*'।

চ. অঞ্চল-ভিত্তিক ইতিহাস

এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার ইতিহাস সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ শ্রেণির গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি নিম্নরূপ : ১. *উলাতু মিসরা ওয়া কুযাতুহা*, আবু উমর আল-কিন্দি[৬৬৪] ২. *তারিখে বাগদাদ*, খতিব আল-বাগদাদি ৩. *তারিখে দিমাশক*, আলি ইবনে হাসান ইবনে আসাকির, গ্রন্থটি আশি খণ্ডে রচিত। ৪. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি ইখতিসারি আখবারি মুলুকিল আন্দালুস ওয়াকিল মাগরিব*, আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইযারি[৬৬৫] ৫. *আন-*

'*ফুতুহুল বুলদান*' তার বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৬, পৃ. ৩৬।

৬৬২. আল-ওয়াকিদি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে উমর ইবনে ওয়াকিদ আস-সাহমি (১৩০-২০৭ হি./৭৪৭-৮২৩ খ্রি.)। ইসলামি প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের অন্যতম। হাফিযে হাদিস। '*আল-মাগাযিন নাবাবিয়্যাহ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮-৩৫০।

৬৬৩. মুসআব যুবাইরি : আবু আবদুল্লাহ মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব (১৫৬-২৩৬ হি./৭৭৩-৮৫১ খ্রি.)। বংশবিদ্যায় প্রখ্যাত আলেম। ইতিহাসেও বিশেষজ্ঞ। হাদিসের নির্ভরযোগ্য রাবি। কবি। '*নাসাবু কুরাইশ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ৮৬-৮৭।

৬৬৪. আবু উমর আল-কিন্দি : আবু উমর মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (২৮৩-৩৫৫ হিজরির পর/৮৯৬-৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পর)। ঐতিহাসিক। মিশর, মিশরের অধিবাসী ও উপকূলীয় শহরের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জানতেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ '*আল-উলাত ওয়াল-কুযাত*'। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ১৪৮।

৬৬৫. ইবনে ইযারি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, অথবা আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মারাকেশি (মৃ. ৬৯৫ হি./১২৯৫ খ্রি.)। ঐতিহাসিক। আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত। মরক্কোর অধিবাসী। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৭, পৃ. ৯৫।

নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ, জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে তাগরি-বারদি আল-আতাবেকি[৬৬৬] (মৃত্যু : ৮৭৪ হি.)।

ছ. সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলি

ঐতিহাসিকদের গুরুত্বের জায়গাগুলো বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তারা যুদ্ধবিগ্রহ ও জীবনচরিতের পাশাপাশি ব্যাপকতর, সামগ্রিক ও বিপুলায়তনিক ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোকে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ (তাওয়ারিখে আম্মাহ) বলে। এসব গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলি বর্ষপঞ্জিভিত্তিক বা তারিখভিত্তিক সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ঐতিহাসিকরা এসব গ্রন্থে মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসলামপূর্ব আসমানি গ্রন্থসমূহের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে, জাহিলি যুগের ইতিহাস রয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, খুলাফায়ে রাশেদিন থেকে সর্বশেষ ইসলামি ইতিহাসও এগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : ১. মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, তার রচিত গ্রন্থ '*তারিখুর রুসুলি ওয়াল-মুলুক*', এটি '*তারিখুত তাবারি*' নামে প্রসিদ্ধ। ২. আল-মাসউদি, তার রচিত গ্রন্থ '*মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*', এটি বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থ। ৩. ইযযুদ্দিন ইবনুল আসির, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-কামিল ফিত-তারিখ*', এটি '*তারিখে ইবনে আসির*' নামে বিখ্যাত। গ্রন্থটি ইসলামি ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎস। ৪. ইবনে কাসির, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*'। ৫. ইবনে খালদুন বা আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, তার রচিত গ্রন্থ '*আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি আইয়ামিল আরাবি ওয়াল-আজমি ওয়াল-বারবার ওয়ামান*

৬৬৬. ইবনে তাগরি-বারদি : আবুল মাহাসিন জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে তাগরি-বারদি (৮১৩-৮৭৪ হি./১৪১০-১৪৭০ খ্রি.)। অনুসন্ধানী ইতিহাসবিদ। কায়রোর অধিবাসী, এখানেই জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ। '*আন-নুজুমুয যাহিরাহ ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ*', তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ১০০।

আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার, এটি *তারিখে ইবনে খালদুন* নামে বিখ্যাত।[৬৬৭]

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির আরও বহু বিভাগ ও প্রকার রয়েছে। ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থরচনার হাজারো পদ্ধতির মধ্যে ইতিহাসবিদরা ইচ্ছামতো কোনো একটি বেছে নিয়েছেন এবং সেই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম যাহাবি ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনার চল্লিশটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : সিরাতে নববি বা নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবিদের ইতিহাস, খলিফাদের ইতিহাস, রাজাবাদশাদের ইতিহাস, সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের ইতিহাস, উজির ও মন্ত্রীদের ইতিহাস, আমির ও গভর্নরদের ইতিহাস, ফকিহদের ইতিহাস, কারিদের ইতিহাস, হাফিযদের ইতিহাস, মুহাদ্দিসদের ইতিহাস, ইতিহাসবিদদের ইতিহাস, ব্যাকরণবিদদের ইতিহাস, সাহিত্যিকদের ইতিহাস, ভাষাবিদদের ইতিহাস, কবিদের ইতিহাস, যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখদের ইতিহাস, সুফিদের ইতিহাস, কাজি ও বিচারকদের ইতিহাস, প্রশাসকদের ইতিহাস, শিক্ষকদের ইতিহাস, ওয়ায়েজদের ইতিহাস, অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস, চিকিৎসকদের ইতিহাস, দার্শনিকদের ইতিহাস, কৃপণদের ইতিহাস।[৬৬৮]

ফ্রান্‌জ রোসানথাল বলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি ইতিহাসের গ্রন্থাবলির পরিমাণ বিপুল। বাইজান্টাইন বার্ষিক ঘটনাপঞ্জি ইসলামি বার্ষিক ঘটনাপঞ্জির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, তবে ইসলামি ইতিহাস তার নানাবিধ প্রকরণ ও বিপুল পরিমাণের কারণে ওইসব ঘটনাপঞ্জি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাস্তবিক ব্যাপার এই যে, প্রথমদিকের ইতিহাসে মনে হয় এমন কোনো স্থান নেই যেখানে অন্যদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি পরিমাণে ও আয়তনে মুসলিমদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির সমান হতে পারে। মুসলিমদের ইতিহাসের গ্রন্থাবলি সংখ্যায় গ্রিক ও লাতিন রচনাবলির সমান, কিন্তু তা অবশ্যই মধ্যযুগের ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রচনাবলি থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। কোনো

---

৬৬৭. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৯-১৮১; হিকমাত আবদুল কারিম ফারিহাত ও ইবরাহিম ইয়াসিন আল-খতিব, *মাদখাল ইলা তারিখিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১১১।

৬৬৮. ফ্রান্‌জ রোসানথাল (Franz Rosenthal), *A History of Muslim Historiography*, আরবি অনুবাদ علم التاريخ عند المسلمين, পৃ. ৫১৮-৫২২।

সন্দেহ নেই যে, ইসলামি সাহিত্য-আন্দোলনে এসব গ্রন্থের যে কালজয়ী ভূমিকা তা ধামাচাপা দেওয়ার কোনো উপায় নেই। যে-সকল পশ্চিমা পণ্ডিত আরবদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন তারা এসব ব্যাপার ভালোভাবেই জানেন। তবে তারা বিজ্ঞান, দর্শন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা তাদের সাধারণ মুসলিম সহযাত্রীদের মতোই, ঐতিহাসিক রচনাবলি সম্পর্কে কিছু জানেন বলে স্বীকার করার মতো নমনীয়তা দেখাননি।[(৬৬৯)]

৬৬৯. প্রাগুক্ত, ৩৬৯-৩৭০।

Asif
11.07.'21
1st Dhul Hijj
9:49 pm

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সাহিত্য

আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। কিছু কিছু সাহিত্যের সূচনালগ্ন শনাক্ত করা সম্ভব হলেও—যেমন লাতিন সাহিত্য, ফারসি সাহিত্য—আরবি সাহিত্যের সূচনালগ্ন শনাক্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে আরবদের যা-কিছু পৌঁছেছে তার মধ্যে সাহিত্য সবচেয়ে প্রাচীন। মুসলিমরা যদিও ইউনান (গ্রিস) থেকে নানা ধরনের জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা গ্রিক সাহিত্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রহণ করেননি। অথচ ইউনানি (গ্রিক) সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল। তা ছাড়া আরবি সাহিত্য ইউনানি (গ্রিক) সাহিত্য-চরিত্রের দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। যদিও মুসলিমরা গ্রিক সাহিত্যের কিছু গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যেমন অ্যারিস্টটলের কবিতা, দুই বিখ্যাত গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড[৬৭০] ও অডিসি[৬৭১]। বরং উলটো ঘটনা ঘটেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে আরবি সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে। যথাস্থানে আমরা তা দেখব। ইউরোপীয় সাহিত্য মূলত গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যেই একটি জাত। কোনো সন্দেহ

---

৬৭০. ইলিয়াড গ্রিক মহাকাব্য। প্রাচীন গ্রিসের ইলিওন শহরের নামানুসারে এই মহাকাব্যের নামকরণ করা হয়। মহাকবি হোমার এই মহাকাব্যের রচয়িতা। এটি গ্রিক ভাষায় রচিত ও ২৪টি সর্গে বিভক্ত। এর বিষয় ট্রয়ের যুদ্ধ। এতে ১৬,০০০ পঙ্‌ক্তি কবিতা আছে। যুদ্ধ সংঘটিত হয় হেলেন নামের এক নারীকে কেন্দ্র করে। যুদ্ধে গ্রিকদের সেরা বীর ছিলেন অ্যাকিলিস আর ট্রয়ের পক্ষে ছিলেন হেক্টর। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে তখন হেক্টর অ্যাকিলিস কর্তৃক নিহত হন এবং এর মধ্য দিয়ে মূলত ট্রয়বাসীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। যুদ্ধ শেষে গ্রিক সেনারা সুরক্ষিত ও সাজানো নগরী ট্রয় জ্বালিয়ে দেয়। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৭১. অডিসিও কবি হোমারের রচিত মহাকাব্য। এই কবিতায় ট্রয় নগরীর ধ্বংসের পরে ইথাকার রাজা অডিসিউসের আপন ভূমিতে ফিরে আসার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে তাকে পোহাতে হয়েছে নানা ঝড়ঝাপটা, সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে। নিজের সহযোদ্ধাদের হারিয়ে তাকে একাই ফিরতে হয়েছে ইথাকায়। হোমার সেই কাহিনিই তার অডিসি মহাকাব্যে তুলে ধরেছেন। আধুনিক গ্রহণযোগ্য সংস্করণে ইলিয়াডের ১৫,৬৯৩টি ছত্র রয়েছে। এটি আইওনিক গ্রিক ও অন্যান্য উপভাষার সংমিশ্রণে গঠিত হোমারীয় গ্রিক ভাষায় রচিত। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

নেই যে সাহিত্য জাতির আত্মা থেকে উৎসারিত হয়, তেমনই আরবি সাহিত্যও আরবি ও ইসলামি আত্মার অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়েছে।[৬৭২]

বিশেষজ্ঞগণ সাহিত্য বা সাহিত্যবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, আরবি ভাষার মৌখিক ও লেখ্য রূপে যাবতীয় ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় যে বিদ্যার দ্বারা তাই সাহিত্যবিদ্যা। এই বিদ্যার উদ্দেশ্য হলো পদ্যে ও গদ্যে উৎকর্ষসাধন, একইসঙ্গে বুদ্ধিকে শাণিত করা এবং চিত্তকে বিশুদ্ধ করা।[৬৭৩] ইবনে খালদুন বলেন, ভাষাভাষীদের কাছে সাহিত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য তার ফল বা পরিণতি। তা হলো আরবদের শৈলী ও রীতি-পদ্ধতি অনুসারে পদ্যে ও গদ্যে উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধন।[৬৭৪]

আরবি 'আদব' (সাহিত্য) শব্দটির মূল অজ্ঞাত, ইসলামি যুগে শব্দটির বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তাও জানা যায় না। তার কারণ এই যে, আরবরা বিজিত দেশগুলোর সঙ্গে—যাদের পূর্ববর্তী সাহিত্য বিদ্যমান ছিল—নিজেদের মিশ্রণ এবং এসব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটিয়ে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। ইসলামের শুরুর যুগে 'আদব' শব্দটি ধর্মীয় অর্থ বহন করত এবং সুন্নাহ বোঝাত। তারপর এটি যেকোনো কাজের রীতি ও পদ্ধতি বোঝাতে শুরু করল। তারপর সাধারণ সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকল। প্রত্যেক জ্ঞানশাখার একটি অংশকে গ্রহণ করাও বোঝাত 'আদব' শব্দটি। অবশেষে 'আদব' শব্দটি সাধারণ অর্থেই গদ্যে ও পদ্যে উৎকর্ষ সাধনের ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[৬৭৫]

পদ্য সাহিত্য : পদ্য মানে কবিতা। মানে ছন্দবদ্ধ ও প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যমিলযুক্ত কথা। আরবদের কাব্য সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন এবং এটি তাদের পরিচয়ের অন্যতম বড় দিক। জাহিলি যুগের ছন্দবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাও আমরা পেয়েছি। আরবরা পদ্য বা কবিতাকে বিভিন্ন রীতি ও প্রকারে শৃঙ্খলিত করেছে। পরবর্তীকালে চারটি নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে : ১. রাজায (এই রীতিতে রচিত কাব্যকে আরজুযাহ

---

৬৭২. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৭।
৬৭৩. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৪৪।
৬৭৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৫৩।
৬৭৫. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৮।

বলা হয়। আরজুযাহ শব্দের বহুবচন আরাজিয) ২. কারিয (এটি রাজাযের বিপরীত) ৩. মাকবুয এবং ৪. মাবসুত। জাহিলি যুগে আরবরা তাদের কবিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মেলা বা বাজার বসাত। এতে বড় বড় কবি অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদের কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। যে কবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন তার কবিতা কাবাঘরের খুঁটিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং কবিতাটির নাম দেওয়া হতো মুআল্লাকাহ (ঝুলন্ত কবিতা)।

আরবি কবিতার বিষয়বস্তু অজস্র। এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গৌরব, প্রশংসা, নিন্দা, শোক, গুণগান, প্রেম ও প্রণয়। এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক গৌরবগাথা রচনা, অর্থাৎ উপজাতীয় ও গোত্রগত কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা প্রকাশ করে কবিতা রচনা। জাহিলি যুগে বিভিন্ন গোত্রের কবিদের মধ্যে গৌরবগাথা রচনার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হতো। আরবি সাহিত্যের উৎসগুলোতে এ ধরনের গৌরবগাথার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এসব গৌরবগাথা মাঝে মাঝেই যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটাত। ইসলাম আসার পর এ ধরনের বিদ্বেষমূলক গৌরবগাথা রচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। জাহিলি যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের কয়েকজন হলেন : মুহালহিল[৬৭৬], ইমরুল কাইস[৬৭৭], নাবিগা যুবয়ানি[৬৭৮], যুহাইর ইবনে আবি সুলমা[৬৭৯], আনতারা ইবনে শাদ্দাদ[৬৮০], তারাফা ইবনুল

---

৬৭৬. নাজদের অধিবাসী এবং কবি ইমরুল কাইসের মামা। আসল নাম আদি ইবনে রবিআহ ইবনুল হারিস আত-তাগলিবি। ৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৭৭. ইমরুল কাইস হলেন ৬ষ্ঠ শতকের আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। তার পুরো নাম হল ইমরুল কাইস জুনদুহ ইবনে হুজর আল-কিন্দি। তার পিতার নাম হুজর ইবনুল হারিছ এবং মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে রাবিয়াহ আল-তাগলিবি। তিনি আরবের নাজদ এলাকায় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজকীয়ভাবে প্রাথমিক জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি বাল্যকালে কবিতা রচনা শুরু করলে তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারপর তিনি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে মদ্যপায়ী জীবন শুরু করেন। তার প্রেমিকার নাম ছিল উনাইযা। ইমরুল কাইস আরবি ভাষায় লেখা বিখ্যাত কাব্য সংকলন *মুআল্লাকার* অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ লেখক। এই মহান কবি ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৭৮. ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার একটি কবিতাকে ঝুলন্ত গীতিকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। তার আসল নাম যিয়াদ ইবনে মুআবিয়া ইবনে দাব্বাব। তার কবিতা শিল্পকুশলতা ও ছন্দমাধুর্যে উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা সাবলীল। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৭৯. শ্রেষ্ঠ কবিত্রয়ের অন্যতম। অন্য দুজন হলেন ইমরুল কাইস ও নাবিগা। জীবৎকাল : ৫২০-৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ। কবিদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তলাভের এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮০. আনতারা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে কাররাদ আল-আবসি (৫২৫-৬০৮ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত ইসলাম-পূর্ব আরব কবি। ঘোড়সওয়ার হিসেবেও খ্যাতি ছিল তার। কবিতার জন্য যেমন,

আবদ[৬৮১], আলকামা আল-ফাহল[৬৮২], আ'শা[৬৮৩] ও লাবিদ ইবনে রবিআহ। জাহিলি যুগে কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা কবিও ছিলেন, যেমন হিন্দ বিনতে আসাদ আদ-দাবাবিয়্যাহ ও খানসা।[৬৮৪]

ইসলাম আসার পর উপজাতীয়তা ও কৌলীন্য নিয়ে বড়াই ও গৌরবের প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, যা ছিল আরবি কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ গৌরবগাথা রচনার ফলে আরবদের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। ইসলাম কবিতার নতুন চরিত্র ও প্রকৃতি নির্দেশ করে এবং একটি ভারসাম্য পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিতার বিচার করে। মিথ্যাবাদী মুনাফিক কবিদের নিন্দা প্রকাশ করে এবং সত্যবাদীদের প্রশংসা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ○ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ○ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾

তেমনই দুঃসাহসিক জীবনের জন্য বিখ্যাত। তিনি কাবাঘরের দেওয়ালে ঝুলন্ত সপ্তগীতিকার অন্যতম কবি। আনতারার কবিতাগুলো ভিলহেল্ম অলওয়ার্ডট-এর লেখা '*দা ডিভান্স অব দা সিক্স এনশিয়েন্ট এরাবিক পোয়েটস*' (লন্ডন, ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তীকালে বৈরুত থেকে (১৮৮৮) আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। ৬০৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮১. তারাফা ইবন আবদ জাহিলি প্রথম সারির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বিখ্যাত ঝুলন্ত সপ্তগীতিকার কবিদের একজন। বাহরাইনের এক অভিজাত পরিবারে ৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। হিরার অধিপতি আমর ইবনে হিন্দ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গকবিতা রচনার অভিযোগে তারাফাকে হত্যার নির্দেশ দেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তারাফার জীবনাবসান ঘটে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮২. আলকামা ইবনে আবাদাহ ইবনে নাশিরাহ ইবনে কাইস। আলকামা আল-ফাহল নামে পরিচিত। ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জাহিলি যুগের প্রথম স্তরের কবি।

৬৮৩. মাইমুন ইবনে কাইস ইবনে জানদাল। আ'শা শব্দের অর্থ রাতকানা। তিনি রাতে কম দেখতেন বলে এই নামকরণ হয়েছে। জাহিলি যুগের প্রথম স্তরের কবি। জন্ম ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৮৪. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ১৯৮-২০০।

এবং কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। তুমি কি দেখো না তারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা এমন কথা বলে যা তারা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।[৬৮৫]

উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»

নিশ্চয় কিছু কিছু কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।[৬৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«إِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرآنِ فَابْتَغُوْهُ فِي الشِّعْرِ؛ فَإِنَّهُ دِيْوَانُ الْعَرَبِ»

তোমাদের কাছে কুরআনের কোনো শব্দ অস্পষ্ট মনে হলে কবিতায় তা খুঁজে দেখো। কারণ, তা আরবদের তথ্য-বিবরণী।[৬৮৭]

কবিরা ইসলামি দাওয়াতকে জোরালো রূপ দিয়েছেন। তারা মুক্তি ও বিজয়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে স্তবগীতি রচনা করেছেন। জিহাদে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর পথে শহিদ হতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। মুজাহিদ শহিদগণের জন্য শোকগাথা রচনা করেছেন। ইসলামের শুরুর যুগের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে কয়েকজন হলেন: কাব ইবনে যুহাইর রা. (মৃ. ২৬ হি./৬৪৫ খ্রি.), আবু যুআইব আল-হুযালি রা. (মৃ. ২৭ হি./৬৪৮ খ্রি.-এর দিকে) এবং হাসসান ইবনে

---

৬৮৫. সুরা শুআরা : আয়াত ২২৪-২২৭।

৬৮৬. *বুখারি*, কিতাব : আল-আদব, বাব : মা ইয়াজুযু মিনাশ-শি'রি ওয়ার-রাজযি ওয়া মা ইয়ুকরাহু মিনহু, হাদিস নং ৫৭৯৩; *আবু দাউদ*, হাদিস নং ৫০১০; *তিরমিযি*, হাদিস নং ২৮৪৪; *ইবনে মাজাহ*, ৩৭৫৫।

৬৮৭. *মুসতাদরাকে হাকেম*, কিতাবুত তাফসির, বাব : তাফসিরু সুরাতি নুন, হাদিস নং ৩৮৪৫।

সাবিত রা. (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রি.)। কাব ইবনে যুহাইর কাসিদায়ে বুরদা রচনা করেন।

উমাইয়া যুগে কবিতার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের বিস্তৃতি ঘটে। নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয় কবিতায়, যেগুলো ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। কারণ খলিফারা, প্রশাসক ও গভর্নররা একদিক থেকে কবিতাকে গুরুত্ব দিতেন, সামাজিক জীবনের রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটত অন্যদিক থেকে, আরেকদিকে ছিল নতুন নতুন রাজনৈতিক দল-উপদলের আত্মপ্রকাশ। এই যুগে কাব্য-সাহিত্য উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিত। তা ছাড়া সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে কবিতার প্রভাব ছিল ব্যাপক। উমাইয়া খলিফা ও আমিররা কবিতাকে তাদের প্রশংসার প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেছিলেন। কবিতার দ্বারা তারা তাদের কর্তৃত্বকে অটুট রাখতে এবং প্রতিপক্ষ নেতৃবৃন্দকে ঘায়েল করারও চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে শিয়া, খারেজি ও যুবাইরি আমিররা[৬৮৮] এই দিকে এগিয়ে ছিলেন। উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আশা রবিআহ আবদুল্লাহ ইবনে খারিজা (মৃ. ১০০ হি./৭১৮ খ্রি.), আদি ইবনুল রিকা আল-আমিলি (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.), তিনি খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সভাকবি ছিলেন। উমাইয়া যুগে ইরাকের শক্তিমান কবিদের মধ্যে যারা খলিফা ও আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আদরযত্ন পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জারির ইবনে আতিয়্যাহ (৩৩-১১০ হি./৬৫৩-৭২৮ খ্রি.), ফারাযদাক (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও আল-আখতাল আত-তাগলিবি (১৯-৯০ হি./৬৪০-৭০৮ খ্রি.)। উমাইয়াদের বিরোধী দলীয় কবিদের মধ্যে শিয়া কবিরা বিখ্যাত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি (মৃ. ৬৯ হি./৬৮৮ খ্রি.), আল-কুমাইত ইবনে যায়েদ (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৩ খ্রি.)। খারিজি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তিরিম্মাহ ইবনুল হাকিম (মৃ. ১০০ হি.)। আবদুল্লাহ ইবনুল যুবাইর-দলীয় (যুবাইরি) কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে কাইস আর-রুকাইয়াত (মৃ. ৮৫ হি.)। উমাইয়া যুগে গযল-রচয়িতা কবিদেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। গযল দুই ধরনের : ১.

---

[৬৮৮]. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর খিলাফতকালে (৬৪-৭৩ হি.) যারা আমির ও গভর্নর ছিলেন।

উযরি এবং ২. সারিহ। কবিরা এই দুই ধরনের গযলই রচনা করতেন। উযরি গযলের বৈশিষ্ট্য হলো বক্তব্যের সারল্য ও সততা এবং গাম্ভীর্য। এই শ্রেণির গযল-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন জামিল বাসিনা[৬৮৯] (মৃত্যু : ৮২ হি./৭০১ খ্রি.) এবং লাইলা আল-আখিলিয়্যাহ[৬৯০] (মৃ. ৭৫ হি./৭০৪ খ্রি.)। সারিহ গযল-রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন উমর ইবনে আবি রবিআহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪-৭১১ খ্রি.)।[৬৯১]

আব্বাসি যুগ কবিতায় এক গভীর বিপ্লব প্রত্যক্ষ করে—পরিমাণেও, প্রকরণেও। কবিতার বিষয়বস্তু, অর্থ, শৈলী, শব্দের প্রয়োগে ব্যাপক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হতে থাকে, যা পূর্বে দেখা যায়নি। অন্যান্য বিষয়ও কবিতায় যুক্ত হয়। রাজনৈতিক কবিতা দুর্বল হয়ে পড়ে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে বীরত্বপূর্ণ কবিতাগাথাও, উযরি গযলের গায়েও লাগে রুগ্‌ণতার বাতাস। অন্যদিকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে স্তবগীতি ও শোক-কবিতা, প্রজ্ঞামণ্ডিত কবিতার সয়লাব বয়ে যায়, তপস্যামূলক ও দুনিয়াবিমুখতায় চিহ্নিত কবিতার জোয়ার ওঠে। সুফিতাত্ত্বিক, দার্শনিক, শিক্ষামূলক, কাহিনিমূলক এমন নানা প্রকারের কবিতা পাখা মেলে ছড়িয়ে পড়ে। নবাগত কবিরা অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন অলংকার, যেমন শ্লেষালংকার ও বিরোধালংকার ইত্যাদি অপরিমিত ব্যবহার করেন। তারা শব্দের কারুকাজ ও অলংকরণে অধিক মনোযোগ দেন। ফলে কাব্য-আন্দোলন ও সাহিত্য-আন্দোলন উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে। এই আন্দোলনে সামাজিক উপাদানগুলোর সঙ্গে কার্যকরী অর্থেই অন্যান্য উপাদানের সংশ্লেষ ঘটে। অনুবাদের পথ ধরে আরবে আগমন করে অনারব সাহিত্য-সংস্কৃতি। একদিকে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও ধর্মাদর্শিক বিরোধ, অন্যদিকে তাদের সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরোধ সাহিত্য-আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে খলিফা ও শাসকরা কবিদের বেশ উৎসাহ দিতেন, উজ্জীবিত করতেন। আব্বাসি সাহিত্যের আকাশে

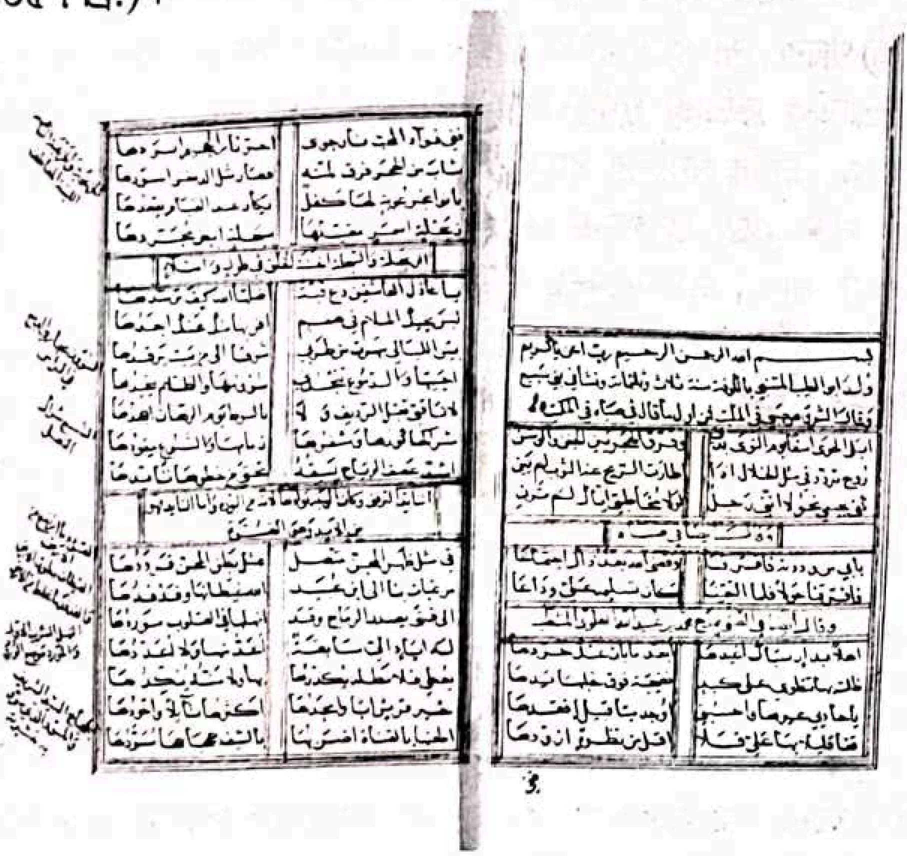
---

৬৮৯. জামিল ইবনে মা'মার, বা জামিল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'মার আল-উযরি আল-কুযায়ি।-অনুবাদক

৬৯০. লাইলা বিনতে আবদুল্লাহ আর-রিহাল ইবনে শাদ্দাদ ইবনে কা'ব আল-আখিলিয়্যাহ।

৬৯১. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

বড় বড় কবি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে : বাশশার ইবনে বার্‌দ (৯৬-১৬৮ হি./৭১৪-৭৮৪ খ্রি.), আবু নাওয়াস (১২৯-১৯৮ হি./৭৪৭-৮১৪ খ্রি.), আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আওস আত-তায়ি (মৃ. ২২৮ হি.), আল-বুহতুরি (২০৪-২৮৪ হি./৮১৯-৮৯৭ খ্রি.), ইবনে রুমি (২২১-২৮৩ হি./৮৩৫-৮৯৬ খ্রি.), আবুত তাইয়িব আল-মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি./৯১৫-৯৬৫ খ্রি.), আবু ফিরাস হামদানি (৩২০-৩৫৭ হি./৯৩২-৯৬৮ খ্রি.), আবুল আলা মাআররি (৩৬৩-৪৪৯ হি./৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.)।[৬৯২]



চিত্র নং-১৯
'দিওয়ানুল মুতানাব্বি'

আন্দালুসীয় কবিরা আন্দালুসে কাব্যের 'মুওয়াশশাহ' প্রকরণের উদ্ভাবন করেন এবং এটিকে বিকশিত করেন। কবিতার এই প্রকরণের বিভিন্ন শৈলীতে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আরবি কবিতার গঠন-উৎকর্ষে

---

৬৯২. রহিম কাযিম মুহাম্মাদ আল-হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আল-আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৪।

'মুওয়াশশাহ' প্রকরণটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ। এটি কবিকে কবিতার অন্ত্যমিল নিয়ে কারিকুরি করার স্বাধীনতা এনে দেয়। ছন্দ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার স্বাধীনতাও কবিরা পান। কাব্যের 'মুওয়াশশাহ' প্রকরণের প্রচার-প্রসারের ফলে উপজাতীয় জাযাল[৬৯৩] সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ইবনে খালদুন বলেন, আন্দালুসের ভূখণ্ডে কবিতাচর্চা বেড়ে গেল। কবিতার প্রকরণ, বিষয় ও প্রবণতা মার্জিত রূপ নিলো। শৈলীবদ্ধকরণ (স্টাইলাইজেশন) তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। ফলে আন্দালুসের পরবর্তী কবিরা কবিতার একটি প্রকরণ উদ্ভাবন করেন এবং এটির নাম দেন 'মুওয়াশশাহ'।[৬৯৪] আন্দালুসীয় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে যাইদুন (৩৯৪-৪৬৩ হি.) এবং সেভিলের শাসক মুতামিদ ইবনে আব্বাদ (৪৩১-৪৮৮ হি./১০৪০-১০৯৫ খ্রি.)।

গদ্য সাহিত্য : গদ্য মানে অন্ত্যমিলহীন কথা। সমৃদ্ধি ও উর্বরতার দিক থেকে এটি পদ্যের চেয়ে কম নয়। ইসলামের শুরুর যুগেই গদ্য সাহিত্যের সাবলীল ও সহজ সূচনা দেখা যায়। বাক্যগুলো ছোট ছোট এবং কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন : পত্র, ভাষণ-বক্তৃতা, হাদিস, উপমা, কাহিনি ইত্যাদি। সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গদ্য সাহিত্যেরও অগ্রগতি ঘটে। গদ্যের বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য আসে এবং প্রকরণেও দেখা যায় ভিন্নতা। তাই লিখন-শিল্পের প্রকাশ ঘটে এবং উমাইয়া যুগে তা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। প্রথম যুগের বড় লিখন-শিল্পীদের অন্যতম হলেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব (মৃ. ১৩২ হি.)। তিনি লিখনের শর্তাবলি তার বিখ্যাত পুস্তিকাগুলোতে সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং লিখন-শিল্পীদের সামনে তা তুলে ধরেছেন। এমনকি এ কথা প্রচলিত আছে যে, লিখন-শিল্প শুরু হয়েছে আবদুল হামিদের হাতে এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে ইবনুল আমিদের হাতে।

আব্বাসি যুগে গদ্য-শিল্প বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে যারা গদ্য-শিল্পে খ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জাহিয (১৫০-২৫৫

---

৬৯৩. জাযাল (زجل) : কথ্য উপভাষায় রচিত মৌখিক স্ট্রফিক কাব্যের একটি ঐতিহ্যবাহী রূপ। জাযালের সঠিক উৎস সম্পর্কে তেমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জাযালের প্রথম কবি হিসেবে আন্দালুসের আবু বকর ইবনে কুযমান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তার জীবৎকাল ১০৭৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ। (উইকিপিডিয়া)-অনুবাদক

৬৯৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৮৩।

হি./৭৬৭-৮৬৮ খ্রি.)। তিনি গদ্যের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং গদ্যের দিগন্ত বিস্তৃত করেন। গদ্যের ইমামে পরিণত হন তিনি। ইবনুল মুকাফফাও (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) গদ্য সাহিত্যে জাহিযের মতো অবদান রাখেন। হিজরি চতুর্থ শতকে গদ্য সাহিত্য তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এই সময় অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্য রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন আবু হাইয়ান আত-তাওহিদি (মৃ. ৪০০ হি.-এর দিকে) এবং ইবনুল আমিদ (মৃ. ৩৬৬ হি.) ও অন্যরা। এরপর গদ্যের উপর দিয়ে শাব্দিক কারুকাজ ও অলংকারের প্রবল তরঙ্গ বয়ে যায়। অর্থগত সূক্ষ্মতার চেয়ে শব্দের কারিকুরিতেই অপচয় ঘটে বেশি। পরবর্তী কয়েকজন লেখকের মাকামা-সাহিত্যে[৬৯৫] ও চিঠিপত্রে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিঠিপত্র হলো শৈল্পিক গদ্যের একটি প্রকার। চিঠিপত্র দুই ধরনের : ১. সরকারি বা সাধারণ চিঠি এবং ২. ব্যক্তিগত বা বিশেষ চিঠি। ইসলামের শুরুর যুগে ও উমাইয়া খিলাফতকালে প্রাতিষ্ঠানিক চিঠিপত্র ছিল সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, এগুলোতে লৌকিকতার কোনো স্পর্শ ছিল না। আব্বাসি যুগ থেকে সরকারি দপ্তরগুলোতে কাতেব বা মুন্সি নিয়োগ দেওয়া হয়, তারা চিঠিপত্রে ভাষার কারুকাজ ও শব্দের কারিকুরি দেখাতে শুরু করেন। চিঠিপত্রের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল হামিদ আল-কাতিব, ইবনুল আমিদ, সাহিব ইবনে আব্বাদ প্রমুখ। বিশেষ বা ব্যক্তিগত অথবা ভ্রাতৃত্বসুলভ চিঠি হলো, যা এক বন্ধু অপর বন্ধুকে লিখে থাকে। এ ধরনের চিঠির বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে ছিলেন আল-জাহিয ও ইবনে যাইদুন।

আরবি গদ্যের আরেকটি প্রকার হলো খুতবা বা বক্তৃতা। মুসলিমরা কবিতার পর বক্তৃতার ব্যাপারেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ বক্তৃতা মূলত বাগ্মিতাপূর্ণ কথা, যা সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধিতে ভাস্বর। জাহিলি যুগে ও ইসলামের শুরুর যুগে বক্তৃতার বড় ভূমিকা রয়েছে। আরবরা তাদের কিশোর-যুবাদেরকে তাদের শিশুকাল থেকেই বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিত। সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে বেশ কিছু অলংকারপূর্ণ বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। রাশেদি যুগের বিখ্যাত খতিব বা বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চতুর্থ খলিফা আলি ইবনে আবু তালিব। *'নাহজুল বালাগাহ'* গ্রন্থে তার

---

৬৯৫. আরবি গদ্য-সাহিত্যের একটি আঙ্গিক।

অলংকারসমৃদ্ধ বক্তৃতাসমূহ ও চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ বক্তৃতাই আলি রা.-এর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও বাস্তবে তিনি সেগুলোর বক্তা নন।

উমাইয়া যুগে বক্তৃতার জোয়ার বয়ে যায়। কয়েকজন আমির ও খলিফা, যেমন আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, যিয়াদ ইবনে আবিহি ছিলেন বিখ্যাত বক্তা। তারা জনমণ্ডলীর কাছে তাদের উদ্দেশ্য পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মেনে নিতে জনমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার জন্য বক্তৃতার ওপর নির্ভর করতেন। উমাইয়া যুগ আমাদের জন্য বিপুল সংখ্যক উৎকৃষ্ট বক্তৃতার উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছে, এসব বক্তৃতা বাক্যে যেমন অলংকারপূর্ণ তেমনই চিন্তায়ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

আব্বাসি যুগে বক্তৃতা-শিল্পে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বড় ধরনের অধঃপতন ঘটে। আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে বক্তা হিসেবে কেউই খ্যাতি বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেননি।

মুসলিমরা উপমা-সাহিত্যেও গুরুত্ব প্রদান করেন। তারা উপমা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলোকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। উপমা-সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি নিম্নরূপ : ১. *মাজমাউল আমসাল*, আবুল ফজল আল-মাইদানি[৬৯৬] ২. *আল-মুসতাকসা ফি আমসালিল আরাব*, আল-যামাখশারি[৬৯৭], এটি আরবি উপমাসমগ্র, যেখানে উপমাগুলোকে আরবি বর্ণমালাভিত্তিক সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

কাহিনি ও গল্প সাহিত্যে মুসলিমদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার অনেক বিশাল। মানুষ এখনো এগুলো পড়ে এবং এসব কাহিনির দিগন্তবিস্তৃত প্রেক্ষাপট, ভাবনার মাধুর্য ও ঘটনার অভিনবত্বে বিমুগ্ধ হতেন। সম্ভবত

---

৬৯৬. আল-মাইদানি : আবুল ফজল আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইবরাহিম (মৃ. ৫১৮ হি./১১২৪ খ্রি.)। সাহিত্যিক, গবেষক। নিসাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। খাইরুদ্দিন আয-যিরিকলি তার *'মাজমাউল আমসাল'* গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের গ্রন্থ ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ১, পৃ. ১৪৮; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২১৪।

৬৯৭. আয-যামাখশারি : জারুল্লাহ আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমর আল-খাওয়ারিজমি (৪৬৭-৫৩৮ হি./১০৭৫-১১৪৪ খ্রি.)। ধর্মীয় জ্ঞান, তাফসির, ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। তার রচিত গ্রন্থ অনেক। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কুরআনুল কারিমের তাফসির *'আল-কাশশাফ'*। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৫, পৃ. ১৬৮-১৭১।

এসব কাহিনির মধ্যে আব্‌স গোত্রের কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়সওয়ার আনতার বা আনতারার কাহিনি[৬৯৮], ইয়ামেনের বিখ্যাত বীর সাইফ ইবনে যি-ইয়াযানের কাহিনি[৬৯৯], মাগরিবের (মরক্কোর) বীরপুরুষ আবু যায়দ আল-হিলালির কাহিনি এবং মিশরের সুলতান জাহির বাইবার্সের কাহিনি, এ ছাড়াও মোগল-বিরোধী যুদ্ধ ও ক্রুসেড যুদ্ধের বীর সেনানীদের বীরত্বগাথা সবচেয়ে বিখ্যাত।

হিজরি চতুর্থ শতকে আরবি সাহিত্যে ছোট গল্পের ভিত প্রস্তুত করা হয়, এগুলোকে বলা হয় মাকামাত। বিখ্যাত মাকামাত-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদিউযযামান আল-হামাদানি (৩৫৮-৩৯৮ হি./৯৬৯-১০০৭ খ্রি.)। তিনি চারশ মাকামাত রচনা করেছেন। এই চারশ মাকামাত রচনা করা হয়েছে দুজন বীরপুরুষকে নিয়ে, তাদের একজন হলেন ঈসা ইবনে হিশাম এবং দ্বিতীয়জন হলেন আবুল ফাত্‌হ আল-ইস্কান্দারি। আরও আছেন ইবনে নাকিয়া আল-বাগদাদি (৪১০-৪৮৫ হি./১০২০-১০৯২ খ্রি.)। তিনি আল-হামদানির পদ্ধতি অনুসরণ করে গদ্য রচনা করেন। আরও আছেন আল-হারিরি[৭০০] (৪৪৬-৫১৬ হি./১০৫৪-১১২২ খ্রি.)। তিনি তার মাকামাতে আবু যায়দ আস-সারুজি এবং হারিস ইবনে হাম্মাম নামের দুজন ব্যক্তির সাহসিকতার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এ দুজন ব্যক্তিই অত্যন্ত মেধাবী।[৭০১]

সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে ইবনে খালদুন বলেছেন, আরবি (ভাষা ও) সাহিত্যের ভিত্তি হলো চারটি দিওয়ান (সংকলনগ্রন্থ) : ১. *আদাবুল কাতিব*, ইবনে কুতাইবা দিনাওরি[৭০২] ২. *আল-কামিল* (*ফিল-*

---

৬৯৮. কবি আনতারা ইবনে শাদ্দাদ ও তার প্রেমাস্পদ আবলার কাহিনি।-অনুবাদক।

৬৯৯. ইয়ামেনের প্রাচীন হিময়ারি বাদশাহ সাইফ ইবনে যি-ইয়াযান বা মাদিকারিব ইবনে আবু মুররাহ (৫১৬-৫৭৬ খ্রি.)-এর কাহিনি। তিনি ইয়ামেন থেকে হাবশিদের বিতাড়িত করেছিলেন।-অনুবাদক।

৭০০. আবু মুহাম্মাদ আল-কাসিম ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-হারিরি আল-বসরি আল-হারামি।-অনুবাদক

৭০১. ড. আবদুল মুনয়িম মাজিদ, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা*, পৃ. ২০৬-২১০; রহিম কাযিম মুহাম্মাদ হাশিমি ও আওয়াতিফ মুহাম্মাদ আরাবি, *আল-হাদারাতুল আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ১৭৫-১৭৭।

৭০২. ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি : আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওরি (২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খ্রি.)। মুফাসসির, ফকিহ, সাহিত্যবিশারদ, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ। হিজরি তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। কুফায় জন্মগ্রহণ

লুগাহ ওয়াল-আদাব), আল-মুবাররাদ[৭০৩] ৩. *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন*, আল-জাহিয[৭০৪] ৪. *আন-নাওয়াদির*, আবু আলি আল-কালি[৭০৫]।[৭০৬] আরবি সাহিত্যের আরও কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, এখানে সেগুলোর নাম না নিলেই নয় : *আল-ইক্দুল ফারিদ*, ইবনে আব্দ রাব্বিহি (মৃ. ৩২৮ হি.); *আল-আগানি*, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানি (মৃ. ৩৫৬ হি.); *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মুজালিস*, ইবনে আবদুল বার্র ইত্যাদি।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ চাহে তো বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের ওপর ইসলামি আরবি সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে জানব।

করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৬।

৭০৩. আল-মুবাররাদ : মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল আকবার ইবনে উমাইর ইবনে হাসসান (২১০-২৮৬ হি./৮২৬-৮৯৯ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। মৃত্যুবরণ করেন বাগদাদে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'আল-কামিল ফিল-লুগাহ ওয়াল-আদাব'*, *'আল-ফাদিল'*, *'আল-মুকতাদাব'*, *'শারহু লামিয়াতিল আরাব'*। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৩, পৃ. ৫৭৬।

৭০৪. আল-জাহিয : আবু উসমান আমর ইবনে বাহর আল-কিনানি (১৬৩-২৫৫ হি./৭৮০-৮৬৯ খ্রি.)। আরবি সাহিত্যের বড় ইমাম এবং মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জাহিযিয়্যাহ গোত্রের প্রধান। বসরায় জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন। তার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। যেমন : *'আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন'*, *'কিতাবুল হায়াওয়ান'*, *'আল-বুখালা'*, *'আল-মাহাসিন ওয়াল-আযদাদ'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহব*, খ. ২, পৃ. ১২১-১২২।

৭০৫. আবু আলি আল-কালি : ইসমাইল ইবনুল কাসিম ইবনে ইযুন (২৮৮-৩৫৬ হি./৯০১-৯২৭ খ্রি.)। ভাষা, কবিতা ও সাহিত্যের বিষয়াবলি তিনি সবচেয়ে বেশি মুখস্থ রেখেছিলেন। ফুরাত নদীর পূর্ব তীরে মানযিকারদ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্ডোভায় মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'কিতাবুল আমালি'*, *'আল-বারিউ ফিল-লুগাহ'*, *'আল-আমসাল'* ইত্যাদি। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ১৪২।

৭০৬. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৫৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন

মানববিদ্যা ও চিন্তাভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অগ্রগামী। তারা উচ্চতর জ্ঞানের (জ্ঞানশাখার) উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন, যেখানে মানবিক-সামাজিক দিক গুরুত্ব পেয়েছে। একইভাবে তারা ইসলামি শরিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উদ্ভাবন করেছেন। আরবি ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ : সমাজবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

প্রথম অনুচ্ছেদ

সমাজবিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষাকোষ সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, মানবসমাজের সমকালীন বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক পাঠ, কালে কালে ও স্থানে স্থানে তা যেমন রূপ লাভ করে তেমনই, যাতে বিকাশ ও উৎকর্ষের সেসব রীতিনীতি জানা যায়, মানবসমাজ তার অগ্রগামিতা ও রূপান্তরশীলতায় যেগুলোর অধীন।[৭০৭]

সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞানমণ্ডলকে বা জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সামাজিক ঘটনাবলির সঙ্গে সীমাবদ্ধ করেছেন। মানুষের একতাবদ্ধতা ও সমবেত আচরণ, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদানমূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং যৌথ সংস্কৃতি উদ্‌যাপনের ফলে এসব অনুষঙ্গ সামনে আসে। মানুষ তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও শৈলীর ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে। একইভাবে তারা নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধও লালন করে। আর্থিক লেনদেন, কর্তৃত্ব ও শাসন, নীতি-নৈতিকতা ও অন্যান্য বিষয়েও তারা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে।

সমাজের বাহ্যিক ব্যাপারগুলো দুজন বা একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। এসব সম্পর্ক যখন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তখন তা মানুষের মধ্যে সামাজিক যূথবদ্ধতা তৈরি করে এবং সামাজিক দল গঠন করে। এই সামাজিক দলসমূহই সমাজবিজ্ঞানের পঠনপাঠনের মৌলিক বিয়ষবস্তু।

আরেকটি বিষয় আছে যা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য। সামাজিক কার্যকলাপে সে বিষয়টি বাস্তবিক রূপ লাভ করে। যেমন দ্বন্দ্ব-কলহ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, মতৈক্য, স্তরভিত্তিক সন্নিবেশ, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি। একইভাবে সমাজবিজ্ঞানে পঠনপাঠনের একটি বড় ময়দান হলো

---

৭০৭. আহমাদ যাকি বাদাবি, *মুজামুল মুসতালাহাতিল ইজতিমাইয়্যা*, পৃ. ৫।

সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সমাজ-গঠনে পরিবর্তন। সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাও রয়েছে বিভিন্ন রকমের, এগুলো মূলত সামাজিক আচার-আচরণের মার্জিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আচরণও তাই, ব্যক্তিই হলো সংস্কৃতি গঠনের শ্রমিক, সে সংস্কৃতিকে যেমন গঠন করে তেমনই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নিজেও গঠিত হয়।[৭০৮]

সমাজচিন্তা স্বয়ং মানবজাতির মতো প্রাচীন হলেও মানবসমাজ কোনো জ্ঞানশাখার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে এই তো সেদিন! প্রথম যিনি এই জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন তিনি হলেন মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন!

তিনি কয়েকটি বাক্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে তিনি একটি নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন, যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীরা কোনো কথা বলেননি। তিনি বলেন, যেন এটি স্বতন্ত্র জ্ঞান, এর বিষয়বস্তুও স্বতন্ত্র। তা হলো মানবসভ্যতা ও মানবসমাজ। এখানে কিছু সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানও করা হয়, সেগুলো হলো উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থা। একের পর এক এ ধরনের সমস্যা বা প্রশ্ন আসতেই থাকে। এটাই প্রত্যেক জ্ঞানশাখার বৈশিষ্ট্য, চাই তা মানবরচিত হোক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক হোক।[৭০৯]

ইবনে খালদুন আরও বলেছেন, জেনে রাখো, এই বিষয়ে কথা বলা একটি নতুন শিল্প, একটি অভিনব প্রবণতা। গবেষণাই এর পথ দেখিয়ে দেবে, নিমগ্নতাই এ পথে পরিচালিত করবে। যেন এই জ্ঞানের শৈশব মাত্র উদ্ঘাটিত হলো। আমার প্রাণের শপথ! মনুষ্যজগতের কেউ এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন বলে আমি জানি না। আমার জানা নেই, এটা (তাদের কথা না বলা) তাদের উদাসীনতার ফল এবং তারা কোনো ধারণাই রাখে না এ ব্যাপারে নাকি সম্ভবত তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণই লিখেছেন, কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি।[৭১০]

ইবনে খালদুন তার প্রচেষ্টা ব্যয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং এ ব্যাপারে যে খামতি রয়েছে তা পূরণ করার জন্য শক্তিমানদের আহ্বান

---

৭০৮. মানসুর যাবিদ আল-মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*, পৃ. ২৮-২৯।

৭০৯. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৩৮।

৭১০. প্রাগুক্ত।

জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের পরে এমন অনেকেই আসবে আল্লাহ যাদেরকে বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি দেবে এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করবে, তারা হয়তো এই জ্ঞানের (সমাজবিজ্ঞানের) সমস্যাবলি নিয়ে আমরা যা লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি লিখবে। কোনো শাস্ত্রের উদ্গাতার দায়িত্ব শুধু এতটুকু নয় যে, তিনি ওই শাস্ত্রের সমস্যাবলি নিরূপণ করবেন; বরং ওই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, তার বিভাগগুলো চিহ্নিত করা এবং সে ব্যাপারে যত বক্তব্য রয়েছে সেগুলোর প্রকারভেদ তৈরি করাও তার দায়িত্ব। তার পরবর্তী লোকেরা নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করবে এবং শাস্ত্রটিকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেবে।[৭১১]

ইবনে খালদুন অবশ্য এর চেয়েও বেশি কিছু করেছেন। তার মুকাদ্দিমায় সামসময়িক সমাজবিদ্যার কমপক্ষে সাতটি শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইবনে খালদুন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।[৭১২]

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও, এমনকি বিখ্যাত অস্ট্রীয় (পোলিশ) সমাজবিজ্ঞানী লুডভিগ গম্পলোইকস মন্তব্য করেছেন যে, আমরা প্রমাণ উপস্থিত করতে চাই, অগাস্ট কোঁৎ[৭১৩]-এরও পূর্বে, বরং ইতালীয় রাজনৈতিক-দার্শনিক গিয়ামবাতিস্তা ভিকোরও পূর্বে, যাকে ইতালীয়রা প্রথম ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে, একজন খোদাভীরু মুসলিমের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি পরিমিত বিচারবিবেচনার সঙ্গে

---

৭১১. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, খ. ১, পৃ. ৫৮৮।

৭১২. হাসান আস-সাআতি, *ইলমুল ইজতিমা আল-খালদুনি*, পৃ. ২৮-৩৫।

৭১৩. অগাস্ট কোঁৎ (Auguste Comte): ফরাসি চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে শহরের এক ক্যাথলিক খ্রিষ্টান পরিবারে ১৭৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি তার জন্ম। ১৮১৪ সালে প্যারিসের একোল পলিতেক্নিক-এ তার শিক্ষাজীবন শুরু। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্বদানের জন্য অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮১৬ সালে বহিষ্কৃত হন। ১৮১৭ সালে ফ্রান্সের সমাজবাদী নেতা স্যাঁসিমঁ-র একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। কিন্তু তার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ১৮২৪ সালে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আধুনিক সমাজভাবনামূলক বক্তৃতাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের ওপর প্রথম বক্তৃতা দেন। এই সম্পর্কে তার প্রথম গ্রন্থ '*কুর দা ফিলসফি পজিতিভ*' (*দা কোর্স ইন পজিটিভ ফিলোসফি*, ১৮৩০-৪২) ছয় খণ্ডে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ '*সিস্ত্যাম দা পলিতিক পজিতিভ*' (*সিস্টেম অব পজিটিভ পলিটি*, ১৮৫১-৫৪) চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কোঁৎ-এর মতে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয়, মনুষ্যত্ব। মানবপ্রেমের ওপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। চরম অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি গবেষণার কাজ চালান। ১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

সামাজিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে গভীর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে যা লিখেছিলেন সেটাকেই আমরা আজ সমাজবিজ্ঞান নামে আখ্যায়িত করি।[৭১৪] তা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসি অগাস্ট কোঁৎকে এই বিজ্ঞানের আদি প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার ব্যাপারে অজ্ঞতা জাহির করা হয়েছে, যিনি এই বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন বলে স্পষ্ট ভাষায় ও সচেতনভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৭১৫]

অথচ লেখক-গবেষকেরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, অগাস্ট কোঁৎ অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব ইবনে খালদুনের *মুকাদ্দিমা* থেকে গ্রহণ করেছেন![৭১৬]

ইবনে খালদুন মানবেতিহাস রচনা এবং তৎকর্তৃক সমাজবিজ্ঞানের ভিত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রূপান্তরের বা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে বিশ্বমানবচিন্তা আন্দোলিত হয়েছে। কারণ, তিনি নতুন নকশা প্রণয়ন করেছেন এবং নতুন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। বরং নতুন নীতি ও আইন নির্দেশ করেছেন, যেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব এবং প্রত্যেক মানবসমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার সিদ্ধান্ত ও নীতিমালার মূলে এই বিষয়গুলো : মানুষকে অবশ্যই সমাজে বসবাস করতে হয়, সমাজের সঙ্গে বসবাস না করে তার উপায় নেই, সমাজে বসবাস করলে অবশ্যই কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করতে হয় এবং কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে বসবাস করলে অবশ্যই তাকে পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডের ওপর বসবাস করতে হয়। আর যেহেতু এ সকল মানুষ অথবা গোত্রবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কিংবা এসব মানবসংঘের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই তাদের শৃঙ্খলিত রাখার জন্য শাসক প্রয়োজন। শাসকের বিভিন্ন স্তর বা প্রকারভেদ রয়েছে। গোত্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক। মানবসংঘের বা মানবসমাজ যতগুলো উপায় ও উপাদান প্রস্তুত করে রেখেছে, সংশ্লিষ্ট শাসক তার প্রত্যেকটি কাজে লাগাতে পেরেছেন

---

৭১৪. ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ১৯৮ থেকে উদ্ধৃত।

৭১৫. মানসুর যাবিদ আল-মাতিরি, *আস-সিয়াগাতুল ইসলামিয়্যা লি-ইলমিল ইজতিমা : আদ-দাওয়ায়ি ওয়াল-ইমকান*, পৃ. ২৩-২৪।

৭১৬. আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফি, *দিরাসাহ মুকাদ্দিমাহ ইবনে খালদুন*; আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান, *মাআলিমুল হাদারাতি ফিল ইসলাম ওয়া আসারুহা ফিন নাহদাতিল উরুব্বিয়া*, পৃ. ৪৮ থেকে উদ্ধৃত।

এবং এগুলো কাজে লাগিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক হয়ে উঠেছেন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসক হওয়ার পর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। শাসক যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ওপর ইবনে খালদুন তার চিন্তা ও তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন, সে রাষ্ট্র বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে এবং এসব স্তর বাস্তবিক জীবনে যথার্থরূপে প্রয়োগকৃত বলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে।[৭১৭]

এখানে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে খালদুনের জীবনচরিতের ওপর কিছুটা আলোকপাত করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তার প্রকৃত নাম আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে খালিদ (খালদুন) আল-হাদরামি। তিনি ৭৩২ হিজরির পহেলা রমযান তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ফেজ (ফাস), গ্রানাডা, তিলমসান (টেলমসেন)[৭১৮], আন্দালুস প্রভৃতি শহর ও দেশ ভ্রমণ করেন। মিশরও ভ্রমণ করেন। মিশরের সুলতান আয-যহির সাইফুদ্দিন বারকুক তাকে সম্মানিত করেন। এখানে ইবনে খালদুন মালিকি আদালতের[৭১৯] বিচারকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিশরে তিনি সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় (৭৮৪-৮০৮ হি.) অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং স্থানীয় গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে ইবনে খালদুনের বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।[৭২০]

ইবনে খালদুন একটি সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। খুব ছোটবেলাতেই তিনি কুরআন মাজিদ হিফয করেছেন। তার পিতাই ছিলেন তার প্রথম শিক্ষক। তা ছাড়া তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাদের দেশে যে মহামারি হয়েছিল সেই মহামারিতে তার অধিকাংশ শিক্ষকই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর ইবনে খালদুন সরকারি কাজে যুক্ত হন। বনি মারিনের (Marinid Sultanate) রাজদরবারে লেখকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই চাকরি তাকে আত্মতৃপ্তি দিতে পারেনি। মাগরিবে আকসা বা মরক্কোর সম্রাট আবু ইনান ফেজ শহরে তার বিদ্বান-পরিষদে ইবনে খালদুনকে

---

৭১৭. সুহাইলাহ বিনতে যাইনুল আবিদিন, নাযরিয়্যাতুদ-দাওলাহ ইনদা ইবনে খালদুন, *মাজাল্লাতুল মানার*, সংখ্যা ৭৫, ৭৬, ৭৭, বর্ষ ১৪২৪ হি.।

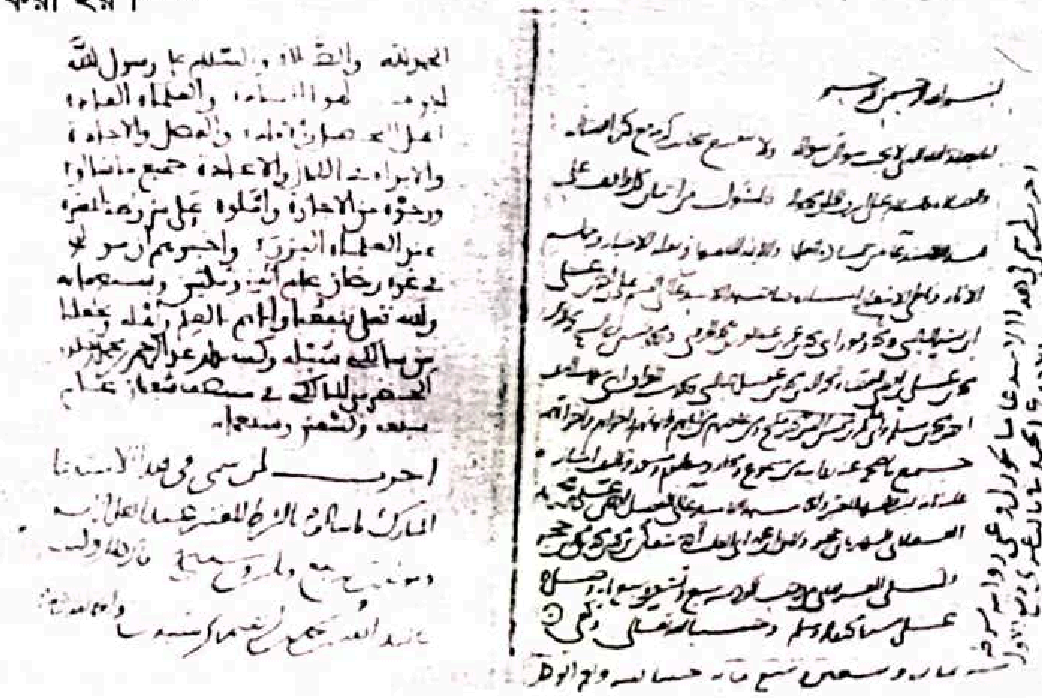
৭১৮. আলজেরিয়ার একটি শহর।

৭১৯. মালিকি মাযহাব অনুযায়ী পরিচালিত আদালত।

৭২০. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০।

সদস্যপদ দেন। ফলে তিনি ফেজের বড় বড় আলেম ও সাহিত্যিকের কাছে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান। এ সকল আলেম ও পণ্ডিত তিউনিসিয়া, আন্দালুস ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ফেজে সমবেত হয়েছিলেন।

ইবনে খালদুন তার পরিবারকে ফেজে রেখে গ্রানাডায় সফর করেন। সেখান থেকে আলজেরিয়ার ওরানে ফিরে আসেন। এখানে তিনি ও তার পরিবার ইবনে সালামার দুর্গে চার বছর বসবাস করেন। এখানেই তিনি তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন যার নাম '*আল-ইবারু দিওয়ানিল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি ফি আইয়ামিল আরাব ওয়াল-আজম ওয়াল-বারবার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাবিস সুলতানিল আকবার*', এটি *তারিখে ইবনে খালদুন* নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থের মুকাদ্দিমা বা ভূমিকাই সমাজবিজ্ঞান, মানবসমাজের ঘটনাবলি ও তার রীতিনীতি সম্পর্কে রচিত প্রথম ও সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা। এই ভূমিকাতেই তিনি সেসব বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন যেগুলোকে এখন 'সামাজিক ঘটনাবলি' বা 'মানবসভ্যতার ঘটনাবলি' বা 'মানবসমাজের অবস্থাবলি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৭২১]



চিত্র নং-২০

ইবনে খালদুনের গ্রন্থ

---

৭২১. যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩৩০; ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ২১ ও পরবর্তী।

ইবনে খালদুন এই মুকাদ্দিমায় তার সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে তা অতি মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বরং যে সময়ে এই মুকাদ্দিমা রচিত হয়েছে সেই সময়ের তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত অগ্রসর। মুকাদ্দিমায় ছয়টি অধ্যায় রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় মানবসভ্যতা বা মানবসমাজ : এটি সাধারণ সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে ইবনে খালদুন মানবসমাজের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং যেসব রীতিনীতি ও আইনকানুনের ওপর সমাজ পরিচালিত হয় সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় বেদুইন সমাজ : এই অধ্যায়ে তিনি বেদুইন সমাজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এই সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিত করেছেন। বেদুইন সমাজ নাগরিক সমাজের মূল ভিত্তি এবং তার পূর্ববর্তী স্তর।

তৃতীয় অধ্যায় রাষ্ট্র, খিলাফত ও সাম্রাজ্য : এটি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। ইবনে খালদুন এই অধ্যায়ে শাসনের নীতিমালা, ধর্মীয় সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় নাগরিক সমাজ : এটি নাগরিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে তিনি নগরসভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় ঘটনা এবং নগর উন্নয়নের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সভ্য ও সংস্কৃতিমান হওয়াই নগরায়ণের উদ্দেশ্য।

পঞ্চম অধ্যায় শিল্পবাণিজ্য, জীবিকা ও উপার্জন : এটি অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। এই অধ্যায়ে তিনি সমাজের অবস্থাবলির ওপর অর্থনৈতিক ঘটনাবলির প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় জ্ঞানবিজ্ঞান ও জ্ঞানার্জন : এটি শিক্ষাসংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞানের অনুরূপ। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলি, শিক্ষাগ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের পন্থা ও পদ্ধতি এবং জ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

ইবনে খালদুন এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় সমাজবিজ্ঞান ও আইন-সম্বন্ধীয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন, পাশাপাশি রাজনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।[৭২২]

দৃশ্যমান সত্য এই যে, ইবনে খালদুনের পূর্বে কেউই সামাজিক ঘটনাবলির এমন বিচার-বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি, যাতে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। ইবনে খালদুনের গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণে ফলাফল ও সিদ্ধান্ত উভয়টি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই মুসলিম ফকিহ চিন্তাবিদ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেছেন, যেভাবে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এ কারণে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সামাজিক ঘটনাবলিকে একটি বিদ্যায়তনিক গবেষণামূলক পদ্ধতির আওতাভুক্ত করেছেন এবং এর দ্বারা বহু প্রতিষ্ঠিত সত্যে উপনীত হয়েছেন যেগুলো আইনকানুনের সমগোত্রীয়। ইবনে খালদুন এই পদ্ধতির ভিত্তিতেই যেসব তত্ত্ব স্থির করেছেন তা মানবচিন্তার অগ্রযাত্রায় সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণার ময়দানে পথপ্রদর্শক কর্মরূপে বিদ্যমান।[৭২৩]

---

৭২২. নুমান আবদুর রাজ্জাক আস-সামাররায়ি, *নাহনু ওয়াল-হাদারাহ ওয়াশ-শুহুদ*, খ. ১, পৃ. ১২০।

৭২৩. ড. মোস্তফা আশ-শাকআহ, *আল-উসুসুল ইসলামিয়্যা ফি ফিকরি ইবনি খালদুন ওয়া নাযরিয়্যাতিহ*, পৃ. ৭৭-৭৮।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শরিয়া-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

মুসলিম উম্মাহ তাদের দ্বীনের ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্যকোনো জাতি সেটা করেনি। এভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অবিমিশ্র ইসলামি জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যকোনো জাতির কাছে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নেই। ইসলামি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১. উসুলুল হাদিস-সম্পর্কিত জ্ঞান

এই জ্ঞান নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত, সুন্নাহ ইসলামি শরিয়ার উৎসগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় উৎস। প্রথম উৎস আল-কুরআন। সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বক্তব্য, কাজ ও অনুমোদনের দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইসলামের প্রয়োগ ও তার আইনকানুন বাস্তবায়নের পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

ইলমুল হাদিসের পরিচিতি এরূপ : ইলমুল হাদিস এমন জ্ঞান যার দ্বারা হাদিসের সনদের অবস্থাবলি, অর্থাৎ রাবিদের ধারাক্রম এবং হাদিসের বক্তব্য, অর্থাৎ হাদিসের টেক্সট (মতন) ও বিষয়বস্তু জানা যায়। ইলমুল হাদিসের উদ্দেশ্য হলো সহিহ ও গাইরে সহিহ হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

সুতরাং ইলমুল হাদিস দুই প্রকারের :

ক. রেওয়ায়েত বা বর্ণনা-সম্পর্কিত ইলমুল হাদিস : নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় কথা বা কাজ বা অনুমোদন অথবা দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম বর্ণনা ইলমুল হাদিসের এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

খ. দিরায়াত বা উসুল ও নীতি-সম্পর্কিত ইলমুল হাদিস : এখানে সেসব উসুল ও নীতি আলোচনা করা হয় যেগুলো দ্বারা সহিহ হাদিস, হাসান হাদিস ও যয়িফ হাদিস বলতে কী বোঝায় তা জানা যায়, এসব হাদিসের প্রকারসমূহও জানা যায়; রেওয়ায়েতের অর্থ, এর শর্তাবলি ও প্রকারভেদ, রাবির অবস্থা ও শর্তাবলি, জারহ ও তাদিল, রাবিদের ইতিহাস, তাদের জন্ম ও মৃত্যু, নাসিখ, মানসুখ, মুখতালিফুল হাদিস, গরিবুল হাদিস ও অন্যান্য বিষয় জানা যায়। সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায়, রাবি (বর্ণনাকারী) ও বর্ণনাকৃত বিষয়ের অবস্থা অথবা সনদ ও মতনের অবস্থা জানা, যাতে গ্রহণ করা যায় অথবা বর্জন করা যায়। এই জ্ঞানের নামই 'ইলমু উসুলিল হাদিস' (হাদিসের নীতিমালা-সম্পর্কিত জ্ঞান) অথবা ইলমু মুসতালাহিল হাদিস (হাদিসের পরিভাষা-সম্পর্কিত জ্ঞান)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে মিথ্যাচার ও বানোয়াট বক্তব্য থেকে সুরক্ষার জন্য এই জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। তা ছাড়া এই জ্ঞানের আলোকে কোনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় আর কোনটা করা যায় না তা জানা যায়।

উসুলুল হাদিস-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় রামাহুরমুযিকে[৭২৪]। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে মুহাদ্দিসগণের বহুসংখ্যক নীতি ও পরিভাষা সংকলন করেছেন। তার গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন '*আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবি ওয়াল-ওয়ায়ি*'। তারপর এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন হাকিম নিশাপুরি[৭২৫], তার গ্রন্থের নাম '*মারিফাতু উলুমিল হাদিস*'। তিনি তার গ্রন্থে রামাহুরমুযিকেই অনুসরণ করেন। আবু নুআইম আল-ইস্পাহানি[৭২৬] তার গ্রন্থে একই পথ অনুসরণ

---

৭২৪. রামাহুরমুযি : আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ (মৃ. ৩৬০ হি./৯৭১ খ্রি.)। যুগশ্রেষ্ঠ অনারব মুহাদ্দিস। সাহিত্যিক ও কাজি। কবিতা বিষয়েও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। '*আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাবি ওয়াল-ওয়ায়ি*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ৪২।

৭২৫. হাকিম নিশাপুরি : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হামদওয়াইহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরি (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.)। বিশিষ্ট হাফিযে হাদিস এবং হাদিসবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ইরানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৮০-২৮২।

৭২৬. আবু নুআইম আল-ইস্পাহানি : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ আল-ইস্পাহানি (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.)। হাফিযে হাদিস, ইতিহাসবিদ। হাদিস সংরক্ষণ ও

করেন, তার গ্রন্থের নাম *'আল-মুসতাখরাজ আলা মারিফাতি উলুমিল হাদিস'*। তারই পথ ধরে এগিয়ে যান খতিব বাগদাদি, তার রচিত গ্রন্থের নাম *'আল-কিফায়া ফি ইলমির-রিওয়ায়া'*। একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন কাজি ইয়ায, তার গ্রন্থের নাম *'আল-ইলমা ইলা মারিফাতি উসুলির রিওয়ায়াতি ওয়া তাকয়িদিল আসমা'*।

তাদের পর আসেন হাফিজ ইবনে সালাহ। তিনি তার নিজস্ব শৈলী ও পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *'উলুমুল হাদিস'*[৭২৭]। এই গ্রন্থ পূর্ববর্তী সকল রচনার মার্জিত ও সামগ্রিক রূপ, ফলে তা আলেম-উলামার কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং পরবর্তীকালে রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থাবলি হয়তো এটির সংক্ষিপ্তরূপ অথবা বিশ্লেষিতরূপ বা তার ইঙ্গিতবাহী অথবা বিন্যস্তরূপ। হাফিজ ইবনে সালাহর এই গ্রন্থের পরে উসুলুল হাদিস বিষয়ে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তিকা রচিত হয়, সেটি রচনা করেন ইবনে হাজার আসকালানি[৭২৮]। তিনি পুস্তিকাটির নাম দেন *'নুখবাতুল ফিকার'*। এরপর তিনি নিজেই এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন, সেটার নাম দেন *'নুযহাতুন নাযার'*। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলোর নাম উল্লেখ করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।[৭২৯]

যে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তার প্রেক্ষিতে উলুমুল হাদিস কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। নিচে তার আলোচনা করা হলো।

বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া'*, *'দালাইলুন নুবুওয়া'*, *'তারিখু ইস্পাহান'*, *'মুজামুস সাহাবাহ'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

৭২৭. এই গ্রন্থের আরও দুটি নাম আছে : ১. *মুকাদ্দিমা ইবনে আস-সালাহ*, এ নামেই এটি সমধিক পরিচিত। ২. *মারিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস*।

৭২৮. ইবনে হাজার আসকালানি : আবুল ফজল আহমাদ ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আল-কিনানি (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.)। জ্ঞান ও ইতিহাসের জগতে একজন ইমাম। তিনি ফিলিস্তিনের (বর্তমান ইসরাইলের) আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'ফাতহুল বারি'*। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৭, পৃ. ২৭০-২৭৩।

৭২৯. মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, পৃ. ১২-১৫।

গঠন-কাঠামোর বিবেচনায় হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১. সনদ (যে সকল রাবি হাদিসের মূলকথা ও শব্দসমষ্টি বর্ণনা করেছেন)

২. মতন (সনদের শেষে বর্ণিত হাদিসের মূলপাঠ ও শব্দসমষ্টি)

বক্তা অনুযায়ী হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. মারফু, অর্থাৎ যে কথা বা কাজ বা অনুমোদন বা স্বীকৃতি বা গুণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

২. মাওকুফ, অর্থাৎ যে হাদিসের সনদ সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. মাকতু, অর্থাৎ যে হাদিসের সনদ তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমাদের কাছে পৌঁছার বিবেচনায় হাদিসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :

১. হাদিসে মুতাওয়াতির : যে হাদিসের সনদের সকল স্তরে রাবি এত বেশি যে, তাদের একত্র হয়ে মিথ্যা রচনা বা মিথ্যা কথা বলা স্বভাবতই ও যৌক্তিকভাবেও অসম্ভব মনে হয়। অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক স্তরে একদল রাবি রয়েছেন। এ ধরনের হাদিস শব্দগত দিক থেকে মুতাওয়াতির অথবা অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির।

২. হাদিসে আহাদ বা খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক এমন হাদিস যাতে মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তাবলি পাওয়া যায়নি। এ ধরনের হাদিস তিন প্রকারের হয়ে থাকে : ক. মাশহুর, খ. আযিয, গ. গরিব।

ক. হাদিসে মাশহুর : সনদের প্রত্যেক স্তরে যদি রাবিদের সংখ্যা তিনজন বা তার চেয়ে বেশি থাকে তাহলে তা হাদিসে মাশহুর।

খ. হাদিসে আযিয : যে হাদিসের সনদের প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা দুইজনের কম নয় এবং কোনো কোনো স্তরে দুইজনের বেশি হতে পারে, তা হাদিসে আযিয।

গ. হাদিসে গরিব : যে হাদিসের সনদের প্রত্যেক স্তরে অথবা কোনো একটি স্তরে একজনমাত্র রাবি তাকে হাদিসে গরিব বলে। একে হাদিসে ফারদ (একক ব্যক্তির হাদিস)-ও বলা হয়।

গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের বিবেচনায় হাদিসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : ১. সহিহ হাদিস, ২. হাসান হাদিস, ৩. যয়িফ হাদিস। এদের প্রথম দুই ভাগের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের : সহিহ লি-যাতিহি এবং সহিহ লি-

গাইরিহি, হাসান লি-যাতিহি এবং হাসান লি-গাইরিহি। তৃতীয় ভাগের অর্থাৎ যয়িফ (দুর্বল) হাদিসের প্রকার অনেক; আছে মুআল্লাক, মুরসাল, মুদাল্লাস, মুরসালখফি, মুনকাতি, মু'দাল; আছে মাওজু, মাতরুক, মাতরুহ; আছে শায, মুনকার, মুদতারাব, মাকলুব, মুদরাজ, মাযিদ, মুসাহহাফ ও মুহাররাফ।[৭৩০]

এই জ্ঞান নিয়ে গৌরব ও অহংকার করা কেবল মুসলিম উম্মাহকেই শোভা পায়, তারাই এর হকদার। এই জ্ঞানশাখার নীতিমালা নিয়ে তারাই সম্মানিত বোধ করতে পারে। উসুলুল হাদিস বিদ্যার উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন ও স্বীকৃতিকে স্পষ্টভাবে, নির্ভেজাল ও সন্দেহাতীতভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

১. ইলমুল জার্হ ওয়াত-তাদিল (রাবি বা হাদিস-বর্ণনাকারীর দোষ ও গুণ বর্ণনা-সম্পর্কিত বিদ্যা)

এটা স্পষ্টভাবেই জানা বিষয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস ও সংবাদসমূহ রাবিদের ও বাহকদের সূত্র ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং সহিহ ও দুর্বল হাদিস জানার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এ সকল রাবি ও বাহকের অবস্থাবলি অবহিত হওয়া, তাদের স্বভাবচরিত্র অনুসন্ধান করা, তাদের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, তাদের শ্রেণি ও স্তর সম্পর্কে জানা এবং কারা আস্থাভাজন ও কারা দুর্বল তা অবগত হওয়া।

এগুলোই হলো 'ইলমুল জার্হ ওয়াত-তাদিল' অথবা 'ইলমুর রিজাল'[৭৩১] অথবা 'ইলমু মিযান আও মিয়ারুর রুয়াত'[৭৩২]-এর আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর বুকে অন্যকোনো জাতির কাছে এ ধরনের বিদ্যার দৃষ্টান্ত নেই। এই বিদ্যা-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, কতিপয় ভিত্তি ও আইন স্থির করা হয়েছে। ফলে এই বিদ্যা সূক্ষ্ম পরিমাপ ও মানদণ্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়, যার ভিত্তিতে রাবিদের অবস্থা যাচাই করা হয়। কে বিশ্বস্ত এবং কে

---

৭৩০. বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে দেখুন, *হাদিস বিজ্ঞান*, শামীম আরা চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ২০০১।-অনুবাদক

৭৩১. রিজালশাস্ত্র বা রাবিদের নাম-পরিচয়-সম্পর্কিত বিদ্যা।-অনুবাদক

৭৩২. রাবিদের মানদণ্ড-সম্পর্কিত বিদ্যা।-অনুবাদক

দুর্বল, কার বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য এবং কার বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য তা এই বিদ্যার ভিত্তিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এই বিদ্যাকে ইলমুল হাদিস বা হাদিস শাস্ত্রের অর্ধেক বিবেচনা করা হয়। এটি হাদিসের রাবিদের নিক্তি এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানদণ্ড। এই বিদ্যাই মিথ্যাচার ও বানোয়াট কথাবার্তা থেকে সুন্নাহকে সুরক্ষাকারী!

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে সুরক্ষাদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কারণ তারা আশঙ্কা করেছেন যে, হাদিসের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে এতে মিথ্যা ও কল্পনা এবং বানোয়াট ও জাল জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটবে। নানা কারণেই এটা হতে পারে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য, দলীয় উদ্দেশ্য সাধন, চিন্তাগত লক্ষ্য, মাযহাবি মত ও সিদ্ধান্ত, শ্রোতাদের আকর্ষণ করার জন্য মুখরোচক কাহিনি, শাসকদের তোষামোদ ও চাটুকারিতা অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যেকোনো কারণেই তা হতে পারে। আলেমগণ হাদিস সুরক্ষার জন্য বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন আর তারই পরিচিতি ঘটে 'ইলমুল জারূহ ওয়াত-তাদিল' নামে। হাদিসের সনদসমূহ অর্থাৎ যে-সকল রাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের পরম্পরার পাঠও এই জ্ঞানশাখার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সনদই মতন বা হাদিসের ভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং হাদিসের স্তর নির্ণয় করে। তাই হাদিস-বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা নিরূপণ ছাড়া হাদিসের সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করা যায় না। সনদ যদি না থাকত তাহলে যে-কেউ যা-খুশি বলতে পারত। যদি সনদের দাবি অপরিহার্য না হতো এবং হাদিসের সুরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা না থাকত তাহলে ইসলামের মিনার ধসে পড়ত। তা ছাড়া ধর্মত্যাগী ও বিদআতপন্থীরা হাদিস বানানোর মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যেত।[৭৩৩]

পারিভাষিক অর্থে জারূহ : জারূহ বলতে বোঝায় রাবির দোষ বর্ণনা করা বা দোষ প্রকাশ করা, যে দোষের প্রেক্ষিতে তার রেওয়ায়েত প্রত্যাখ্যাত হয়।

পারিভাষিক অর্থে তাদিল : তাদিল বলতে বোঝায় রাবির গুণ বর্ণনা করা, যে গুণের প্রেক্ষিতে তার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হয়।

---

৭৩৩. ড. মুহাম্মাদ দাইফুল্লাহ আল-বিতাইনাহ, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২২।

ইলমুল জার্‌হ ওয়াত-তাদিল-এর পারিভাষিক অর্থ, এটা এমন বিদ্যা বা জ্ঞানশাখা যেখানে নির্দিষ্ট শব্দাবলির দ্বারা রাবিদের দোষ ও গুণ বর্ণনা করা হয় এবং ওই নির্দিষ্ট শব্দাবলির স্তরবিন্যাস আলোচনা করা হয়। রাবিদের দোষ বর্ণনার বৈধতার ভিত্তি হলো কল্যাণকামিতা ও শরিয়তের সুরক্ষা এবং যার থেকে দ্বীনি জ্ঞান গ্রহণ করা হচ্ছে তার অবস্থা তুলে ধরা। এটা দ্বীনেরই অংশ, মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো নয়।[৭৩৪]

রাবিদের দোষ-গুণ বর্ণনা মনের বাসনা পূরণের জন্য নয়, প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্যও নয়। এ কারণে আপনি দেখবেন যে তারা কারও প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করেননি, সে যতই নিকটাত্মীয় হোক। তাদের কেউ কেউ নিজের জন্মদাতা পিতাকেও দুর্বল রাবি বলে সাব্যস্ত করেছেন। আলি ইবনুল মাদিনি[৭৩৫]-কে তার পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আমাকে নয়, অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করো। উপস্থিত লোকেরা বলল, আমরা আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি। তখন তিনি মাথা নিচু করে আবার মাথা তুললেন। বললেন, এটাই দ্বীন, আমার বাবা দুর্বল (রাবি)।[৭৩৬] কেউ কেউ নিজের ছেলেকে ও ভাইকেও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ[৭৩৭] বলেছেন, আমার ভাই ইয়াহইয়া থেকে তোমরা হাদিস গ্রহণ করো না।[৭৩৮]

---

৭৩৪. আশ-শারিফ হাতিম ইবনে আরিফ আল-আওনি, *খুলাসাতুত তাসিল লি-ইলমিল জার্‌হ ওয়াত-তাদিল*, পৃ. ৬।

৭৩৫. আলি ইবনুল মাদিনি, আবুল হাসান আলি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আস-সাদি (১৬১-২৩৪ হি./৭৭৭-৮৪৯ খ্রি.)। মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ। তার যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদিস ছিলেন। রিজালশাস্ত্রের ইমাম। তার শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ, আবু হাতিম আর-রাযি, আবু ইয়ালা আল-মুসিলি প্রমুখ। তার রচিত প্রায় দুইশটি গ্রন্থ রয়েছে। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন সামার্‌রায়। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الأسامي والكنى (আট খণ্ড), الطبقات (দশ খণ্ড), قبائل العرب (দশ খণ্ড), التاريخ (দশ খণ্ড), اختلاف الحديث (পাঁচ খণ্ড), مذاهب المحدثين (দুই খণ্ড)। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ২, পৃ. ৮১।

৭৩৬. ইবনে হিব্বান, *আল-মাজরুহিন*, খ. ২, পৃ. ১৫।

৭৩৭. যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ : আবু উসামা যায়দ ইবনে আবি উনাইসাহ আল-জাযারি আর-রুহাবি (মৃ. ১২৪ হি.)। ইমাম, হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাবি। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৮৮।

৭৩৮. সাখাবি, *ফাতহুল মুগিস*, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫।

তাই এখানে কিছু শর্ত রয়েছে যা জারিহ (দোষ বর্ণনাকারী) ও মুআদ্দিল (গুণ বর্ণনাকারী)-এর মধ্যে পর্যাপ্তরূপে থাকা অপরিহার্য। যেমন :

১. পরিপূর্ণ জ্ঞান, তাকওয়া, পরহেযগারি ও সত্যবাদিতা থাকতে হবে।

২. জার্‌হ ও তাদিলের কারণগুলো জানা থাকতে হবে।

৩. আরবদের বাগ্‌ভঙ্গি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। কোনো শব্দকে প্রচলিত অর্থের বাইরে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। এমন শব্দ বর্ণনা করে দোষ প্রকাশ করা যাবে না যা মূলত দোষ-প্রকাশক নয়।[৭৩৯]

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ কিছু নির্দিষ্ট শব্দকে পরিভাষা হিসেবে স্থির করেছেন, এগুলো দ্বারা তারা রাবিদের দোষ-গুণ প্রকাশ করে থাকেন। যাতে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের বিবেচনায় তাদের বর্ণিত হাদিসসমূহের স্তর নির্ণয় করা যায়। শব্দগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত তাওসিক ও তাদিলের শব্দাবলি (যেসব শব্দের দ্বারা রাবিকে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করা হয় বা গুণ প্রকাশ করা হয়) :

১. অধিকতর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা-প্রকাশক শব্দাবলি : এমন গুণ প্রকাশে সবচেয়ে স্পষ্ট শব্দ হলো 'আফআল' (আধিক্য-প্রকাশক শব্দরূপ)। যেমন আওসাকুন নাস (সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি) অথবা আসবাতুন নাস (সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি) অথবা ইলাইহিল মুনতাহা ফিত-তাসাব্বুত (নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যক্তি)।

২. বিশ্বস্ততা-প্রকাশক বিশেষণের পুনরুক্তি : এটা শব্দগতও হতে পারে, অর্থগতও হতে পারে। যেমন সিকাহ সিকাহ (বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত), সিকাহ হাফিয (বিশ্বস্ত সংরক্ষক), সাবৃত হুজ্জাহ নির্ভরযোগ্য প্রমাণপেশের উপযুক্ত, সিকাহ মুতকান (বিশ্বস্ত যথাযথ)।

৩. বিশ্বস্ততা-প্রকাশক একটি শব্দের ব্যবহার : যেমন সিকাহ, সাবৃত, ইমাম, হুজ্জাহ একক অর্থে একাধিক শব্দের ব্যবহারও হতে পারে। যেমন আদিল হাফিজ বা আদিল দাবিত।

---

৭৩৯. আশ-শারিফ হাতেম ইবনে আরিফ আল-আওনি, *আত-তাসিল লি-ইলমিল জারহি ওয়াত-তাদিল*: ২৭; আবুল হাসানাত আল-লাকনাবি আল-হিনদি, *আর-রাফউ ওয়াত-তাকমিল*: ৬৭।

৪. কারও কারও মন্তব্য : লা বা'সা বিহি বা লাইসা বিহি বা'স তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, অথবা সাদুক অধিক সত্যবাদী বা খাইয়ার অধিক ভালো। তবে ইবনে মাইন[৭৪০] যখন 'লাইসা বিহি বা'স' বলে মন্তব্য করবেন, তখন তার ভিন্ন অর্থ দাঁড়াবে। কারণ তিনি বলেছেন, যখন আমি তোমাকে বলব, 'লাইসা বিহি বা'স', তার অর্থ হলো সে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

৫. মুহাদ্দিসগণের অন্যান্য মন্তব্য : সত্যবাদিতা তার অবস্থান বা সে সত্যবাদিতার কাছাকাছি (অর্থাৎ সে সত্যবাদিতা থেকে দূরে নয়) বা শাইখ বা হাদিসের কাছাকাছি বা সন্দেহকারী সত্যবাদী বা ভ্রমযুক্ত সত্যবাদী বা ইনশাআল্লাহ সত্যবাদী বা আশা করি তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই বা তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই বা সৎ বা হাদিসের ক্ষেত্রে সৎ।

উপর্যুক্ত পাঁচটি স্তরের হুকুম : যে রাবির ক্ষেত্রে প্রথম তিন স্তরের কোনো শব্দ বলা হবে তার বর্ণিত হাদিস সহিহ এবং একটি অপরটি থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। চতুর্থ স্তরের শব্দ যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তাদের বর্ণিত হাদিস হাসান। আর পঞ্চম স্তরে যারা রয়েছেন, অর্থাৎ যাদেরকে এসব শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। তবে বিবেচনার জন্য তাদের হাদিস লেখা যেতে পারে। অন্য রাবিগণ তাদের সমর্থক হলে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত হবে।

দ্বিতীয়ত দোষ-প্রকাশক শব্দাবলি :

১. যেসব শব্দ অধিকতর দোষ প্রকাশ করে সেগুলোর দ্বারা কাউকে চিহ্নিত করা : এমন দোষ প্রকাশে সবচেয়ে স্পষ্ট শব্দ হলো 'আফআল' (আধিক্য-প্রকাশক শব্দরূপ)। যেমন মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য, আকযাবুন নাস (সবচেয়ে মিথ্যাবাদী লোক) বা ইলাইহিল মুনতাহা ফিল-কিয্‌ব (মিথ্যাবাদিতায় চরম পর্যায়ের ব্যক্তি) বা হুয়া রুক্‌নুল কিয্‌ব (সে মিথ্যাবাদিতার খুঁটি)।

---

৭৪০. ইয়াহইয়া ইবনে মাইন : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মাইন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে আবদুর রহমান আল-মুররি আল-বাগদাদি (১৫৮-২৩৩ হি./৭৭৫-৮৪৮ খ্রি.)। প্রখ্যাত হাফিযে হাদিস এবং মুহাদ্দিসদের ইমাম। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১৩৯; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৭২।

২. দোষ প্রকাশে যা বলা হয় : সে জাল হাদিসের কারিগর বা সে অতিশয় মিথ্যাবাদী বা সে হাদিস বানায় বা সে হাদিস উদ্ভাবন করে বা সে কিছুই না (এটি ইমাম শাফিয়ির মন্তব্য)।

৩. দোষ প্রকাশে যা বলা হয় : সে মিথ্যায় অভিযুক্ত বা সে জাল হাদিস বানানোর জন্য অভিযুক্ত বা সে হাদিস চুরি করে বা সে বর্জিত বা সে ধ্বংসকারী বা তার হাদিস ছুটে যায় বা তার হাদিস পরিত্যাজ্য বা মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন বা তার মধ্যে সমস্যা রয়েছে বা মুহাদ্দিসগণ তার ব্যাপারে চুপ রয়েছে (শেষের দুটি মন্তব্য ইমাম বুখারির) বা সে বিশ্বস্ত নয়।

৪. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : তোমরা তার হাদিস প্রত্যাখ্যান করো বা সে অত্যন্ত দুর্বল বা সে একেবারেই ভিত্তিহীন বা সে বিনষ্টকারী বা তার থেকে রেওয়ায়েত বৈধ নয় বা 'লা শাইয়া' (সে কিছু নয়) বা লাইসা বি-শাইয়িন (সে কিছু নয়; এটি ইমাম শাফিয়ি ছাড়া অন্যদের মন্তব্য) বা মুনকারুল হাদিস (তার হাদিস অস্বীকৃত; ইমাম বুখারির মন্তব্য এটি)।

৫. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : সে দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন বা তার হাদিস অস্বীকৃত (ইমাম বুখারি ছাড়া অন্যদের মন্তব্য) বা তার হাদিস বিশৃঙ্খল বা তার হাদিস দলিলযোগ্য নয় বা সে ভিত্তিহীন।

৬. দোষ প্রকাশে মন্তব্য : তার ব্যাপারে কথা রয়েছে বা তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে বা সে তেমনটা নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে অভিজ্ঞ নয় বা সে দৃঢ়চিত্ত নয় বা তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল বা সে তরলচিত্ত বা তুমি তার হাদিস জানো এবং অস্বীকার করো বা সে সংরক্ষক নয়।

উপর্যুক্ত ছয়টি স্তরের হুকুম : প্রথম চারটি স্তরের ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, তাদের কারও দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না এবং তাদের বর্ণিত হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের হাদিস কোনোভাবেই বিবেচ্য নয়। তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রাবিদের হাদিস জাল ও বানোয়াট, তৃতীয় স্তরের রাবিদের হাদিস পরিত্যাজ্য এবং চতুর্থ স্তরের রাবিদের হাদিস অতিশয় দুর্বল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের রাবিদের হাদিস বিবেচনার জন্য লেখা

যাবে এবং তাদের বর্ণিত কোনো হাদিসের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে তা সর্বোচ্চ হাসান স্তরে উন্নীত হবে।[৭৪১]

হাদিস-বিশেষজ্ঞগণ তাদের রাবি-সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল জারহ ওয়াত-তাদিল-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলিতে সংকলন করেছেন। 'আদ-দুআফা' নাম বহনকারী কিতাবসমূহে তারা দুর্বল রাবিদের স্থান দিয়েছেন। যেমনঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি কর্তৃক রচিত কিতাব '*আদ-দুআফাউল কাবির*' ও '*আদ-দুআফাউস সাগির*', ইমাম নাসায়ি[৭৪২] কর্তৃক রচিত কিতাব '*আদ-দুআফা ওয়াল-মাতরুকিন*'। অন্যদিকে 'আস-সিকাত' নাম বহনকারী কিতাবগুলোতে তারা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবিদের স্থান দিয়েছেন। যেমন ইবনে হিব্বান কর্তৃক রচিত কিতাব '*আস-সিকাত*'। কিছু কিছু কিতাবে দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য উভয় শ্রেণির রাবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের বিখ্যাত দুটি কিতাব : ইবনে সাদ কর্তৃক রচিত '*আত-তাবাকাতুল কুবরা*' এবং হাফিয ইবনে কাসির কর্তৃক রচিত '*আত-তাকমিল ফিল-জারহি ওয়াত-তাদিল ওয়া মারিফাতিস সিকাত ওয়ায-যুআফায়ি ওয়াল-মাজাহিল*'।[৭৪৩]

পবিত্র নববি সুন্নাহকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য করা এবং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে সুরক্ষাদানের জন্য মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীগণ যে উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়। তারা সুন্নাহর বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার যত পথ আছে তার সবগুলো অবলম্বন করেছেন। এভাবে তারা এই জ্ঞানের (ইলমুল জারহি ওয়াত-তাদিল) উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং একে শীর্ষস্থানে পৌছে দিয়েছেন। এটি একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই বৈশিষ্ট্য। মানবেতিহাসের প্রাচীন পর্বে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আধুনিক পর্বেও নেই।

---

৭৪১. মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসির মুসতালাহিল-হাদিস*, পৃ. ১১৬-১১৮।

৭৪২. নাসায়ি : আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলি আল-খুরাসানি (২১৫-৩০৩ হি./৮৩০-৯১৫ খ্রি.)। হাদিসের প্রখ্যাত ইমামদের অন্যতম। সুনান রচয়িতা। খুরাসানের নাসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন মক্কা মুকাররমায়। দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৪, পৃ. ১২৫।

৭৪৩. মুহাম্মাদ যাইফুল্লাহ আল বাতায়িনা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৩২৩; মাহমুদ আত-তাহহান, *তাইসিরু মুসতালাহিল হাদিস*, পৃ. ১১৫-১১৬।

হাদিসের সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ) এবং অন্যান্য সহিহ হাদিসগ্রন্থ, যেগুলোর শীর্ষস্থানে রয়েছে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ।



চিত্র নং-২১
'সহিহুল বুখারি'

৩. ইলমু উসুলিল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি-সংক্রান্ত বিদ্যা)

ইসলামি সভ্যতার কীর্তিগুলো গণনা করতে গেলে অবশ্যই 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'-এর কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করতে হবে। এই বিদ্যা একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই অর্জন, পূর্ববর্তী কোনো জাতির এই অর্জন নেই, পরবর্তী কোনো জাতিরও নেই। মুসলিম উম্মাহ ছাড়া অন্যকোনো জাতির 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'-এর মতো স্বতন্ত্র বিদ্যা বা জ্ঞান নেই, এই বিদ্যা পূর্ণাঙ্গতায় ও সূক্ষ্মতায় অনন্য, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহ তার যাবতীয় নিয়মনীতি ও আইনকানুনকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে!

এই জ্ঞান—যেমনটি ইবনে খালদুন ইঙ্গিত করেছেন—মুসলিম জাতির মধ্যে নব-উদ্ভাবিত জ্ঞানগুলোর অন্যতম। এটি উলুমে শারইয়্যাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচিত হয়। এই জ্ঞানের মর্যাদা অনেক এবং এর উপকারিতা অপরিসীম। 'ইলমু উসুলিল ফিকহ' বলতে বোঝায় শরিয়ার দলিল-প্রমাণ যাচাই-বাছাই করা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এগুলো থেকে (শরয়ি) হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা হয়।[৭৪৪] অন্য কথায়, নীতিমালা ও দলিলসমূহ জানা, যার দ্বারা শরয়ি বিধিবিধানে উপনীত হওয়া যায়।

এই মহৎ জ্ঞানশাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো ইসলামের খেদমত এবং মানুষের ঐচ্ছিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত ইসলামের সুদৃঢ় হুকুম-আহকামের খেদমত।

উসুলে ফিকহ-সংক্রান্ত বিদ্যার উদ্ভব কীভাবে হলো? তার জবাব এই, কতিপয় ফকিহ ফিকহি বিধান স্থিরীকরণ অথবা সেগুলোর উদ্‌ঘাটনে কিছু মূলনীতি ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতেন। এই ক্ষেত্রে অন্যরা তাদের সঙ্গে মতবিরোধ করতেন। ফলে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে যা সহিহ ও বিশুদ্ধ তার শুদ্ধতা নিরূপণের জন্য এবং একই বিষয়ের একাধিক বিধানের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে তা নিশ্চিত করার জন্য শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন পড়ে। যদিও ফকিহগণের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এ বিষয়ে প্রথমে পুস্তিকা আকারে রচনাবলি প্রকাশিত হতে শুরু করল, এগুলোতে মৌলিক নীতিমালার আলোচনা থাকত। অর্থাৎ, কোন নীতির ওপর নির্ভর করা আবশ্যক, কোন নীতির ওপর নির্ভর করা জায়েয এবং কোন নীতির ওপর নির্ভর করা জায়েয নেই ইত্যাদি।[৭৪৫]

যাকে ইলমু উসুলিল ফিকহ বিষয়ে প্রথম কিতাব রচনাকারী বিবেচনা করা হয় তিনি হলেন ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফিয়ি বা ইমাম শাফিয়ি। এ বিষয়ে তিনি তার কয়েকটি বিখ্যাত কিতাব রচনা ও সংকলন করেন। যেমন : *আর-রিসালাহ*, *জাম্মাউল ইলম*, *ইবতালুল ইসতিহসান* ও *ইখলিতাফুল হাদিস*। তার হাতেই এই জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে।

---

৭৪৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫২।

৭৪৫. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১৮-৫২০।



চিত্র নং-২২
ইমাম শাফিয়ি রচিত 'আর-রিসালাহ'

ইবনে খালদুন বলেন, এই বিষয়ে যিনি প্রথম কলম ধরেছেন, তিনি হলেন ইমাম শাফিয়ি রহ. (মৃ. ২০৪ হি.)। এ বিষয়ে তার বিখ্যাত পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। তাতে আলোচনা করেছেন শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ এবং হাদিস ও নাসেখ-মানসুখ নিয়ে এবং কিয়াসের দ্বারা নির্ধারিত ইল্লতের হুকুম নিয়ে। তারপর এ বিষয়ে হানাফি ফকিহগণ কিতাব রচনা করেছেন এবং ওইসব নীতিমালাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারা এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন...। এসব নীতিমালা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হানাফি ফকিহদের অবদান অনেক। কারণ তারা ফিকহি পয়েন্টগুলোর ওপর মনোযোগ দিয়েছেন এবং এসব নিয়মকানুন যথাসম্ভব ফিকহি মাসায়িল থেকে সংগ্রহ করেছেন। হানাফি ইমামগণের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু যায়দ আদ-দাবুসি[৭৪৬], তিনি কিয়াস নিয়ে অন্য সবার চেয়ে

---

৭৪৬. আবু যায়দ আদ-দাবুসি : আবদুল্লাহ (বা উবাইদুল্লাহ) ইবনে উমর ইবনে ঈসা আদ-দাবুসি আল-বুখারি আল-হানাফি আল-কাযি (মৃ. ৪৩০ হি./১০৩৯ খ্রি.)। হানাফি ঘরানার বিখ্যাত ফকিহ। ইলমুল খিলাফ (বিরোধ-বিদ্যা)-এর প্রবর্তক। বুখারা ও সমরকন্দের মাঝে অবস্থিত দাবুসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কিয়াসের জন্য যেসব শর্ত প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করেছেন। কিয়াসের পূর্ণাঙ্গতার ফলে উসুলে ফিকহের কাঠামোও পূর্ণতা লাভ করে। ফিকহি মাসায়িলগুলো মার্জিতরূপ ধারণ করে এবং ফিকহের নীতিমালাও সুবিন্যস্ত হয়। মানুষ উসুলে ফিকহের ব্যাপারে মুতাকাল্লিমদের (ধর্মতাত্ত্বিকদের) অবলম্বিত পন্থায় আকৃষ্ট হয়। মুতাকাল্লিমগণ এ বিষয়ে যত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উৎকৃষ্ট কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনি কর্তৃক রচিত '*আল-বুরহান*'।
২. ইমাম গাযালি (মৃ. ৫০৫ হি.) কর্তৃক রচিত '*আল-মুসতাসফা*'। এই দুইজন হলেন আশআরি ঘরানার ইমাম।
৩. কাজি আবদুল জাব্বার[৭৪৭] কর্তৃক রচিত '*আল-আহদ*'।
৪. আবুল হুসাইন আল-বসরি[৭৪৮] কর্তৃক রচিত '*আল-আহদ*'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ '*আল-মুতামাদ ফি উসুলিল ফিকহ*'। এই দুইজন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ইমাম।

এই চারটি গ্রন্থ এই শাস্ত্রের ভিত্তি এবং স্তম্ভ। পরবর্তীকালের মুতাকাল্লিমদের দুইজন মনীষী এই গ্রন্থ চারটির সংক্ষিপ্তরূপ রচনা করেন। তারা হলেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (মৃ. ৬০৬ হি.), তার রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ '*আল-*

تقويم الأدلة في أصول الفقه، الأسرار، تأسيس النظر، الأنوارا

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৩, পৃ. ৪৮।

৭৪৭. কাজি আবদুল জাব্বার : কাজিউল কুজাত আবুল হাসান আবদুল জাব্বার ইবনে আহমাদ আল-হামদানি আল-মুতাযিলি আল-আসাদাবাদি (৩৫৯-৪১৫ হি./৯৬৯-১০২৫ খ্রি.)। শাফিয়ি ঘরানার বিখ্যাত ফকিহ। সেই যুগের মুতাযিলা সম্প্রদায়ের শাইখ। রায় শহরে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। জন্ম ইরানের হামদান শহরের কাছে আসাদাবাদ এলাকায়। তিনি সত্তরটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

النهاية في أصول الفقه، الخلاف والوفاق، الدواعي والصواري، شرح الأصول الخمسة.

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১৭, পৃ. ২৪৪-২৪৫।

৭৪৮. আবুল হুসাইন আল-বসরি : মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে তাইয়িব আল-মুতাকাল্লিম আল-মুতাযিলি (মৃ. ৪৩৬ হি./১০৪৪ খ্রি.)। মুতাযিলি সম্প্রদায়ের ইমাম। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন, বসবাস করেন বাগদাদে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المعتمد في أصول الفقه। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ২৭১।

মাহসুল' এবং সাইফুদ্দিন আল-আমিদি[৭৪৯], তার রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ *'আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম'*।[৭৫০]

ইসলামি শরিয়ার উৎস থেকে মানুষের ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট হুকুম ও বিধান উদ্‌ঘাটনের জন্য নিবেদিত ফকিহগণের অবলম্বিত পদ্ধতিকে শৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্য প্রত্যেক ফিকহি মাযহাবেরই জ্ঞানী-মনীষীগণ মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে-সকল মুজতাহিদ (মূল বিধানের) শাখাগত বিধান উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টারত তাদের কর্ম যেন অর্থহীন না হয়। কারণ, তাদের কর্ম সুসম্পাদিত নীতিমালার আওতায় না হলে তা অর্থহীনই হবে। মনীষীদের প্রচেষ্টা ও আত্মনিবেদনের ফলে যে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে তার উদ্দেশ্য হলো দূরদৃষ্টি ও যৌক্তিক বিচার, মৌলিক নীতিমালার সুসম্পাদন, শাখাগত বিধান উদ্‌ঘাটনকারীর জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক তার বর্ণনা; সেই জ্ঞান হলো 'ইলমু উসুলিল ফিকহ'। পূর্ববর্তী কোনো জাতির কাছে এই ধরনের জ্ঞানের দৃষ্টান্ত নেই![৭৫১]

মানুষের মতামত, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও তাদের কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল নীতিমালার প্রণেতা যারা তারাও মুসলিমদের উসুলে ফিকহ শাস্ত্রের মর্যাদা ও মহিমা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়, শব্দের ব্যাখ্যায় উসুলে ফিকহে কতিপয় নীতি, কিয়াস ও জনকল্যাণ-সংক্রান্ত কতিপয় ফিহকি বিধান এবং পাঁচটি সামগ্রিক জিনিসের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ফিকহি আইনকানুন থেকে তারা উপকারও লাভ করেছেন। এই পাঁচটি সামগ্রিক জিনিসের সুরক্ষাদান ইসলামি শরিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত। তা হলো : দ্বীন, প্রাণ, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ। যা-কিছু এই পাঁচটিকে বা এই পাঁচটির কোনোটিকে সুরক্ষা দান

---

৭৪৯. সাইফুদ্দিন আল-আমিদি : আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আত-তাগলিবি (৫৫১-৬৩১ হি./১১৫৬-১২৩৩ খ্রি.)। যুক্তিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দিয়ারে বকরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

أبكار الأفكار في أصول الدين، غاية المرام في علم الكلام، الإحكام في أصول الأحكام، تعليقة الصغيرة في الخلاف ।

দেখুন, যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ২২, পৃ. ৩৬৪-৩৬৬।

৭৫০. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৪৫৫।

৭৫১. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৫১৯।

করে তা-ই কল্যাণ। যা-কিছু এগুলোর কোনো একটিকে বিঘ্নিত করে তা-ই অকল্যাণ। এগুলোর সুরক্ষাদান ও হেফাজতের বিভিন্ন স্তর ও ধাপ রয়েছে। একটি হলো জরুরি পর্যায়ের স্তর, এটি সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো প্রয়োজনীয় পর্যায়ের স্তর, এটি মধ্যম স্তর। এই স্তরেরও কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এরপর আছে ভালো (হলে ভালো) পর্যায়ের স্তর, এটি সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তরেরও আছে কয়েকটি ধাপ।[৭৫২]

'ইলমু উসুলিল ফিকহ' বা উসুলে ফিকহ শাস্ত্র একটি ইসলামি উদ্ভাবন এবং মানবসভ্যতার এক বিরাট ঘটনা!

---

৭৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

আরবি ভাষা তো কুরআনের ভাষা এবং ইসলামের নিদর্শন, ইসলামি সভ্যতার আধার এবং তার শক্তির প্রতীক। উম্মাহর গঠনপ্রক্রিয়ায় ও মুসলিম ব্যক্তিত্ব নির্মাণে আরবি ভাষার বড় অবদান রয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা থেকে ইসলামি সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

আরবি ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের কয়েকটি শাখা রয়েছে। আরবি ভাষাবিজ্ঞানীরা এগুলো উদ্ভাবন করেছেন। এসব জ্ঞানশাখা একটি বিশ্বসভ্যতার ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার পরিপক্বতা, উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি সাধনে অব্যাহত ভূমিকা পালন করেছে এবং একে বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, যার চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য মুহূর্তের জন্যও ম্লান হয় না। ফলে আরবি ভাষা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে কালযাপন করছে।

ভাষা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশাখার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইলমুন নাহব (পদক্রম ও বাক্যবিন্যাসশাস্ত্র)

ইলমুন নাহবকে ইলমুল ইরাবও বলা হয়। এটি আরবি ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর দ্বারা আরবি বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়া, পদক্রম, বাক্যগঠনে শব্দের অবস্থান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি শুদ্ধরূপে জানা যায়। কোনটা শুদ্ধ নয় সেটাও জানা যায়। ইলমুন নাহবের উদ্দেশ্য হলো আরবি ভাষা লেখা ও বলায় ভুলত্রুটি থেকে বাঁচা এবং তা বোঝা ও বোঝানোয় সক্ষমতা অর্জন করা।[৭৫৩]

এই জ্ঞানশাখার উদ্ভাবনের পেছনে কিছু কারণ আছে। আরবরা যখন বিজিত দেশগুলোর যেসব জাতি-গোষ্ঠী ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করল, অধিক হারে পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটল এবং

৭৫৩. সিদ্দিক হাসান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৫৬০।

তারা এ সকল নওমুসলিম অনারবকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আরবি ভাষা শেখানোর চেষ্টা চালাল, তখন বহু আরবের কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির সংক্রমণ ঘটতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ত্রুটিবিচ্যুতির সয়লাব ঘটে গেল। ফলে মুসলিম জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা কুরআনের ভাষার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করলেন এবং নড়েচড়ে উঠলেন। তারা লেখ্য ও কথ্য ভাষাকে সুরক্ষাদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আরবি বাক্যে শব্দাবলির অবস্থানের ভিন্নতা অনুয়ায়ী শব্দের শেষে 'হরকত' (যের, যবর, পেশ) প্রদানের নীতিও গ্রহণ করলেন। যাতে সবাই বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন, ...মুসলিম জ্ঞানী সম্প্রদায় আশঙ্কা বোধ করলেন যে, শুদ্ধরূপে কথা বলার যোগ্যতাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে যাবে। ফলে কুরআন ও হাদিস কিছু বোঝা যাবে না, এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হবে না। তাই তারা আরবদের কথার স্রোতধারা থেকে ওই যোগ্যতা-সংশ্লিষ্ট প্রচলিত কানুনগুলো উদ্‌ঘাটন করলেন। এগুলো ছিল সামগ্রিক নীতি ও কায়দার অনুরূপ। এসব কায়দাকানুনের ওপর তারা সব রকমের কথাকে পরিমাপ করলেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকে অনুরূপ কথার সঙ্গে মেলালেন। যেমন: ফায়েল হলো মারফু, মাফউল হলো মানসুব, মুবতাদা হলো মারফু। তারপর তারা দেখলেন যে, এসব শব্দের হরকতের পরিবর্তনের ফলে উদ্দিষ্ট অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তারা এর পারিভাষিক নামকরণ করলেন 'ইরাব'[৭৫৪] এবং পরিবর্তন-কারকের নামকরণ করলেন 'আমিল'[৭৫৫]। এরূপ অন্যান্য বিষয়েরও পারিভাষিক নামকরণ করলেন। এসব পরিভাষা আরবিভাষীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তারা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তাদের একটি বিশেষ শিল্প হিসেবে স্থির করলেন। তারা পরিভাষাসমগ্রের বিদ্যায়তনিক নাম দিলেন 'ইলমুন নাহব'।[৭৫৬]

---

৭৫৪. শব্দের শেষ বর্ণের স্বরধ্বনি নিরূপণ।

৭৫৫. অন্য শব্দের চালক শব্দ।

৭৫৬. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬।

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালিকে[৭৫৭] ইলমুন নাহব-সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থরচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'ফাতহা' (যবর), 'যম্মা' (পেশ) ও 'কাসরা' (যের)-রূপে পরিচিত হরকতগুলো তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর অন্যান্য মনীষী এ বিষয়ে লেখালেখি করেন। হারুনুর রশিদের খিলাফতকালে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি[৭৫৮]। খলিল ইবনে আহমাদ থেকে ইলমুন নাহব গ্রহণ করেন এবং ইলমুন নাহবের অধ্যায়গুলোকে পূর্ণতা দান করেন—ইবনে খালদুন যেমনটি উল্লেখ করেছেন—সিবাওয়াইহ[৭৫৯]। সিবাওয়াইহ ইলমুন নাহবে নতুন নতুন সংজ্ঞা ও পরিভাষা যুক্ত করেন। অসংখ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করেন। ব্যাকরণ-বিষয়ে *'আল-কিতাব'* নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ ছিল আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে পরবর্তীকালে যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার সবগুলোর ইমাম বা পথপ্রদর্শক। আবু তাইয়িব আল-লুগাবি[৭৬০] এই গ্রন্থকে 'কুরআনুন নাহব' বা ব্যাকরণের কুরআন বলে

---

৭৫৭. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালি : জালিম ইবনে আমর ইবনে সুফিয়ান (১৬ হিজরিপূর্ব-৬৯ হিজরি/৬০৫-৬৮৮ খ্রি.)। তাবিয়ি। ইলমুন নাহব বা আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক। আলি ইবনে আবি তালিব রা.-এর সঙ্গে সিফফিনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলি রা.-এর ইনতেকালের পর মুআবিয়ার রা.-এর দলে যুক্ত হন। দেখুন, ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ৩, পৃ. ৩১২।

৭৫৮. খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি : আবু আবদুর রহমান খলিল ইবনে আহমাদ ইবনে আমর ইবনে তামিম আল-ফারাহিদি আল-আযদি আল-ইয়াহমাদি (১০০-১৭০ হি./৭১৮-৭৮৬ খ্রি.)। আরবি ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তক ও ব্যাকরণবিদ। সংগীত ও সুরবিজ্ঞানও অধ্যয়ন করেছেন। তার দুজন বিখ্যাত উস্তাদ হলেন ঈসা ইবনে উমর এবং আবু আমর ইবনুল আলা। খলিল ব্যাকরণবিদ সিবাওয়াইহের গুরু। বসরায় বড় হন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ছিলেন দুনিয়াবিমুখ, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি :

كتاب معاني الحروف، كتاب الإيقاع، كتاب النقط والشكل، كتاب الشواهد، كتاب العروض، كتاب النغم، كتاب معجم العين।

৭৫৯. সিবাওয়াইহ : আবু বিশর আমর ইবনে উসমান ইবনে কানবার আল-হারিসি (১৪৮-১৮০ হি./৭৬৫-৭৯৫ খ্রি.)। আরবি ব্যাকরণবিদদের ইমাম। তার উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন খলিল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহিদি, ইউনুস ইবনে হাবিব, আবুল খিতাব আল-আখফাশ, ঈসা ইবনে উমর। *'আল-কিতাব'* ব্যাকরণ বিষয়ে তার প্রধান কীর্তি।

৭৬০. আবু তাইয়িব আল-লুগাবি : আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আলি আল-হালাবি (মৃ. ৩৫১ হি./৯৬২ খ্রি.)। আলেম, বিখ্যাত ভাষাবিদ। আলেপ্পোয় বসবাস করতেন। আলেপ্পোর সম্রাট সাইফুদ দাওলাহ আল-হামদানির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। ৩৫১ হিজরিতে রোমান সৈন্যরা আলেপ্পোর ওপর আক্রমণ করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের হাতে আবু তাইয়িব নিহত হন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مراتب النحويين، شجر الدر، الملقى لطيف الإتباع، كتاب الأضداد، طبقات الشعراء।

আখ্যায়িত করেছেন। সিবাওয়াইহ সম্পর্কে তিনি বলেন, সিবাওয়াইহ হলেন খলিল ইবনে আহমাদের পরে ব্যাকরণ সম্বন্ধে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[৭৬১] তারপর শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ[৭৬২] ও আবু আলি আল-ফারিসি[৭৬৩]। সিবাওয়াইহ তার গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তারা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।[৭৬৪]

এরপর আরবি ভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যাকরণের ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং ছোট-বড় প্রচুর ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। দীর্ঘ কলেবরযুক্ত, সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত ব্যাখ্যাযুক্ত, টীকাভাষ্য ও হাশিয়া, বিবরণ-সংবলিত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণমূলক ইত্যাদি বিপুল গ্রন্থ রচিত হয়। তারপর আসে 'সহজ ব্যাকরণ পাঠ' জাতীয় পুস্তক রচনার পালা। এসব পুস্তক ব্যাকরণের শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে তোলে।[৭৬৫]

সিবাওয়াইহ কর্তৃক রচিত গ্রন্থের পরে আরবি ব্যাকরণ বিষয়ে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আবু আমর ইবনুল হাজিবের (মৃ. ৬৪৬ হি.) গ্রন্থাবলি : পদপ্রকরণ ও বাক্যগঠন-বিষয়ে তার গ্রন্থ *'আল-কাফিয়া'* এবং শব্দপ্রকরণ বিষয়ে তার গ্রন্থ *'আশ-শাফিয়া'*। এই দুটি গ্রন্থের ওপর, বিশেষ করে *'আল-কাফিয়া'*র ওপর প্রচুর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১৭৩।

৭৬১. আবু তাইয়িব আল-লুগাবি, *মারাতিবুন নাহবিয়্যিন*, পৃ. ৬৫।

৭৬২. আয-যাজ্জাজ বা আবু ইসহাক আয-যাজ্জাজ : আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সারি ইবনে সাহল আয-যাজ্জাজ আল-বাগদাদি (২৪১-৩১১ হি./৮৫৫-৯২৩ খ্রি.)। ধর্মীয় পণ্ডিত ও সাহিত্য-বিশারদ। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদেই মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

معاني القرآن تفسير أسماء الله الحسنى، كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف، القوافي أو الكافي في أسماء القوافي

৭৬৩. আবু আলি আল-ফারিসি : হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল গাফফার আল-ফারিসি (২৮৮-৩৭৭ হি./৯০০-৯৮৭ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিজ্ঞানী। পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : التذكرة (আরবি ভাষাবিজ্ঞানের ওপর ২০ খণ্ডে রচিত), تعاليق سيبويه (২ খণ্ড), جواهر النحو। দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ৮০-৮২।

৭৬৪. ইবনে খালদুন, *আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি*, খ. ১, পৃ. ৫৪৬।

৭৬৫. আবদুর রহমান হাসান হাবান্নাকা, *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়্যা*, পৃ. ৪৮৮।

২. ইবনে মালিকের[৭৬৬] গ্রন্থাবলি : তার বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-আলফিয়্যাহ'* (ألفية ابن مالك)। এটি ছন্দে ছন্দে রচিত আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ এবং বহু ভাষাবিদ এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে হিশাম আল-আনসারি[৭৬৭], তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম *'আওযাহুল মাসালিক ইলা আলফিয়্যাতি ইবনে মালিক'*। তার আরও কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো হলো : *'মুগনিল লাবিব আন কুতুবিল আ'আরিব'*, *'শারহু শুযুরিয যাহাব ফি মারিফাতি কালামিল আরাব'*, *'কাতরুন নাদা ওয়া বাললুস সাদা'*। ইবনে আকিলও[৭৬৮] আল-আলফিয়্যাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন, সেটির নাম *'শারহু ইবনে আকিল আলাল আলফিয়্যাহ'*।

ইলমুন নাহব বা আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এভাবেই এবং তা ছিল সংস্কৃতিমূলক উজ্জ্বল মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি, কেবল মুসলিমরাই এই কীর্তি সাধন করেছে।

২. ইলমুল আরুয (আরবি ছন্দশাস্ত্র)

ইলমুল আরুয আরবি কবিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইলমুল আরুয বলতে এমন নিয়মকানুনকে বোঝায় যার দ্বারা বিশুদ্ধ কবিতা ও অশুদ্ধ কবিতা চিহ্নিত করা যায়। অথবা এটি এমন শাস্ত্র যেখানে গ্রহণযোগ্য ছন্দ ও মাত্রারীতি

---

৭৬৬. ইবনে মালিক : জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আন্দালুসি (৬০০-৬৭২ হি./১২০৩-১২৭৪ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিজ্ঞানী। আন্দালুসের জায়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দামেশকে। *'আল-আলফিয়্যাহ'* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৯।

৭৬৭. ইবনে হিশাম আল-আনসারি : জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ (৭০৮-৭৬১ হি./১৩০৯-১৩৬০ খ্রি.)। আরবি ভাষার ইমাম, বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। مغني اللبيب عن كتب الأعاريب তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৩, পৃ. ৯২-৯৪।

৭৬৮. ইবনে আকিল : বাহাউদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরাশি (৬৯৪-৭৬৯ হি./১২৯৪-১৩৬৭ খ্রি.)। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। আবু হাইয়ান তার সম্পর্কে বলেছেন, আকাশের নিচে তার মতো বড় ব্যাকরণবিদ আর নেই। জন্ম ও মৃত্যু কায়রোতে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : الجامع النفيس، مختصر الشرح الكبير، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك। দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৬, পৃ. ২১৪।

সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অথবা এটি কবিতার মানদণ্ড, যার দ্বারা শুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ কবিতার মধ্যে পার্থক্য করা যায়।[৭৬৯]

এটি একটি শিল্প, যার দ্বারা আরবি কবিতার শুদ্ধ ছন্দ ও মাত্রা এবং অশুদ্ধ ছন্দ ও মাত্রা জানা যায় এবং যা ছন্দের যিহাফ[৭৭০] ও ইলাল[৭৭১] সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়—বলেছেন আহমাদ আল-হাশিমি।[৭৭২]

আরবি ছন্দশাস্ত্রের যিনি উদ্ভাবক এবং যিনি একে অস্তিত্বদান করেছেন তিনি হলেন সিবাওয়াইহের গুরু খলিল ইবনে আহমাদ ফারাহিদি। তিনি ছন্দশাস্ত্র নিয়ে *'আল-আইন'* গ্রন্থটি রচনা করেছেন, এটি প্রথম কোষগ্রন্থ যেখানে তিনি একটি জাতির ভাষাকে আঁটিয়ে ফেলেছেন। খলিল ইবনে আহমাদ আরবদের কবিতাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোকে পনেরোটি ছন্দে শৃঙ্খলিত করেছেন। প্রত্যেক ছন্দের নাম দিয়েছেন 'বাহ্‌র'। আরও একটি কথা বলা হয়ে থাকে, ছন্দশাস্ত্রের প্রবর্তন করেছেন আহমাদ এবং তা পরিমার্জন করেছেন আবু নাস্‌র জাওহারি[৭৭৩]। আখফাশ[৭৭৪] আরও একটি ছন্দ বাড়িয়েছেন এবং ছন্দটির নাম দিয়েছেন 'আল-মুতাদারাক'।[৭৭৫] মোট ছন্দ হয়েছে ষোলোটি।

---

৭৬৯. উমর আল-আসআদ, *মাআলিমুল আরুয ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১১; মুহাম্মাদ আলি আশ-শাওয়াবাকাহ ও আনওয়ার আবু সুওয়াইলিম, *মুজাম মুসতালাহাতিল আরুয ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১৭৭; খতিব আত-তাবরিযি, *আল-ওয়াফি ফিল-আরুয ওয়াল-কাওয়াফি*, পৃ. ৩২-৩৩।

৭৭০. ছন্দের পরিমাপে পরিবর্তন-বিশেষ। পুরো কবিতায় একই পরিবর্তন জরুরি।

৭৭১. ছন্দ ও মাত্রায় পরিবর্তন, পুরো কবিতায় পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান জরুরি।

৭৭২. সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমি, *মিযানুয যাহাব ফি সানাআতি শি'রিল আরাব*, পৃ. ৫।

৭৭৩. আবু নাস্‌র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি আল-ফারাবি (মৃ. ৩৯৮ হি./১০০৭ খ্রি.)। ভাষাবিদ ও অভিধান-প্রণেতা। তৎকালীন তুর্কিস্তানের ফারাবে জন্মগ্রহণ করেন। ফারাব বর্তমানে কাজাখস্তানের অন্তর্গত। বিখ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবি তার মামা। তার বিখ্যাত গ্রন্থ تاج اللغة وصحاح العربية, যা *'আস-সিহাহ'* নামে পরিচিত। ব্যাকরণ ও ছন্দশাস্ত্র নিয়েও তার গ্রন্থ রয়েছে। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ৯, পৃ. ৬৯।

৭৭৪. আখফাশ আল-আকবার : আবুল খাত্তাব আবদুল হামিদ ইবনে আবদুল মাজিদ। আল-আখফাশ আল-আকবার নামে সমধিক পরিচিত। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সিবাওয়াইহ, ইউনুস ইবনে হাবিব, ঈসা ইবনে উমর, আবু উবাইদা মা'মার, আবু যায়দ আল-আনসারি, আল-আসমায়ি। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ২৮৮।

৭৭৫. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ২, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

হামযাহ আল-ইস্পাহানি[৭৭৬] বলেন, ইসলামের সাম্রাজ্যে যত নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে, আরব জ্ঞানী সম্প্রদায় তার প্রত্যেকটির জন্য খলিল ইবনে আহমাদ থেকে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে আরবি ছন্দশাস্ত্রের চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কিছু নেই। খলিল ইবনে আহমাদ ছন্দশাস্ত্র কোনো প্রজ্ঞাবান থেকে গ্রহণ করেননি এবং তার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্তও ছিল না যাকে তিনি অনুসরণ করেছেন...। যদি তার যুগ হতো অতিপ্রাচীন এবং নিদর্শনাবলি হতো আরও দূরবর্তী, তাহলে এই জাতির অনেকেই তার সৃষ্টিকর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত। দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে তার সৃষ্টিকর্মের মতো কারও সৃষ্টিকর্ম নেই, বিশেষ করে একটু আগে যে শাস্ত্রের (ছন্দশাস্ত্র) কথা বলা হয়েছে সে শাস্ত্রের উদ্ভাবন। একটিমাত্র গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়েই তিনি ছন্দশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেটি হলো *'আল-আইন'*। এই গ্রন্থে তিনি একটি জাতির ভাষাকে পুরোপুরি পুরে দিয়েছেন। সিবাওয়াইহ ইলমুন নাহব বা ব্যাকরণশাস্ত্রে খলিল থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছেন তাও উল্লেখযোগ্য, তার থেকে জ্ঞান আহরণ করে সিবাওয়াইহ যে গ্রন্থ রচনা করেছেন তা ইসলামি সাম্রাজ্যের সৌন্দর্যরূপে বিদ্যমান।[৭৭৭]

আল-ইয়াফিয়ি[৭৭৮] বলেছেন, খলিল ইবনে আহমাদ ইলমুল আরুয বা আরবি ছন্দশাস্ত্র–যা কবিতার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মানদণ্ড–উদ্ভাবনের

---

৭৭৬. হামযাহ আল-ইস্পাহানি : আবু আবদুল্লাহ হামযাহ ইবনুল হাসান আল-ইস্পাহানি (২৮০-৩৬০ হি./৮৯৩-৯৭০ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক। ইরানের ইস্ফাহানে জন্মগ্রহণ করেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : تاريخ سني ملوك الأرض، التنبيه على حدوث التصحيف والأنبياء। *'তারিখু আসবাহান'* তার আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। দেখুন, মুস্তাফা জালবি (হাজি খলিফা), *কাশফুয যুনুন*, খ. ১, পৃ. ২৮২, ২৮৫, ৩০১; যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ২, পৃ. ২৭৭।

৭৭৭. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৪৫।

৭৭৮. আল-ইয়াফিয়ি : আফিফুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে আলি (৬৯৮-৭৬৮ হি./১২৯৮-১৩৬৭ খ্রি.)। ইতিহাসবিদ, গবেষক, সুফি সাধক, ইয়ামেনের শাফিয়িয়্যাহ বংশোদ্ভূত। আদনে জন্ম এবং মক্কায় মৃত্যু। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان نشر المحاسن، الغالية في فضائل المشايخ أولي المقامات العالية مختصر الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم والآيات، والذكر الحكيم روض البصائر ورياض الأبصار في معالم الأقطار والأنهار الكبار।

দেখুন, ইবনে হাজার আসকালানি, *আদ-দুরারুল কামিনাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৮-২০।

ক্ষেত্রে মহামতি অ্যারিস্টটলের মতোই, যিনি যুক্তিবিদ্যা—যা অর্থের ও দলিলের শুদ্ধতার মানদণ্ড—উদ্ভাবন করেছেন।[৭৭৯]

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে যে, খলিল ইবনে আহমাদ পবিত্র মক্কায় হজব্রত পালনাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এমন জ্ঞান দাও যা আমার পূর্বে কাউকে দাওনি এবং সে জ্ঞান যেন কেবল আমার থেকেই গ্রহণ করা হয়।

তিনি হজ থেকে ফিরে এলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য ছন্দশাস্ত্রের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। সুর ও সংগীত সম্পর্কে খলিলের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানই তাকে ছন্দশাস্ত্র সৃষ্টির পথ দেখিয়ে দেয়। যেহেতু উৎসের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও সংগীতশাস্ত্র কাছাকাছি।[৭৮০]

ইলমুল আরুযের বিষয় হলো আরবি কবিতা, যেহেতু আরবি কবিতা বিশেষ কিছু ছন্দে আবদ্ধ। কোনটা গদ্য আর কোনটা কবিতা তা পার্থক্য করার ক্ষেত্রে ইলমুল আরুযের ফায়দাটা বোঝা যায়। এই শাস্ত্রের ফলেই কবিতা-লেখক একটি ছন্দের সঙ্গে আরেকটির তালগোল পাকিয়ে ফেলা থেকে বেঁচে যান। কারণ, আরবি ছন্দগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য অনেক এবং পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। ছন্দের টুটে যাওয়া ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেও নিরাপদ থাকেন। এই শাস্ত্র জানা থাকলে কবিতা ছন্দ অনুযায়ী শুদ্ধভাবে পাঠ করা যায় এবং কোন কবিতার ছন্দ ঠিকঠাক আছে এবং কোনটার ছন্দে পতন ঘটেছে তাও বোঝা যায়।[৭৮১]

আরবদের জন্য আরবি ভাষা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান। খলিল তাদের ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে আরবি কবিতাকে ষোলোটি ছন্দে শৃঙ্খলিত করেছেন। ছন্দগুলো হলো : আত-তাবিল, আল-মাদিদ, আল-বাসিত, আল-ওয়াফির, আল-কামিল, আল-হাযাজ, আর-রাজায, আর-রামাল, আস-সারি, আল-মুনসারিহ, আল-খফিফ, আল-মুযারি, আল-

---

৭৭৯. আল-ইয়াফিয়ি, *মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান ফি মারিফাতি হাওয়াদিসিয যামান*, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

৭৮০. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ২, পৃ. ২৪৪; সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল উলুম*, খ. ৩, পৃ. ৪।

৭৮১. উমর আল-আসআদ, *মাআলিমুল আরুদ ওয়াল-কাফিয়া*, পৃ. ১৬; মুহাম্মাদ আবদুল মুনয়িম খাফাজি ও আবদুল আযিয শারফ, *আল-উসুলুল ফান্নিয়্যাহ লি-আওযানিশ শি'রিল আরাবি*, পৃ. ২০-২১।

মুকতাযিব, আল-মুজতাস্‌স, আল-মুতাকারিব, আল-মুতাদারাক। এই শেষের ছন্দটি সংযোজন করেছেন আখফাশ এবং খলিলের যে ভ্রম ঘটেছিল তা দূর করেছেন।[৭৮২]

আবু তাহির আল-বাইযাবি ষোলোটি ছন্দকে দুটি পঙ্‌ক্তিতে সন্নিবিষ্ট করেছেন :

طَـوِيلٌ يَمُدُّ الـبَسْطَ بِـالوَفْرِ كَامِلٌ وَيَهْـزِجُ فِي رَجْـزٍ وَيُرْمِـلُ مُـسْـرِعَا

فَسَرِّحْ خَفِيفًا ضَارِعًا يَقْتَضِبُ لَنَا مَنِ اجْتُثَّ مِنْ قُرْبٍ لِنُدْرِكَ مَطْمَعَا

খলিল ইবনে আহমাদ ছাড়াও অন্যান্য ভাষাবিদ আরবি ছন্দশাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর বিখ্যাত কয়েকটি হলো : ১. قصيدة ابن الحاجب, ইবনুল হাজিব[৭৮৩]; ২. الوافي في علم العروض وعلم القوافي وعيوب الشعر, খতিব তাবরিযি[৭৮৪]; ৩. القصيدة الخزرجية في العروض, العروض والقوافي, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-খাযরাজি; ৪. شفاء الغليل في علم الخليل, وتسمى الرامزة, আমিনুদ্দিন আল-মাহাল্লি[৭৮৫]; আর ৫. ইউসুফ ইবনে আবু বকর

---

৭৮২. সাইয়িদ আহমাদ আল-হাশিমি, *মিযানুয যাহাব ফি সানাআতি শি'রিল আরাব*, পৃ. ২৯।

৭৮৩. ইবনুল হাজিব : আবু আমর উসমান ইবনে উমর ইবনে আবু বকর (৫৭০-৬৪৬ হি./১১৭৪-১২৪৯ খ্রি.)। মালিকি ঘরানার ফকিহ ও ভাষাবিজ্ঞানী। মিশরের মালভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

الجامع بين الأمهات في الفقه، كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب।

দেখুন, ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, খ. ৫, পৃ. ২৩৪।

৭৮৪. খতিব তাবরিযি : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাইবানি আল-লুগাবি আল-খতিব (৪২১-৫০২ হি./১০৩০-১১০৯ খ্রি.)। তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে বড় হন। সিরিয়া ও মিশর ভ্রমণ করেন। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت، الملخص في إعراب القرآن، شرح اختيارات المفضل الضبي، الوافي في العروض والقوافي، شرح شعر المتنبي ।

দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৮, পৃ. ১৫৭; ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৬, পৃ. ১৯১।

৭৮৫. আমিনুদ্দিন আল-মাহাল্লি : আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আলি ইবনে মুসা ইবনে আবদুর রহমান আল-আনসারি (৬০০-৬৭৩ হি.)। ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন। কয়েকটি ভালো বইও লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : أرجوزة في العروض। দেখুন, সুয়ুতি, *বুগয়াতুল উআত ফি তাবাকাতিল লুগাবিয়্যিন ওয়ান-নুহাত*, খ. ১, পৃ. ১৯২।

আস-সাক্কাকি *'মিফতাহুল উলুম'* গ্রন্থে আরবি ছন্দ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা এই শাস্ত্র বোঝার জন্য যথেষ্ট।[৭৮৬]

৩. অভিধান-সংকলন বিদ্যা[৭৮৭]

ড. আদনান আল-খতিব বলেছেন, প্রত্যেক ভাষাই তার অভিধান নিয়ে গৌরব প্রকাশ করে, তাই সমস্ত গৌরব সকল ভাষার মা আরবি ভাষার। কারণ এই পৃথিবী আরবদের মতো কোনো জাতি দেখেনি, মাতৃভাষার যত্ন-পরিচর্যা, সংগ্রহ ও সংকলন, শব্দানুসন্ধান, একক শব্দের হরফ তার অবস্থান অনুযায়ী কী অর্থ প্রকাশ করে তা জানার চেষ্টা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবজাতি পৃথিবীর অন্যসব জাতির চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে।[৭৮৮]

মুজাম বা অভিধান বলতে শুরুর দিকে এমন গ্রন্থ বোঝাত যাতে ভাষার শব্দভান্ডারের এক বিরাট অংশ সংকলিত হয়েছে এবং শব্দগুলোকে উচ্চারণের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। মুজামকে কখনো কখনো 'কামুস' বা শব্দকোষও বলা হয়। অভিধানের প্রধান গুরুত্ব এখানে যে, তাতে অসংখ্য শব্দের অর্থ দেওয়া থাকে যা সংশ্লিষ্ট ভাষার কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এসব শব্দ অনুসন্ধান করে তার অর্থ জানার যতই আগ্রহ থাকুক এবং ভাষার শব্দরাশি যতই ছড়িয়ে থাকুক। নিজের পরিবেশ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

আরবদের মধ্যে অভিধান-চিন্তার প্রকাশ ঘটে কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার পর। কুরআনে আরবদের বহু উপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। অনারবরা ইসলামে প্রবেশ করে এবং তাদের অনেকের কাছে কুরআনের কিছু কিছু শব্দ কঠিন ও দুর্বোধ্য ঠেকে। ফলে কুরআন ও হাদিসের অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দাবলি এবং সাধারণভাবে আরবি ভাষার কঠিন ও জটিল শব্দগুলোর ব্যাখ্যার দাবি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তাই আরবি ভাষাবিদদের জন্য অভিধান-সংকলন বিদ্যা আরব-ঐশ্বর্য থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি, অন্য কোথাও থেকে নয়। এ কারণে অভিধান

---

৭৮৬. হাজি খলিফা, *কাশফুয যুনুন*, খ. ২, পৃ. ১১৩৩-১১৩৪।

৭৮৭. *আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ*, ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক ভার্সন, সৌদি আরব, ২৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.।

৭৮৮. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৫।

সংকলন-বিদ্যাকে আরব ভাষাবিদদের একটি উদ্ভাবন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে তারা পথিকৃৎ। অভিধান-রচনায় তারা অন্যান্য জাতি থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছেন। অভিধান-সংকলনের বহু পদ্ধতি রয়েছে তাদের, অভিধানের প্রকারভেদও অনেক। তাই আরবদের অভিধান-চর্চা নিয়ে সমৃদ্ধ গবেষণাও রয়েছে। এসব গবেষণা থেকে এ স্বীকৃতি মিলেছে যে, অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতদের চেয়ে আরবি ভাষার পণ্ডিতরা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। জার্মান প্রাচ্যবিদ অগাস্ট ফিশার (August Fischer 1865-1949) বলেন, চীনকে যদি বাদ দিই, তাহলে আরব ছাড়া আর কোনো জাতি পাওয়া যাবে না যারা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞানের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলির প্রাচুর্য এবং নীতিমালা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষার শব্দরাশিকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তাবোধ ও অগ্রসর চিন্তাভাবনার জন্য গৌরবের হকদার হতে পারে।[৭৮৯]

প্রখ্যাত অনারব আরবি-ভাষাবিদ এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্টার্ন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ-এর খ্যাতিমান অধ্যাপক John A. Haywood তার *'সানাআতুল মাআজিম ফিল-আরাবিয়্যাহ'* গ্রন্থে বলেছেন, আরবদের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক অভিধান রয়েছে, সেটি হলো *'লিসানুল আরব'*[৭৯০]। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার অভিধানাবলি সূক্ষ্মতায় ও সামগ্রিকতায় *'লিসানুল আরব'*-এর সমকক্ষ হতে পারেনি।[৭৯১]

পবিত্র কুরআনের অপ্রচলিত ও জটিল শব্দাবলি নিয়ে প্রথম যিনি অভিধানমূলক পুস্তিকা রচনা করেন, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৭ খ্রি.)। এই পুস্তিকায় তিনি খারিজি সম্প্রদায়ের নাফে ইবনুল আযরাক (মৃ. ৬৫ হি./৬৮৪ খ্রি.) কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নাবলির জবাব দিয়েছেন। পুস্তিকাটির নাম *'মাসায়িলু নাফে ইবনিল আযরাক ফি গরিবিল কুরআন'*। তারপর এ বিষয়ে একাধিক পুস্তিকা রচিত হয়। যেমন :

---

৭৮৯. *আল-মাজাল্লাতুল আরাবিয়্যাহ*, সংখ্যা ৩৩৪, বর্ষ ২৯, যিলকদ ১৪২৫ হি./জানুয়ারি ২০০৫ খ্রি.।

৭৯০. ইবনে মানযুর (মৃ. ৭৫০ হি.), *লিসানুল আরব*।

৭৯১. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৫।

গরিবুল কুরআন, আবু সাইদ আবান ইবনে তাগলিব[৭৯২]; *'তাফসিরু গরিবিল কুরআন'*, ইমাম মালিক; *'গারিবুল কুরআন'*, আবু ফায়দ মুআররিজ ইবনে আমর আস-সাদুসি[৭৯৩] এবং অন্যান্য।

সাধারণ ও সামগ্রিক অর্থে অভিধানগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। যখন খলিল ইবনে আহমাদ তার *'আল-আইন'* নামক কোষগ্রন্থটি রচনা করেন। উচ্চারণস্থল অনুযায়ী আরবি বর্ণমালার ভিত্তিতে এই কোষগ্রন্থের ভুক্তিসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও সন্নিবিষ্ট করা হয়।[৭৯৪] খলিল ইবনে আহমাদের পথ অনুসরণ করেন আবু আলি আল-কালি (মৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৬ খ্রি.)। তিনি তার অভিধান *'আল-বারি'*তে হরফের উচ্চারণস্থল (মাখরাজ) অনুযায়ী ভুক্তিগুলো বিন্যস্ত করেন। আন্দালুসে রচিত এটিই প্রথম কোষগ্রন্থ। যারা খলিলকে অনুসরণ করেছেন এবং মাখরাজ অনুযায়ী বিন্যাস ও অধ্যায়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তারই পথে হেঁটেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু মানসুর আল-আযহারি[৭৯৫], তার রচিত অভিধান *'তাহযিবুল লুগাহ'* এবং সাহিব ইবনে আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খ্রি.), তার রচিত অভিধান *'আল-মুহিত ফিল-লুগাহ'*। খলিলের আবিষ্কৃত বিন্যাসপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বিন্যাস ও শৈলীতে অভিধান রচনার প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে দুরাইদ আল-আযদি। তার রচিত অভিধানের নাম *'জামহারাতুল লুগাহ'*। এই অভিধানে তিনি বর্ণনাক্রমিক

---

৭৯২. আবান ইবনে তাগলিব : আবু সাইদ আবান ইবনে তাগলিব ইবনে রাবাহ আল-বাকরি আল-জারিরি আল-কুফি (মৃ. ১৪১ হি./৭৫৮ খ্রি.)। রাবি, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, কারি, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক। শিয়াপন্থী। যাইনুল আবিদিন ইবনুল হুসাইনের সহচর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : غريب القرآن، القراءات، صفين। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ১, পৃ. ২৬।

৭৯৩. আবু ফায়দ মুআররিজ : আবু ফায়দ মুআররিজ ইবনে আমর আস-সাদুসি (মৃ. ১৯৫ হি./৮১০ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিদ ও ব্যাকরণবিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : غريب القرآن، جماهير القبائل، الأنواء। দেখুন, ফাইরুজাবাদি, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, খ. ১, পৃ. ৫৬।

৭৯৪. খলিল ইবনে আহমাদ, *মুজামুল আইন*, তাহকিক, আবদুল হামিদ হিন্দাবি, খ. ১, পৃ. ১৫।

৭৯৫. আবু মানসুর আল-আযহারি : আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনুল আযহারি আল-হারাবি (২৮২-৩৭০ হি./৮৯৫-৯৮১ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। খুরাসানের হেরাতে জন্ম ও মৃত্যু । তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

كتاب التفسير، تفسير ألفاظ المزني، علل القراءات، كتاب الروح، كتاب الأسماء الحسنى، شرح ديوان أبي تمام، تفسير إصلاح المنطق ।

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪।

(আলফাবেটিক) পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যদিও তা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেননি। আহমাদ ইবনে ফারিস[৭৯৬] বর্ণনাক্রমিক পদ্ধতি ও শব্দের গঠন অনুযায়ী ভুক্তিবিন্যাসের পদ্ধতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তার রচিত অভিধানের নাম '*মাকায়িসুল লুগাহ*'।

আবু নাস্‌র ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ আল-জাওহারি (মৃ. ৪০০ হি./১০০৯ খ্রি.) তার রচিত অভিধান '*আস-সিহাহ*'-তে এক নতুন বিন্যাসপদ্ধতির উদ্ভব ঘটান, এই পদ্ধতি ছিল তার পূর্ববর্তীকালে রচিত সব ধরনের অভিধানের বিন্যাসরীতি থেকে ভিন্ন। তিনি বর্ণনানুক্রমিক রীতি অনুসরণ করেন বটে, তবে অধ্যায়ভুক্ত শব্দাবলিকে শেষ হরফ অনুযায়ী বিন্যস্ত করার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যা আর কেউ করেননি।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিকে যামাখশারি তার অভিধান '*আসাসুল বালাগাহ*' রচনা করেন। এই অভিধানে তিনি ভিন্নভাবে বর্ণনানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি শব্দাবলিকে তাদের প্রথম বর্ণ অনুযায়ী, তারপর দ্বিতীয় বর্ণ অনুযায়ী, তারপর তৃতীয় বর্ণ অনুযায়ী বিন্যস্ত করেন। আধুনিক অভিধানগুলোতে শব্দের বিন্যাসে এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে যামাখশারির দুই শতাব্দীরও পূর্বে এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিধান রচনা করেন আলি ইবনুল হাসান আল-হুনায়ি, যিনি কুরাউন নাম্‌ল[৭৯৭] নামে পরিচিত। তার অভিধানের নাম '*আল-মুনাযযাদ*'। এই অভিধান তিনি আলিফ-বা-তা-সা বর্ণনানুক্রম অনুসারে রচনা করেন। ইয়াকুত আল-হামাবি তার কোষগ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং অন্যান্য জীবনীকাররাও তা-ই করেছেন।

অভিধান রচনায় পূর্ববর্তী মনীষীদের যে অভিজ্ঞতা তাকে পুঁজি করেই সাধারণ অভিধান রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। আল-জাওহারি তার

---

৭৯৬. ইবনে ফারিস : আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে ফারিস ইবনে যাকারিয়া (৩২৯-৩৯৫ হি./৯৪১-১০০৪ খ্রি.)। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। কাযবিনে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর রায় শহরে গমন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

معجم مقاييس اللغة، الإتباع والمزاوجة، اختلاف النحويين، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ।

দেখুন, ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, খ. ১, পৃ. ১১৮।

৭৯৭. কুরাউন নাম্‌ল : আবুল হাসান আলি ইবনুল হাসান আল-হুনায়ি (মৃ. ৩১০ হি./৯২১ খ্রি.)। আরবি ভাষাবিদ। মিশরের অধিবাসী। '*আল-মুনায্‌যাদ*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ২০, পৃ. ২০৯।

অভিধান *'আস-সিহাহ'*-তে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইবনে মানযুর রচনা করেন *'লিসানুল আরব'*। ফাইরুজাবাদি তার অভিধান *'আল-কামুসুল মুহিত'*-এ *'লিসানুল আরব'* ও *'আস-সিহাহ'*-তে অনুসৃত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে মুরতাযা আয-যাবিদি[৭৯৮] অভিধান রচনায় *'আল-কামুসুল মুহিত'*-এর ওপরই নির্ভর করেন। ১০ খণ্ডে রচিত তার অভিধানের নাম *'তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস'*। তবে তিনি অভিধানের প্রত্যেক অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট হরফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, হরফটির বৈশিষ্ট্য কী এবং ভাষাগত ব্যবহার কী কী তার বর্ণনা দিয়েছেন।

সাধারণ আরবি অভিধানের উদ্দেশ্য ছিল শব্দার্থের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং দ্ব্যর্থবোধক অর্থকে স্পষ্ট করা। এগুলো মুজামুল আলফায বা শব্দাভিধান হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ধরনের অভিধান রচনার পাশাপাশি আরেক ধরনের অভিধান রচনার ধারা তৈরি হয়, সেগুলোর নাম মুজামুল মাআনি বা অর্থাভিধান। এসব অভিধানের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শব্দ ও শব্দরূপ তৈরি করা, যার দ্বারা লেখক তার নিজস্ব অর্থ ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারেন অথবা যা তার জীবনে নতুন কিছু হিসেবে উপস্থিত হয়। এ প্রকারের অভিধানে ভুক্তিবিন্যাসে শব্দাভিধান থেকে ভিন্নতর পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন বিষয় অনুযায়ী বিন্যাসপদ্ধতি। ইবনুস সিক্কিত (২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *'আল-আলফায'* এই শ্রেণির প্রথম অভিধান। তারপর এ ধরনের অভিধান রচনার একটি ধারা তৈরি হয়। আবদুর রহমান ইবনে ঈসা আল-হামাদানি[৭৯৯] রচনা করেন *'আল-আলফাযুল*

---

৭৯৮. মুরতাযা আয-যাবিদি : আবুল ফায়দ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক, তার উপাধি মুরতাযা (১১৪৫-১২০৫ হি./১৭৩২-১৭৯০ খ্রি.)। ভাষা, হাদিস, রিজালশাস্ত্র ও বংশবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের হারদুয়ি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরাকের ওয়াসিত শহরের বাসিন্দা। তার মা-বাবা তাকে নিয়ে ইয়ামেনের হাজরামাউতে চলে যান। ১২০৫ হিজরিতে মিশরে এক মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

تاج العروس من جواهر القاموس (১০ খণ্ড) ، إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي (১০ খণ্ড) أسانيد الكتب الستة، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام، رفع الشكوى وترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب ।

৭৯৯. আবদুর রহমান ইবনে ঈসা আল-হামাদানি (মৃ. ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত লিখন-শিল্পী। আমির বকর ইবনে আবদুল আযিয আল-আজালির চিঠিপত্রের লেখক ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'আল-আলফাযুল কিতাবিয়্যাহ'*। তার এই গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিব ইবনে আব্বাদ

কিতাবিয়্যাহ'। তিনি বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইবনুস সিক্কিতের গ্রন্থকেই অনুসরণ করেন। তিনি আলোচ্য বিষয়গুলোকে কয়েকটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করেন।

আল-হামাদানি কর্তৃক রচিত গ্রন্থটির অনুসন্ধান লাভের পর কুদামা ইবনে জাফর[৮০০] রচনা করেন '*জাওয়াহিরুল আলফায*'। কিন্তু এটি তার আশা মেটায়নি এবং তাকে পরিতৃপ্ত করেনি। আবু হিলাল আল-আসকারি[৮০১] এই শ্রেণির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করেন, বিন্যাস ও কাঠামোর দিক থেকে এটি বেশ গুরুত্ব বহন করে। গ্রন্থটির নাম '*আত-তালখিস*'। সংক্ষিপ্ত হলেও এটি অভিধানের স্তরে উত্তীর্ণ। এই ময়দানে আরও অবতীর্ণ হন আবু মানসুর আস-সাআলিবি[৮০২] এবং রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ '*ফিকহুল লুগাহ*'। যিনি এই শ্রেণির রচনাকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরান তিনি হলেন ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি[৮০৩], তার রচিত অভিধান '*আল-মুখাসসাস*'। গ্রন্থটি বিন্যাস ও অধ্যায়বিভক্তি এবং ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার দিক থেকে শীর্ষস্থান দখল করে নেয়। এখনো পর্যন্ত এটি

বলেন, তিনি কিছু পৃষ্ঠায় আরবি ভাষার মূল্যবান মুক্তারাশি একত্র করেছেন। দেখুন, যিরিকলি, *আল-আ'লাম*, খ. ৩, পৃ. ৩২১।

৮০০. কুদামা ইবনে জাফর : আবুল ফারাজ কুদামা ইবনে জাফর ইবনে কুদামা (মৃত্যু : ৩৩৭ হি./৯৪৮ খ্রি.)। লিখন-শিল্পী। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : كتاب صناعة الكتابة، كتاب الخراج، كتاب نقد الشعر। দেখুন, ইবনে কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খ. ১১, পৃ. ২২০।

৮০১. আবু হিলাল আল-আসকারি : আবু হিলাল হাসান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (৯২০-১০০৫ খ্রি.)। সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা লিখেছেন। ফিকহেও ব্যুৎপত্তি ছিল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : شرح الحماسة، جمهرة الأمثال، الفروق في اللغة، ديوان المعاني، المحاسن في تفسير القرآن। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১২, পৃ. ৫০।

৮০২. সাআলিবি : আবু মানসুর আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (৩৫০-৪২৯ হি./৯৬১-১০৩৮ খ্রি.)। ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম। নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। '*ইয়াতিমাতুদ দাহর*' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেখুন, সাফাদি, *আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত*, খ. ১৯, পৃ. ১৩০।

৮০৩. ইবনে সিদাহ আল-আন্দালুসি : আবুল হাসান আলি ইবনে ইসমাইল, ইবনে সিদাহ আল-মুরসি নামে পরিচিত (৩৯৮-৪৫৮ হি./১০০৭-১০৬৬ খ্রি.)। ভাষাবিজ্ঞানী ও অভিধানবেত্তা। আন্দালুসের মুরসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন দায়িনায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : المخصص المحكم والمحيط الأعظم، الأنيق، شرح إصلاح المنطق، شرح ما أشكل من شعر المتنبي، العلام في اللغة على الأجناس، العالم والمتعلم، الوافي في علم أحكام القوافي।

সবচেয়ে বড় আরবি অর্থাভিধান, বিপুল সংখ্যক ভুক্তি রয়েছে এতে, অর্থাভিধান নামটি ধারণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত গ্রন্থ এটি।[৮০৪]

ইউরোপীয় অভিধান-বিশেষজ্ঞ জন এ. হেউড (John A. Haywood) মুসলিমদের কাছে অভিধান ও কোষগ্রন্থের গুরুত্ব ও মহিমা যে কী তা নিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সত্য এই যে, অভিধান ও কোষগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবী এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনায় আরবরা কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে। তা যুগের বা স্থানের যে বিবেচনাতেই হোক।[৮০৫]

তাই আরবি অভিধান ও কোষগ্রন্থ—তাদের বিভিন্ন শ্রেণি ও প্রকার নিয়েই—ইসলামি আরবের নবচিন্তার একটি অংশ এবং মুসলিম জ্ঞানী-মনীষীরা হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে যে শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তার ফল।

।। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।।

Asif Rahman
12.07.'21
10:12 pm

---

৮০৪. আদনান আল-খতিব, *আল-মুজামুল আরাবি বাইনাল মাযি ওয়াল-হাযির*, পৃ. ৩৭-৪৬।

৮০৫. আহমাদ মুখতার উমর, *আল-বাহসুল লুগাবি ইনদাল আরাব*, পৃ. ৩৪৩।

বাইতুল হিকমা

বাগদাদের বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার। এটিকে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র বিবেচনা করা হয়। এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠের সমপর্যায়ের। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে ছুটে এসেছে। তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছে, নানা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। তাতারদের হাতে ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইতুল হিকমার আলোকবর্তিকা প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মানবতাকে পথ দেখিয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তার খিলাফতের সময় রাজধানী বাগদাদে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছু ভবন নির্দিষ্ট করে সেখানে অতি মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থাবলির সমাবেশ ঘটান।

খলিফা হারুনুর রশিদ এই গ্রন্থাগারের জন্য একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেন এবং বাগদাদের সমস্ত গ্রন্থভান্ডার এখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এটির নামকরণ করেন বাইতুল হিকমা (House of Wisdom)। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগার ক্রমবিকশিত হতে থাকে ও উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিখ্যাত একাডেমিক জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

খলিফা আল-মামুনের যুগে গ্রন্থাগারটির সর্বাধিক উন্নতি হয়। তিনি বিখ্যাত অনুবাদক, অনুলিপিকার, লেখক ও জ্ঞানী-গুণীদের সমবেত করতে সক্ষম হন। এমনকি তিনি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গবেষক ও অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করেন। তার এসব কাজ এই জ্ঞানসুলভ অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির উন্নতি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাইতুল হিকমার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে, তারপর তা অনুবাদকেন্দ্রের রূপ পায়, তারপর তা পরিণত হয় গবেষণা ও সংকলনকেন্দ্রে, অবশেষে তা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর এতে যুক্ত করা হয় একটি মানমন্দির (Astronomical observatory)।

মুসলিমজাতি ও তাদের সৃষ্টি সভ্যতা গতানুগতিক কোনো সভ্যতা নয়। এই সভ্যতার অবদানকে অন্যান্য সভ্যতার কৃতিত্ব ও অবদানের পরিপূরক বলারও অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সভ্যতা ও তার অবদান এমন অনন্যতায় আরোহণ করে, যা সকল সভ্যতা ও গোটা বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও উপমারূপে স্থির হয়।

কিন্তু এই অমায়িক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এই সভ্যতা গোটা বিশ্ব ও সকল সমাজের প্রতিপালক মহান আল্লাহর সাথে প্রদর্শিত আচরণ, একইসাথে তাঁর সৃষ্টি মানবজাতির সাথে প্রদর্শিত আচরণে অপূর্ব ভারসাম্য সৃষ্টি করে দেখায়। শুধু তা-ই নয়, বরং সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষের পাশাপাশি তার চারপাশে বিদ্যমান পরিবেশ ও প্রাণের সাথেও অভূতপূর্ব সেতুবন্ধনের উপমা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

বস্তুত এই সভ্যতা এতটাই মানবীয়, যে-জন্য সকল মানুষের এ ব্যাপারে অবগতিলাভ ও অধ্যয়ন-গবেষণা কর্তব্য। তবে এই সুমহান সভ্যতার কৃতিত্ব ও অবদান বর্ণনার পথে আপনার সামনে রয়েছে অল্পকিছু পৃষ্ঠা মাত্র। প্রতিটি মুসলিমের উচিত এর মাঝে চোখ বুলিয়ে তার অপূর্ব সুধায় তৃপ্ত হওয়া, পাশাপাশি নিজের চারপাশে তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেওয়া।

ISBN
B0074
9 789848 012642

মাকতাবাতুল হাসান